প্রতিচিন্তা



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

চতুর্থ বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা ● ঢাকা ● জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১

প্রতি চিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা ২০১৪

সম্পাদক

মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ

নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মাহবুব হোসেন, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক

সম্পাদনা পর্ষদ

নজরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, ইকোসক
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, গণনীতি বিষয়ক গবেষক, উড্রো উইলসন সেন্টার, ওয়াশিংটন।
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

প্রচ্ছদ

কাইয়ুম চৌধুরী, চিত্রশিল্পী

শিল্প নির্দেশক

অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

সহকারী সম্পাদক

খলিলউল্লাহ্, প্রতিচিন্তা

দাম : ৫০ টাকা

ISSN 2310-2403

ওয়েবসাইট : www.protichinta.com, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
January-March Issue, 2014; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য় ৬

ঁজা তী য় তা বা দ

বাঙালি জাতীয়তাবাদ : চার দশক পর
বদরুল আলম খান ৯

অ র্থ নী তি

ইয়াংকি বণিকদের বঙ্গবাণিজ্য ও প্রাচ্যচর্চা (১৭৮৫-১৮৩০)
সিরাজুল ইসলাম ৫০

রা জ নী তি

বাংলাদেশে হরতাল ও স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো
বার্ট সুইকের্ন্স ও আইনুল ইসলাম ৭০

সা ং স্কৃ তি ক পা ঠ

তারেক মাসুদের চলচ্চিত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপস্থাপনা
সাজেদুল আউয়াল ৯২

আ ই ন ও ভা ষা

উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা : প্রয়োজনীয়তা ও সীমাবদ্ধতা
মিজানুর রহমান খান ১১৭

ব ই আ লো চ না

কূলদীপ নায়ারের *বিয়ন্ড দ্য লাইনস*
সোহরাব হাসান ১৪৩

তপন রায় চৌধুরীর *বাঙালনামা*
মোশারফ হোসেন ১৫৯

লেখক পরিচিতি ১৬৯



প্রতিচিন্তার বিগত সংখ্যা পাঠকেরা ভালোভাবে গ্রহণ করেছেন, যা আমাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। সেই সঙ্গে আমরা দৃঢ়ভাবে পাঠকদের উদ্দেশে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই, *প্রতিচিন্তা* সময়মতো প্রকাশে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিবারের মতো *প্রতিচিন্তার* এবারের সংখ্যাটিও সাজানো হয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অধ্যায়ে জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গটি বারবার সামনে আসছে। এই সমসাময়িক গুরুত্বের দিকটি বিবেচনায় নিয়ে এবারের সংখ্যায় বদরুল আলম খানের 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ : চার দশক পর' প্রবন্ধটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণে আমাদের সহায়তা করবে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের দুই বিপরীতমুখী উপাদান—ধর্ম ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার মধ্যকার দ্বন্দ্বের একটি সাবলীল ব্যাখ্যা তিনি দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। আজকের এই সংঘাতময় রাজনীতির পেছনে আত্মপরিচয়ের সংকটটি প্রকট হয়ে ধরা পড়ার কারণ এখানে পাওয়া যায় এবং এ সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাব্য পথের প্রাথমিক এক ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ সিরাজুল ইসলামের 'ইয়াংকি বণিকদের বঙ্গবাণিজ্য ও প্রাচ্যচর্চা'তে মার্কিন শিল্পবিপ্লবে বাংলা অঞ্চলের পুঁজির ভূমিকা এবং ইয়াংকি বণিকদের প্রাচ্যবাদ চর্চার বিশ্লেষণ রয়েছে। মার্কিনরা কীভাবে পুঁজির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও এই অঞ্চল থেকে লাভবান হয়েছে এবং প্রাচ্যবাদ চর্চায় অবদান রেখেছে, তারই একটি উপস্থাপনা এই প্রবন্ধ।

বার্ট সুইকেন্স ও আইনুল ইসলাম তাদের প্রবন্ধে হরতাল কীভাবে স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোতে স্থানীয় নেতা-কর্মী-সংগঠকদের অবস্থান বজায় রাখতে এবং তা সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয় তা আলোচনা করেছেন। হরতালের সহিংসতা এবং বাংলাদেশের বর্তমান হরতালের আত্মঘাতী ধরণ বন্ধ করা কেন কঠিন তার বিশ্লেষণ রয়েছে প্রবন্ধটিতে। এ প্রবন্ধেরই ধারাবাহিকতায় আগামীতে আমাদের পাঠকের জন্য লেখকদের কাছ থেকে বাংলাদেশের বর্তমান সহিংসতার উপর একটি নির্মোহ গবেষণা ভিত্তিক বিশ্লেষণ পাব তেমনটি আশা করি।

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে মিজানুর রহমান খানের 'উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা : প্রয়োজনীয়তা ও সীমাবদ্ধতা' প্রবন্ধটি ছাপতে উৎসাহী হলাম। এই প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন, সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা থাকার পরও তা রাষ্ট্রের ওপর কোনো সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। আর সে কারণেই উচ্চ আদালতে এখনো বাংলা ভাষা চালু করা সম্ভব হয়নি। ভাষা মানুষের মৌলিক অধিকার হওয়ায় এটি যে সরাসরি মানবাধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা-ও লেখক বিশ্বের অন্যান্য দেশের উদাহরণ দিয়ে তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে।

গত ৬ ডিসেম্বর ছিল প্রয়াত চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদের জন্মদিন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে সাজেদুল আওয়াল 'তারেক মাসুদের চলচ্চিত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপস্থাপনা' প্রবন্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তারেক মাসুদের ধ্যানধারণা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তারেকের চলচ্চিত্রকর্মের মাধ্যমে কীভাবে আমাদের লোকসংস্কৃতির ভেতরের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক এবং কিছুটা পারস্যের সুফিবাদী দর্শনের মানবসম্পর্কিত ধারণা ফুটে উঠেছে, সেটিই লেখক আলোচনা করেছেন বর্তমান প্রবন্ধে।

বই আলোচনা অংশে সোহরাব হাসান কূলদীপ নায়ারের *বিয়ন্ড দ্য লাইনস* এবং মোশারফ হোসেন তপন রায় চৌধুরীর *বাঙালনামা* গ্রন্থ দুটি যথাক্রমে আলোচনা করেছেন। প্রথমটিতে উপমহাদেশের খ্যাতনামা সাংবাদিক কূলদীপ নায়ারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে দেশভাগ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বর্তমান সময়ের হালনাগাদ স্থান পেয়েছে। আর দ্বিতীয় গ্রন্থটি ইতিহাসবিদ তপন রায় চৌধুরী ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রিটিশ শাসনামল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমাজ-রাজনীতিকে কীভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তার আলোচনা রয়েছে।

আমরা *প্রতিচিন্তায়* প্রকাশিত কোনো লেখা সম্পর্কে পাঠকের দ্বিমত ও প্রতিক্রিয়া ছাপাতে আগ্রহী। পাঠকদের তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিক্রিয়া ও মূল্যায়ন আমাদের উৎসাহিত করবে।

পরিশেষে আশা করি, আপনাদের সার্বিক সমর্থন পাব।



বাঙালি জাতীয়তাবাদ : চার দশক পর

বদরুল আলম খান

‘Your glory walks hand in hand with your doom.’
Homer *‘The Iliad’*

সারসংক্ষেপ

বাঙালি জাতীয়তাবাদ আজ এক যুগসন্ধিক্ষণের মুখোমুখি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে মুখ্য আদর্শিক ভূমিকা পালন করার পর তার সংকট আজ ঘনীভূত হয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যখন তাকে ঘিরে চলেছে নানা সংকট আর বিভ্রান্তি। এ প্রবন্ধে সেই সংকট ও ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ব্যর্থতার দুটি দিক এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। একটি ধর্মীয় উপাদানের গুরুত্ব বৃদ্ধি, অন্যটি তার কাল্পনিক বা ইউটোপীয় চরিত্র। এই দুই সংকট বাঙালির জাতি-পরিচয়কে প্রশ্নবোধক করে তুলেছে এবং ধর্মীয় ভিত্তিতে নতুন জাতি-পরিচয়ের বীজ বপন করছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : বাঙালি জাতীয়তাবাদ, আত্মপরিচয়, নিয়ন্ত্রণবাদী, ধনাত্মকমূলক দ্বান্দ্বিকতা, কল্পনার জগৎ, মিথ্যা চেতনা, উৎকট আত্মপ্রেম

প্রারম্ভিক কথা

আলোচনার শুরুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য মনে রাখা প্রয়োজন। আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদ মানুষের আত্মপরিচয়গত সংগ্রামের অন্যতম একটি রূপ হতে পারে, কিন্তু তাকেই একমাত্র আদর্শ হিসেবে ভাবা সঠিক নয়। মানুষের আত্মপরিচয় জাতি-পরিচয়কে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে, কখনো শ্রেণী-পরিচয়ও দখল করে নেয় ওই আত্মপরিচয়ের স্থান। আবার কখনো বা বংশ, সংস্কৃতি, ধর্ম বা ভাষা-পরিচয়। তবে জাতীয়তাবাদী চেতনা হলো অতিমাত্রায় খেয়ালি এক আদর্শ। তার উদাহরণ হয়তো বা ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারির শাহবাগ চত্বর। নতুন

প্রজন্মের হাতে সেখানে নতুন আদলে সে আত্মপ্রকাশ পেল যখন, তার আগে আমরা ভেবেছিলাম জাতীয়তাবাদের ইতিমধ্যে সমাপ্তি ঘটে গেছে। ফলে জাতি-পরিচয়ের শক্তিকে কখনো একেবারে খাটো করে দেখা যায় না, আবার তাকে খুব শক্তিশালী ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়াও কঠিন। সবকিছু আসলে নির্ভর করে কোন শক্তি তার পেছনে দাঁড়িয়ে, কার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে জাতীয়তাবাদী স্লোগান, তার ওপর। ফলে দোষ-গুণটা আসলে জাতীয়তাবাদের নয়, বরং জাতি-পরিচয়ের অনুভূতিকে সমাজের কোন শক্তি কীভাবে ব্যবহার করছে তার। এর ব্যর্থতা সে কারণে রাজনৈতিক ও সাময়িক।

প্রসঙ্গটি কেন গুরুত্বপূর্ণ তা-ও এখানে বলে নেওয়া দরকার। আত্মপরিচয়ের দিক থেকে বাঙালি জাতি আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে। আমরা লক্ষ করছি, জাতি-পরিচয়ের গা ঘেঁষে ধর্ম-পরিচয়ের প্রবল উত্থান। আর তাকে যারা প্রতিনিধিত্ব করে, তারাও নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি। তারা নতুন শক্তি, শহরের আধুনিক সভ্যতার বাইরের এক জগৎ থেকে আসা। তাদের ব্যানার হেফাজতে ইসলাম হতে পারে, তারা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটিই তাদের আসল পরিচয় নয়। তাদের সামাজিক শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত গ্রামের দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। এরা সেই কৃষকসমাজের বিশাল অংশ, যারা ধর্মকেন্দ্রিক আত্মপরিচয়ের যেমন মুখপাত্র, তেমনি একই সঙ্গে তারা গ্রাম-শহরের মধ্যকার বিদ্যমান গভীর বৈষম্যেরও প্রতীক। তারা রাষ্ট্রের অবহেলার প্রতীক। গ্রামকে দীর্ঘকাল রাষ্ট্রীয় নজরের বাইরে রাখা, তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা, তার প্রতি উদাসীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। অসাম্প্রদায়িক ও আধুনিকমুখী একটি সমাজ গড়ে তোলা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে সেটি কখনো উগ্র জাতি বা ধর্ম-পরিচয় দিয়ে সম্ভব নয়। এখানে আমাদের একটি মধ্যপথ খুঁজতে হবে। এই প্রবন্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা, কী কারণে সে আমাদের একটি আধুনিক বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পূরণে ব্যর্থ হলো, সেটিই খুঁজতে চেষ্টা করব। উগ্র ধর্ম-পরিচয় আজ বাঙালির জীবনে স্থান করে নিচ্ছে। স্থানস্বল্পতার কারণে এখানে সে আলোচনা করা সম্ভব হলো না।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ : পরাজয় এবং জয়

ঐতিহাসিকভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ তিনটি ধাপ অতিক্রম করেছে। তার প্রথমটি ভারতে যখন ব্রিটিশ শাসনের শেষ অধ্যায় চলছিল, তখন। সে সময় সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে ভিন্ন একটি ধারা, তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, স্থান করে নিয়েছিল। সেটি ছিল অখণ্ড বাংলাকে নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা। সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে সেটি পুষিয়ে

নেওয়া হয় ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় দিয়ে। কীভাবে জাতীয়তাবাদী আদর্শ সফল হয় এবং তা থেকে একটি রাষ্ট্রের জন্ম হতে পারে, তার তিনটি বিশ্লেষণ রয়েছে। এক. কোনো জাতি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নিতে পারে। যার দৃষ্টান্ত ইসরায়েল। ১৯৪৭ সালে ইসরায়েল নামে এক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল সারা বিশ্বে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদি জাতিকে একত্র করে। তারা একটি মাতৃভূমি দাবি করে এসেছিল বহুকাল ধরে। সেই দাবি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিবেচিত হয়ে জন্ম নেয় ওই রাষ্ট্রের। ফিলিস্তিনি জাতির রাষ্ট্রগঠন বিষয়টিকেও ওই একই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখা যায়। রাষ্ট্রগঠন তার পক্ষে এখনো সম্ভব না হলেও পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকার স্বনিয়ন্ত্রিত এলাকায় যে সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, সেটি অচিরেই একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পারে। দুই. কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আমলাতন্ত্রের সহায়তায় জাতি-ধারণাকে চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং তার ফলেও জন্ম নিতে পারে এক ধরনের জাতীয়তাবাদের। উদাহরণ হিসেবে রাশিয়ার জার পিটার তাঁর দেশকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে রুশ জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সম্রাট নিকোলাসও উনবিংশ শতাব্দীতে সক্ষম হয়েছিলেন রুশ জাতীয়তাবাদের প্রবল ঢেউ জাগিয়ে তুলতে। ওই একই পথে জাপানের মেইজি ও তুরস্কের অটোমান শাসকেরাও জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিলেন তাঁদের নিজ নিজ দেশে, বিশুদ্ধ আমলাতান্ত্রিক উপায়ে।

এই দুই ধরনের জাতীয়তাবাদের তুলনায় অনেক বেশি কাছের সেই ধরনের জাতীয়তাবাদ, যা জন্ম নিতে পারে যখন কোনো জাতি সংখ্যালঘু থাকার কারণে নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়। ওই নির্যাতনের কারণে একটি জাতি অধস্তনতার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগী হতে পারে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো বাংলাদেশ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ যে সফল হয়েছিল, তার দুটি কারণ ছিল। একটি হলো জাতির অভ্যন্তরীণ সংগতি গড়ে তোলায় সফলতা। দ্বিতীয়ত, অন্য জাতি থেকে তার ভিন্নতা নির্ণয় এবং জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে সাফল্য।[১]

কেন এবং কী কারণে পাকিস্তানের অন্যান্য জাতি থেকে বাঙালিরা আলাদা এবং কোন কোন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক কারণে তাকে পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে ভিন্ন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে, তা আপামর বাঙালির কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বাঙালি যে পৃথক একটি জাতি এবং বিচ্ছিন্নতা ছাড়া তার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, সেটি বাঙালির কাছে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। 'আমরা' এবং 'ওরা' এই বিভাজন-রেখা আদর্শ হিসেবে স্থান করে নেয়।[২]

এই পার্থক্যের দিকে তাকিয়ে বাঙালি সংগঠিত হতে থাকে। ওই বাস্তবতা থেকে

দূরে সরে আসার বাসনা জাগে এবং এক নতুন স্বপ্ন-ভুবন সৃষ্টির সংগ্রামে মনোনিবেশ করে। 'আমরা' ও 'তারা'—এই বিভাজন-রেখা জাতীয়তাবাদী চেতনার বিজয়কে বেগবান করে।৩

জাতীয়তাবাদের সংকট

জাতীয়তাবাদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ককে অনেকটা রূপক অর্থে আমরা তুলনা করতে পারি প্রেমের সঙ্গে। প্রেমের প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখি আবেগ ও অনুভূতি। তাতে সিক্ত হয় নর-নারী। এবং তারই এক জটিল মিথস্ক্রিয়া থেকে পরবর্তী সময়ে সৃষ্টি হয় পরিণয়ের। পরিণয় শেষে জীবনের নিত্যনৈমিত্তিকতার প্রবল অভিঘাতে প্রেমের আকর্ষণে পড়ে ভাটা। ধীরে ধীরে প্রেমস্পৃহার অনিবার্য নির্বাসন ঘটে—কারও ক্ষেত্রে তা প্রবল বেগে, কারও ক্ষেত্রে দুর্বল বা ধীরভাবে। এই বিবর্তনের বিষয়টি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সত্য, তেমনি সত্য জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে। আত্মপরিচয়ের আবেগে জাতি প্রথমে আপ্লুত হয়। সংগ্রাম, আন্দোলন, সমষ্টিগত ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে সে তার অতি আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতাও পেয়ে যায়। আবির্ভাব ঘটে জাতিরাষ্ট্রের। কিন্তু তারপরেই সুনামির প্রবল বেগের মতো সমস্যার ঢেউ তাকে আঘাত করে একের পর এক। তাকে সংগ্রাম করতে হয় অর্থনীতির কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে। সংকুচিত হতে থাকে তার জাতিকেন্দ্রিক আবেগ। কোনো এক সময় অনেকটা অজান্তেই ওই পরিচয়ের আবেগ হারিয়ে যায় জাতির মন থেকে।

এই বিবর্তনের ব্যাপারটি অন্যান্য জাতীয়তাবাদের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ভাবা যায়। আমরা জানি, নানা অগ্নিপরীক্ষা পেরিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিজয়ী হয়েছিল। তার মধ্যে ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, এগারো দফা, ১৯৭০-এর নির্বাচনের রায় বাস্তবায়নে পাকিস্তানি শাসকদের অনীহাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অসহযোগ আন্দোলন অন্তর্ভুক্ত। এসব পর্যায় পেরিয়ে আমরা পেয়েছিলাম একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু বহুবিধ চ্যালেঞ্জের অভিঘাতে বিগত ৪২ বছরে তার আকর্ষণ-শক্তি ক্ষীণ ও স্তিমিত হয়ে এসেছে, ক্ষয় ঘটেছে তার প্রভাবের। যে জাতীয়তাবাদী আবেগ জাতিকে এককালে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত ও মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আজ তার পক্ষে অনুরূপ কোনো সংগ্রামে আদর্শিক নেতৃত্ব দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া কঠিন বলে মনে হয়। জনগণকে ওই আদর্শের পেছনে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করা তার পক্ষে কষ্টকর। প্রশ্ন হলো, কেন? একটি কারণ, যেকোনো জাতীয়তাবাদে দুটি বিপরীতমুখী স্রোতোধারা লক্ষ করা যায়। একটি স্রোত ইতিবাচক, অন্যটি নেতিবাচক। ইতিবাচক স্রোত বলতে জাতীয়তাবাদের বিশেষ আকর্ষণী শক্তিকে বোঝায়। সে জাতি-পরিচয়ের বাহক। তার ক্ষমতা ও দক্ষতা জাতীয় আশা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করে। জনগণের মধ্যে সে আবেগ সৃষ্টি করে। জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার থাকে প্রশংসনীয় অবদান।

এই গুণাবলির পাশাপাশি রয়েছে বিপদের সম্ভাব্য উৎস। জাতীয়তাবাদী আদর্শ গণমানুষকে তার পতাকার নিচে একতাবদ্ধ করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবল স্বাধীনতার আশা নিয়েই কোনো জাতি তৃপ্ত থাকে না। তাকে ঐক্যবদ্ধ করার পথে আরও নানা প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাষী সব দাবি পূরণের প্রতিজ্ঞা করে থাকেন জাতীয়তাবাদী নেতারা। সে কারণে জাতীয়তাবাদী আদর্শ জনপ্রিয় হয় বটে, কিন্তু একটি স্বাধীন রাষ্ট্র যখন বাস্তবে রূপ নেয়, তখন ওসব দাবি পূরণের প্রচেষ্টা ও সক্ষমতায় ঘাটতি লক্ষ করা যায়। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। যেসব প্রতিশ্রুতি মানুষের মনকে প্রবল আশায় উদ্দীপ্ত করেছিল, সেগুলো পূরণে ওই আদর্শের অসহায়ত্ব মানুষকে মোহমুক্ত করে জাতীয়তাবাদের বলয় থেকে তাকে ক্রমে দূরে সরিয়ে দেয়। দেখা যায়, মানুষের খাদ্য, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশল জাতীয়তাবাদের ধারায় সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ওসব সমস্যা সমাধানের কোনো জাদুমন্ত্র তার হাতে নেই। সে কারণে অনেকে জাতীয়তাবাদকে তুলনা করে থাকেন দ্বিমুখী চরিত্রের সঙ্গে।

এরিক হবসবাম এই দ্বন্দ্বকে দেখেছিলেন এভাবে, আত্মপরিচয়ের জন্য মানুষের যে ক্ষুধা, সেটি মানুষের মন থেকে মুছে যায় দ্রুত। তার স্থান দখল করে নেয় আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রবল ইচ্ছা। মোহ এবং মোহমুক্তির এই অন্তর্বর্তীকাল জাতির জীবনে জন্ম দেয় গভীর হতাশার।[৪] এই হতাশা অচল করে দেয় জাতিকে সমষ্টিগতভাবে, তার অভ্যন্তরীণ বিরোধকে উসকে দিয়ে। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে গণসমালোচনা তার সব সাফল্যকে মুহূর্তের মধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে। মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করে তার ব্যর্থতার চিত্রকে বড় করে দেখে। এই দুর্ভাগ্য অধিকাংশ জাতীয়তাবাদের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদকেও বরণ করতে হয়। তার সেই অধোগতি শুরু হয়েছিল ঠিক তখনই, যখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সঠিক পথ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম চার বছর এই ব্যর্থতা প্রবল আকার ধারণ করে। সময়টি জাতির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও ওই কাল ছিল বাংলাদেশের জন্য হতাশারও এক অধ্যায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বাসনে ব্যর্থতা ১৯৭৪ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে, যদিও দেশের তৎকালীন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটটিও আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। ওই দুর্ভিক্ষ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছিল। রাষ্ট্র পরিচালনায় চরম ব্যর্থতা, স্বৈরতান্ত্রিকতার দাপট, সমাজতন্ত্রের পরীক্ষায় অর্থনীতির অপরিমিত ক্ষতি, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, সেই সঙ্গে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে জাতীয়তাবাদের সার্বিক ভাবমূর্তিকে।

জাতীয়তাবাদের এই দ্বান্দ্বিক চরিত্রটি নতুন কোনো ব্যাপার নয়। তার এই দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতার দিকটি সম্পর্কে আমরা বরাবরই অবহিত ছিলাম। মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক ধারায় জাতীয়তাবাদকে কখনোই বড় একটা আমল দেওয়া হয়নি, বরং দাবি করা হয়েছে, জাতিকেন্দ্রিক আন্দোলনের চরিত্র নিতান্তই বুর্জোয়া। জাতি-পরিচয়ের অনুভূতিকে সে ব্যবহার করে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতায় বসাতে। সে কারণে সামাজিক মুক্তির প্রশ্নে মার্ক্সবাদীরা ভিন্ন পথ নির্বাচনের পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন, ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে জাতীয় পরিচয়ের বদলে আন্দোলন হওয়া চাই শ্রেণীভিত্তিক। শ্রেণী-পরিচয় জাতি-পরিচয় থেকে ভিন্ন। শ্রেণীর মধ্যে আছে সর্বজনীনতা। সে বিশ্বের সব মানুষকে শোষিত শ্রেণীর পরিচয়ে একত্র করতে পারে। সেখানেই মানুষ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে প্রতিপক্ষ ভেবে। আর তাতেই রয়েছে প্রকৃত মুক্তি। সে তুলনায় জাতি-পরিচয়ে রয়েছে মানুষকে খণ্ডিত করে দেখার প্রবণতা। বাঙালি, পাকিস্তানি, ভারতীয়, ব্রিটিশ, আমেরিকান ইত্যাদি পরিচয়ে শোষিত শ্রেণীর অভিন্ন দাবি সেখানে অবমূল্যায়িত হয়। জাতীয়তাবাদের প্রতি এই বিরোধিতা কেবল মার্ক্সবাদীদের মধ্যেই সীমিত থাকেনি। ধর্মীয় দিক থেকেও তার বিরোধিতা করা হয়েছে। সেই বিরোধিতা অনেকটা সমাজবাদীদেরই অনুরূপ। তাঁরাও মনে করেন, ধর্মবিশ্বাসের বিশ্বজনীনতার মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা বিভেদ আনে। একক মুসলিম উম্মাহর কথা ভেবে মাওলানা মওদুদী পাকিস্তান আন্দোলনকালে মুসলিম জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দেননি।

তবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান ব্যর্থতা অন্য খানে। আধুনিক সমাজের যে অঙ্গীকার সে করেছিল, তার পক্ষে সম্ভব হয়নি তাকে বেশি দূর এগিয়ে নেওয়া। আর এখানেই তার মৌলিক ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে এক বিপরীত প্রবাহ তাকে আক্রান্ত করে। তাকে ধর্মীয় শক্তির প্রতিরোধের মুখোমুখি আসতে হয়। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় regression বা পশ্চাদপসরণ। একে পশ্চাদপসরণ বলা হচ্ছে, কারণ আধুনিক বাংলাদেশের ধারণাকে বিপরীত বা উল্টো দিকে নিয়ে যাওয়ার এই ধারাটিই জাতীয়তাবাদের স্থান দখল করে নিচ্ছে। কেন একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সংগ্রাম এ দেশে ব্যর্থ হলো—এর কারণ একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের দুর্বলতা বা ভ্রান্ত রাজনৈতিক কৌশল, তেমনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার নিম্নস্তর, যা আধুনিক সমাজ নির্মাণের জন্য উপযোগী নয়। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, জাতীয়তাবাদী আদর্শের চেতনাগত দুর্বলতা বলতে কী বোঝায়, যার কারণে ধর্মীয় অনুভূতির উত্থান সম্ভব হলো?

প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজতে হবে জাতীয়তাবাদী চেতনার দুটি বিপরীত বা ভিন্নমুখী ধারার মধ্যে। বাঙালি হোক, ভারতীয় হোক কিংবা পাকিস্তানি, যে জাতীয়তাবাদই

হোক না কেন, তার মধ্যে একদিকে থাকে আধুনিক সমাজ সৃষ্টির আগ্রহ ও উপাদান, অন্যদিকে থাকে তার বিরোধী উপাদানও। সে উপাদান হতে পারে ধর্মীয়, হতে পারে লোকজ সংস্কৃতি প্রভাবিত, হতে পারে আদি কোনো জাতি-পরিচয় থেকে উৎসারিত। এই দুই উপাদান বা শক্তির মধ্যে কোন শক্তির ভূমিকা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রাধান্য পাবে, তার ওপর নির্ভর করে জাতীয়তাবাদের ভাগ্য—কোন ধারায় সে বেড়ে উঠবে, সমাজকে সে কি আধুনিকতামুখী করবে, নাকি নিয়ে যাবে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার ছত্রচ্ছায়ায় এক অনাধুনিক সমাজের পথে। এই দ্বন্দ্ব বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে ছিল। আমরা সেটিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছি। সেই ব্যর্থতার কারণেই আজ সে তার নিজের দখলি ভূখণ্ডটি ধর্মীয় শক্তির কাছে হারাতে বসেছে। এটিকে জাতি-পরিচয়ের নিজস্ব সংকট হিসেবে দেখতে হবে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে ওই ধর্মীয় প্রভাব কোথা থেকে এল, সেটি আমরা কখনো পুরোপুরি উপলব্ধি করতে সক্ষম হইনি। জনাব বদরুদ্দীন উমরই সম্ভবত প্রথম, যিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধর্মীয় দিকটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া জরুরি মনে করেছিলেন। সেই উপলব্ধি থেকে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে *হলিডে* পত্রিকায় তিনি 'The Basis of Bengali Nationalism' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

তাঁর ওই প্রবন্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বাঙালি জাতির চেতনাগত ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেননি তিনি। তিনি তাঁর ধারণাকে তুলে ধরেছেন এভাবে—পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ধর্মগত পার্থক্য রয়েছে। ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত হলে অবিভক্ত বাংলা পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত হয় এবং তারা দুটি পৃথক জাতিতে পরিণত হয়। বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণী পাকিস্তানি বুর্জোয়ার সঙ্গে এক কাতারে মিলে সে সময় ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে জয়যুক্ত করে। এটিই বাঙালি জাতি-পরিচয়ের সবচেয়ে বড় সংকট। তা ছাড়া তাঁর মতে, 'শোষক ও শাসক শ্রেণীর অভ্যন্তরে এক সাম্প্রদায়িক রূপান্তর ঘটে গেছে। ওই রূপান্তরের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের মধ্যেকার পার্থক্য।'[৫] এই তাত্ত্বিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, সেটি হলো এ রকম, 'পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিতান্তই মুসলিম বাঙালির জাতীয়তাবাদ। কারণ, সেখানে পশ্চিম বাংলার হিন্দু বাঙালিরা অন্তর্ভুক্ত নয়।' তাঁর এই অবস্থানের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেছেন অনেকে, তার মধ্যে বসন্ত চ্যাটার্জি অন্যতম। চ্যাটার্জির মতে, 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ শতকরা ১০০ ভাগ নতুন এবং ১০০ ভাগ মুসলিম জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ গতিপথ বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতির ধারায় প্রবাহিত হবে।'[৬] তা ছাড়া আরও উল্লেখ করা যায় ফরহাদ মজহারের দৃষ্টিভঙ্গি, যেটি অবশ্য বদরুদ্দীন

উমরের দৃষ্টিভঙ্গির ঠিক উল্টো দিক থেকে আসা। মজহারের অবস্থানটি এ রকম, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ শুধু সাম্প্রদায়িক নয়, বরং ঘোরতরভাবে অনৈতিহাসিক। ইতিহাসের বিপরীতে তার অবস্থান। যেন বাঙালির কোনো ধর্মীয় অতীত নেই, সনাতনী হিন্দু, ইসলাম, অথবা জৈন বা বৌদ্ধ—কারও সঙ্গেই যেন ধর্ম হিসেবে কোনো সম্পর্ক নেই, যেন ধর্মীয় উপাদান রূপ-রসে পুষ্ট হয়ে এর শরীর পরিগঠিত হয়নি। বাঙালি ব্যাপারটি যেন হাওয়াই জিনিস।' (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৮)। তাঁর আরও দাবি, ইসলামের এই শক্তিশালী ভাবগত অবস্থান এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ 'মুসলমান' বলে নয়, বরং তারা একদম খাঁটি বাঙালি বলেই ইসলামের সঙ্গে তাদের এই ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক মোকাবিলা (মজহার, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২৫)। অর্থাৎ, বাঙালিত্ব ও ইসলাম তার কাছে সমার্থক।

বদরুদ্দীন উমরের মূল্যায়নটি নিঃসন্দেহে সঠিক, যখন তিনি দাবি করেন যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভ্যন্তরে ধর্মীয় উপাদানের উপস্থিতির কারণে তাকে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ ভাবা যায় না। ফলে বাংলাদেশের বাইরে পশ্চিমবঙ্গ নামে যে ভূখণ্ড আছে, সেটি বাঙালি ভাষাভাষী অধ্যুষিত হলেও সেখানে বসবাসরত মানুষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বাইরে থেকে গেছে। এই ভূখণ্ডটি অন্য এক জাতিরাষ্ট্রের অধীনে। তাদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা উপস্থিত থাকলেও সেটি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের অধীন। তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারে, কিন্তু ওই সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবল আধিপত্য থেকে বেরিয়ে এসে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে তারা অনিচ্ছুক। এই জাতীয়তাবাদ পৃথিবীর সব বাঙালির প্রতিনিধিত্ব করে না। আর সে কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদ শব্দটি ব্যবহার করাও তাঁর মতে যুক্তিযুক্ত নয়।

বদরুদ্দীন উমরের এই দাবির একটি প্রেক্ষাপট আছে, যদিও আমাদের পক্ষে জানা কঠিন তাঁর তত্ত্বগত অবস্থানটি প্রত্যক্ষভাবে তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে কি না। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় বাংলা ভাষা অ্যাকশন কমিটি নামের একটি সংগঠন গড়ে ওঠে ঠিক সেই সময়, যখন জাতীয় ভাষার প্রশ্নটি বিশেষ ইস্যুতে পরিণত হয়েছিল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে এই সংগঠন একটি আবেদনপত্র পেশ করে। ওই আবেদনপত্রে যে বক্তব্য ছিল, তার মধ্যে অনেকে সে সময়ে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেয়েছিলেন। আর সেটি হতে পারে বদরুদ্দীন উমরের ওপরে বর্ণিত অবস্থানের পক্ষে একটি প্রধান যুক্তি। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে প্রদত্ত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তৃতার পর তাঁর সঙ্গে ওই কমিটির যে সভা হয়, তাতে কেন বাংলা ভাষাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা করা প্রয়োজন, তার সম্পর্কে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল। ওই আবেদনপত্রে দেখানো

হয়, বাংলা ভাষা পাকিস্তানের দুই-তৃতীয়াংশ জনগণের ভাষা এবং যেহেতু পাকিস্তান একটি গণতান্ত্রিক দেশ, সেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, আধুনিক কালে যেকোনো রাষ্ট্রে এক বা একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকতে পারে। তার নমুনা হিসেবে অ্যাকশন কমিটি বেশ কয়েকটি দেশের উদাহরণ তুলে ধরে। যেমন: বেলজিয়ামে একটি নয় দুটি—ফরাসি ও ফ্লেমিশ ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কানাডায় ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা ভোগ করে। সুইজারল্যান্ডে একই সাথে ফরাসি ও জার্মান ভাষা রাষ্ট্রভাষা। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজি ও আফ্রিকান ভাষা রাষ্ট্রভাষা। মিসরে ফরাসি ও আরবি, থাইল্যান্ডে ইংরেজি ও থাই এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৭টি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত। তৃতীয় কারণ হিসেবে বাংলা ভাষা যে বিশ্বের সপ্তম বৃহৎ ভাষা, সেটি উল্লেখ করা হয়। চতুর্থত, এবং জনাব বদরুদ্দীন উমরের অবস্থানের পক্ষে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো প্রতিনিধিরা তাঁদের দাবির সমর্থনে বলেন, এই ভাষার সঙ্গে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। আর তা প্রমাণে ওই কমিটি যুক্তি দেখায়, বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকেরা। যেমন আলাওল, নজরুল ইসলাম, সৈয়দ ইমদাদ আলী, ওয়াজেদ আলী, জসীমউদ্‌দীন প্রমুখ। তাঁদের মতে, এ ব্যাপারে আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, বাংলা ভাষার অর্ধেক শব্দ ফারসি ও আরবি ভাষা থেকে নেওয়া। অর্থাৎ, বাংলা ভাষার ভিত্তিমূলে রয়েছে শক্ত ইসলামি ঐতিহ্য। এই বিশেষ যুক্তি বদরুদ্দীন উমরের কাছে পছন্দনীয় মনে না-ও হতে পারে। বাংলা ভাষার পক্ষে বলতে গিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেন ইসলামের সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছিলেন, সেটি হতে পারে তাঁর ক্ষোভের প্রধান কারণ। আর এ কারণে তিনি ওই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে এই যুক্তি যতটুকু না তার প্রবক্তাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে তুলে ধরে, তার চেয়ে সম্ভবত তাতে বেশি প্রতিফলিত হয় বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার জন্য তাদের প্রবল ইচ্ছা। বিশেষ করে যখন বাংলা ভাষার পক্ষে তাদের সওয়াল-জবাব করতে হয়েছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতো একজন চতুর উকিলের সামনে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু তার পরও উমরের যুক্তির সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ কম। তবে তাঁর মূল তাত্ত্বিক অবস্থানটি বুঝতে হলে ওই প্রবন্ধের আরও কিছু পাতা উল্টাতে হবে। সেখানে তিনি দাবি করেছেন, 'এটি কি সত্য নয় যে এই অতি উল্লেখযোগ্য বিবর্তন, শাসক এবং শোষক শ্রেণীর এই যে সাম্প্রদায়িক চরিত্র, তার ওপরই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মানুষের জাতীয়তাবাদী চেতনা? সেটি যদি ঠিক হয়, তাহলে কি বুঝতে হবে না যে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ হলো সাম্প্রদায়িকতার

নির্ভুল বহিঃপ্রকাশ, যা কেবল লুকিয়ে আছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের লেবাসে? বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কিছুই নয়, যার মূলে রয়েছে ধর্ম এবং তাকে দেখা উচিত নতুন এক প্রতারণার লেবাসে দ্বিজাতিতত্ত্বের পুনরুত্থান হিসেবে।'[৭] বিতর্কটি এখানে একটু ঘোলাটে হয়ে ওঠে বলা বাহুল্য। প্রথমত, পূর্ব বাংলার উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণী পাকিস্তানি বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল ধর্মীয় ভিত্তিতে একটি দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে, এ কথাটা মিথ্যা নয়। সেখানে অন্য অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সামন্তবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু সেটি যতটুকু না ছিল আঁতাত, তার চেয়ে বেশি তাকে বরং দেখা উচিত তাদের ওপর পাকিস্তানি আগা খাঁ এবং আদমজি বাওয়ানি গোষ্ঠীর চাপিয়ে দেওয়া একটি আদর্শ হিসেবে। ওই 'আঁতাতের' সঙ্গে পূর্ব বাংলার যোগাযোগ বলতে একদিকে ঢাকাকেন্দ্রিক নবাব পরিবারের হাতে গোনা কয়েকজন মানুষের উৎসাহকে বোঝায়, যারা ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রথার প্রতিনিধি এবং যাদের আদর্শের মূল ভিত ছিল ধর্ম বা মুসলিম জাতীয়তাবাদ। অন্যদিকে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে বাংলার কৃষকসমাজের যুক্ত হওয়ার কারণ ছিল, তারা মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকে শ্রেণী-শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ হিসেবে দেখেছিল। পূর্ব বাংলায় সে সময় বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল প্রায় অনুপস্থিত। শাসক বা শোষক হিসেবে শ্রেণীটি তখন কতটুকু বিকশিত হয়েছে, সে বিষয়ে তর্ক তোলা যেতে পারে। নিতান্তই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা কিছু মানুষ, যারা বাংলাকে অখণ্ড রাখার পক্ষে কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েছিল ইতিহাসের ঘোরচক্রে, তাদের শাসক বা শোষিত হিসেবে হাজির করা একটু কঠিন বৈকি। তাদের চরিত্র ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন বা পাকিস্তান আন্দোলনে কতটা নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল, তা নিয়েও মতদ্বৈধতা থাকতে পারে।

১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ধারা আত্মপ্রকাশ করে, তা সে যত ক্ষুদ্র ও আপেক্ষিকই হোক না কেন। ওই ধারা থেকেই পরে মুসলিম আওয়ামী লীগ নামে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি আত্মপ্রকাশ করে। সে কারণে অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রণবাদী এবং essentialist দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের গ্রহণ করা উচিত নয়, যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে একটি রাজনৈতিক দলকে হয় হতে হবে বিশুদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক অথবা অসাম্প্রদায়িক। যেখানে সবকিছু হওয়া চাই সাদা-কালোর মতো স্পষ্ট, পরিষ্কার, সন্দেহমুক্ত। সেখানে ইতিহাস স্তব্ধ, চেতনা বিবর্তনহীন, স্থির ও অনড়। বিষয়টি যে মিশ্র হতে পারে এবং যেকোনো রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে নানাবিধ পরস্পরবিরোধী ধারার উপস্থিতি যে স্বাভাবিক একটি ব্যাপার এবং সেসব ধারার কোনটি কোন সময়ে সক্রিয় হতে পারে এবং কোন ধারা কোন সময়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে, সেটি যে নির্ভর করে

নানাবিধ শক্তির মিথস্ক্রিয়ার ওপর, এই বিবেচনাটিকে একেবারে বাদ দেওয়া পদ্ধতিগতভাবে অনুচিত। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য, যেমন বৈশিষ্ট্য তা মানুষের চেতনার। সেখানে সিদ্ধান্তের চরিত্র ভিন্ন সময়ে ভিন্ন হতে পারে। তার উদাহরণ দুর্লভ নয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রারম্ভিককালে অঙ্কুরিত বাঙালি বুর্জোয়ারা কোনো একসময় সাম্প্রদায়িকতা কিংবা ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত ঝুঁকে গিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে থাকতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ওই অপরাধের তিলক তার কপালে চিরকালের জন্য সেঁটে দিতে হবে এবং তা থেকে তার অব্যাহতির সব পথ সব কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। এই বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীই কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে তার চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে, যদিও ধর্মীয় দুর্বলতার ছাপও তার মধ্যে যে ছিল না, তা নয়। পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা যদি বাঙালি সংস্কৃতির ধারক হয়ে থাকে, তাহলে ওই সংস্কৃতির ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সেই জাতীয়তাবাদকে বাঙালি হিসেবে মেনে নেওয়ায় তার কোনো দ্বিধা বা আক্ষেপ থাকা উচিত নয় বলেই মনে হয়।

দার্শনিক হেগেলের প্রতিপাদ্য, বিরোধী প্রতিপাদ্য ও সংশ্লেষণের (thesis-antithesis-synthesis) রৈখিক যুক্তি এ ক্ষেত্রে কিছুটা প্রাসঙ্গিক হলেও হতে পারে। উঠতি বাঙালি বুর্জোয়া যদি ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান আন্দোলনকালে সাম্প্রদায়িক হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সেটিকে থিসিস হিসেবে ধরে নিতে পারি। ওই একই বাঙালি বুর্জোয়া কিন্তু ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৬৬ ও ১৯৬৯ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন করে। তার এই চারিত্রিক পরিবর্তনকে ওই থিসিসের বিপরীত হিসেবে ধরে নিতে দোষ কী? কারণ, সেটি প্রথম থিসিসের বিপরীত। সে সময়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত ছিল। সেদিন সেই আন্দোলনে পাকিস্তানি ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদ যতই শক্তিশালী হতে থাকে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের দাবি যতই গতি পায়, ততই একটি মিশ্র চেতনার জন্ম লক্ষ করা যায়, যার প্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মীয় চেতনার মিলন ঘটে। এই মিশ্র রূপের মধ্যে দেখা উচিত বাঙালি উঠতি বুর্জোয়ার আধুনিক সমাজ নির্মাণের স্পৃহাকে। সেখানে যেমন অস্বীকার করা যায় না তার জাতীয় আবেগকে, তেমনি ধর্মীয় উপাদানের উপস্থিতিকেও। জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যে আধুনিক ও অনাধুনিকতার এই দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে লক্ষ করা গেছে বাংলাদেশকে আধুনিক একটি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনায়। ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল ধনাত্মক দ্বান্দ্বিকতা (positive dialectics)। তার মধ্যে বিকশিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল একটি আধুনিক সমাজের। কিন্তু কেন সেই প্রক্রিয়া বাংলাদেশকে উল্টো পথে নিয়ে গেল—এমন এক বিপরীত

রৈখিক অধোগতির দিকে, যাকে থিওডর এডরনো ঋণাত্মক দ্বান্দ্বিকতা (negative dialectics) বলে বর্ণনা করেছেন—তার উত্তর পাওয়া সম্ভব বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভ্যন্তরে ধর্মীয় উপাদানের উপস্থিতির বিশ্লেষণ থেকে।

চারটি মূলনীতি—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র নিয়ে বাংলাদেশ আধুনিক সমাজ নির্মাণের পথে পা বাড়ায় ১৯৭২ সালে। এই চার নীতির মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ সংগতির অভাব সত্ত্বেও স্বাধীনতাযুদ্ধ যে জাতীয় সংহতি ও দেশপ্রেমের জন্ম দিয়েছিল, তাকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক সমাজ নির্মাণের কাজটি হয়তো বা ভালো করেই সম্পন্ন করা যেত। সেটিই ছিল জাতীয়তাবাদের প্রধান শক্তি। উত্তপ্ত লোহা পিটিয়ে কামারের পক্ষে যেকোনো আকৃতি দেওয়া যেমন সহজ, একইভাবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মানুষকেও ঠিক যেকোনো দুঃসাহসী কাজে নিয়োজিত করা সম্ভব ছিল। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অমার্জনীয় ব্যর্থতা তাতে বাদ সাধে। গণতন্ত্রকে তারা একনায়কতন্ত্রে পরিণত করে আর সমাজতন্ত্রের নামে আমলাতান্ত্রিক লুটেরা পুঁজিবাদের। ধর্মনিরপেক্ষতা ধীরে ধীরে মাথা নত করে ধর্মীয় অনুভূতির প্রচণ্ড প্রতাপের কাছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধর্মীয় উপাদান রূপান্তরিত হয় ইসলামি ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের মিশ্র এক ধারায়। তবে এই পশ্চাদপসরণের কারণ এই নয় যে এককালে পূর্ব বাংলার অতি দুর্বল বুর্জোয়া গোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে ধর্মীয় আঁতাতে যোগ দিয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য। এর কারণ বরং খুঁজতে হবে অন্য খানে। বাংলাদেশের দুর্বল, অপরিপক্ব বুর্জোয়া গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হয়নি ধর্মীয় উপাদানকে এড়িয়ে আধুনিক সমাজের ভিত গড়ে তোলা। তার কারণ নিহিত যতটুকু না বাঙালি ও মুসলিম—জাতি ও ধর্মীয়—এই দ্বৈত পরিচয়ের ডিলেমাতে, তার চেয়ে বেশি একটি নতুন হেজেমনিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাদের অক্ষমতাতে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ স্বাধীন রাষ্ট্র এনে দিয়ে তার দায়িত্ব শেষ করে ফেলেছিল। তার পক্ষে উদীয়মান এবং একেবারে নতুন বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর আদর্শিক দিকনির্দেশকের দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়নি। এই নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীটি বাংলাদেশের জনগণকে দেখেছে একাধারে বাঙালি ও মুসলিম হিসেবে। ওই দুই পরিচয়ের যৌথ উপস্থিতিতে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তর কীভাবে সম্ভব, সেটি কখনো ভাবা হয়নি। যে ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে তুরস্কে, ইন্দোনেশিয়ায় ও মালয়েশিয়ায়। বাঙালি বুর্জোয়ার ওই ব্যর্থতার কারণে ধর্ম ও জাতি-পরিচয়কে এ দেশে বিপরীত মেরুতে প্রতিস্থাপন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই টানাপোড়েনের উগ্রতা একদিকে জাতি-পরিচয়কে বিসর্জন দিতে চায়, অন্যদিকে তেমনি আধুনিক সমাজ নির্মাণভাবনা ধর্ম-পরিচয়কে উপেক্ষা করে এগোতে চায়। এভাবে জাতি-পরিচয় ও ধর্ম-পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় পরস্পরের মুখোমুখি।

জাতীয়তাবাদের দুটি বিপরীত উপাদান

বদরুদ্দীন উমর ও বসন্ত চ্যাটার্জির আলোচনার মূল বক্তব্য হলো, বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিরবচ্ছিন্নভাবে বাঙালি নয়। তার অভ্যন্তরে ধর্মীয় উপাদান রয়েছে আর সে কারণে তার চরিত্র কালিমালিপ্ত। ফলে বাঙালি জাতির জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করা তার পক্ষে অসম্ভব। তাকে ওই নামে অভিহিত করা উচিত নয়। সে মিশে গেছে ধর্মীয় অনুভূতির মধ্যে। তার সঙ্গে ধর্মীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের পার্থক্য নেই বললেই চলে। উমর ও চ্যাটার্জির এই দাবিটি অযৌক্তিক। এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে হবে। সেটি হলো, জাতীয়তাবাদী আদর্শ মানুষের মনে কেন জাগ্রত হয় এবং সমাজের কোন উপাদান সেখানে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, অর্থাৎ প্রশ্নটি জাতীয়তাবাদের আধুনিকত্বকে নিয়ে। বহুকাল আগেই প্রশ্নটি তাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং সে সময়ে আলোচনাটিকে জাতীয়তাবাদের আধুনিক উপাদান বনাম প্রাচীন উপাদানের দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখা হয়েছিল। এই পলেমিকের একদিকে ছিলেন ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী গেলনার, অন্যদিকে ছিলেন জন হাচিন্স প্রমুখ। বদরুদ্দীন উমর বা বসন্ত চ্যাটার্জির মতাদর্শগত অবস্থানকে বুঝতে এবং তার ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে এই আলোচনা কিছুটা হলেও সহায়ক হতে পারে।

গেলনারের দৃষ্টিভঙ্গিগত বিশ্লেষণ বেশ কয়েকটি রচনায় স্থান পেয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী হলো *Nations and Nationalism*। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, যে বিশেষ কারণে জাতি-পরিচয়ের অনুভূতিকে কেন্দ্র করে মানুষ সংগঠিত হয়, তার মূলে একটি আধুনিক সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য কাজ করে। ওই আধুনিক অনুভূতি সমাজে কতটুকু স্থান করে নিল, যার ফলে মানুষের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনা জোরদার হলো, সেটি জাতীয়তাবাদের সাফল্যের একটি পূর্বশর্ত হতে পারে। আধুনিক অনুভূতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় কীভাবে? গেলনারের মতে, সমাজকে নিরিখ করতে হবে উচ্চ সংস্কৃতি ও নিম্ন সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে। সমাজ উচ্চতর সংস্কৃতির প্রভাবে বেড়ে না ওঠা পর্যন্ত সেখানে জাতীয়তাবাদী চেতনা সফল হতে পারে না। উচ্চতর সংস্কৃতি বলতে গেলনার মূলত বুঝিয়েছেন নাগরিক চেতনাকে। নগর আধুনিকতার পৃষ্ঠপোষক এবং গ্রামীণ জীবন নাগরিক জীবনের তুলনায় অনাধুনিক। একটি আধুনিক সমাজ বলতে এমন একটি সমাজ বোঝায়, যেখানে শিল্পায়নের মাধ্যমে উৎপাদন হয়। সে সমাজে প্রতিষ্ঠানগুলো গণতান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত হয়। শাসনব্যবস্থা নিরপেক্ষ থাকে। এক ধরনের বিশেষ আমলাতন্ত্রের সহায়তায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, যে আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রের সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করে। উচ্চতর সংস্কৃতি মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত করে। বস্তুত ব্যক্তিপরিসরকে সামাজিক

পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়। উন্নত সংস্কৃতিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ওপর মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষকে সচেতনভাবে সমাজ প্রগতিতে বিশ্বাসী করে তোলা হয়। আধুনিক সমাজের এই শর্তাবলি কখনোই পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই শর্তগুলোর অন্তত সিকি বা অর্ধেকও যদি কোনো সমাজে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সেখানে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটা এবং পরবর্তী সময়ে তার সাফল্য নিশ্চিত না-ও হতে পারে। অর্থাৎ, জাতীয়তাবাদী অনুভূতির জন্ম এবং তার সাফল্যের ক্ষেত্রে আধুনিক উপাদানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পুরোপুরি না হলেও আধুনিকতার পূর্বশর্ত হিসেবে দেশকে অন্তত কিছুটা হলেও শিল্পায়িত হতে হবে। বাকিগুলো শিল্পায়নের পর বিকশিত হতে পারে। সেই বাকিগুলো বিকশিত করার দায়িত্ব জাতীয়তাবাদের, তার সাফল্যের পর, অর্থাৎ একটি জাতি-রাষ্ট্র গঠিত হলে।

আধুনিক উপাদানের ওপর গেলনার যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তার কারণ সম্ভবত এই যে তিনি ভেবেছিলেন, মানুষের জীবনযাত্রার মানকে কিছুটা আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত না করে কোনো সমাজে জাতীয়তাবাদী চিন্তা বিকশিত ও সফল হতে পারে না। জাতীয়তাবাদ কোনো বস্তু নয়, একটি চেতনা, যে চেতনার বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা প্রধান। আধুনিক ও নাগরিক চেতনার পাশাপাশি গেলনার নিম্ন সংস্কৃতির দিকটির প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও জাতীয়তাবাদী চেতনার বিনির্মাণ ও বিকাশে তার ভূমিকা কিছুটা হলেও বিতর্কিত থেকে গেছে। নিম্ন সংস্কৃতির ধারক হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন গ্রামীণ সমাজ ও তার সংস্কৃতিকে। গ্রামীণ জীবন শহরের তুলনায় অনাধুনিক। জীবন সেখানে কৃষিভিত্তিক। গোত্রপ্রধানের ক্ষমতা সেখানে মূল ভূমিকা পালন করে। মানুষ তাঁর অধীনে বাস করে; ব্যক্তিস্বাধীনতা সেখানে অনুপস্থিত। গোষ্ঠী পরিচয়ের প্রাধান্য সামাজিক এবং ব্যক্তিপরিসরের বিভাজনকে বাধাগ্রস্ত করে। যোগাযোগের অপ্রতুলতা জন্ম দেয় সামাজিক বিচ্ছিন্নতার। প্রাধান্য পায় সেখানে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা। ফলে দুই বিপরীতধর্মী ধারার মধ্যে সমতা আনার প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় গ্রামকে শহুরে চেতনার পর্যায়ে উন্নীত করার। উভয়ে এক অভিন্ন পর্যায়ে না এলে জাতীয়তাবাদের বিজয় সম্ভব না-ও হতে পারে, অথবা হলেও পরবর্তী সময়ে স্বাধীন রাষ্ট্র আধুনিক জীবন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হতে পারে। অর্থাৎ, গেলনার গ্রাম ও শহরের মধ্যে ভারসাম্যকে দেখেছেন জাতীয়তাবাদের বিজয়ের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে। তাঁর আশঙ্কা, এই পূর্বশর্ত পূরণ না হলে জাতীয়তাবাদের মধ্যে গ্রামীণ প্রাচীন ধর্মীয় প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে তার মূল উদ্দেশ্যকে ভণ্ডুল করে দিতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে ঘটতে পারে ওই পশ্চাদপসরণ, যেটি ইতিমধ্যে দেখানো হয়েছে থিওডর এডরনোর ঋণাত্মক দ্বান্দ্বিকতায় (negative dialectics)।

তবে যে উপায়ে গেলনার এই দুই চেতনার সমতা অর্জন সম্ভব বলে মনে করেন, সেটি কোনো স্বল্পমেয়াদি প্রক্রিয়া নয়। দীর্ঘমেয়াদি সেই পথে শিক্ষার বিস্তার, সংবাদপত্র পাঠ, তথ্য সম্প্রচার, অর্থনীতি এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের পার্থক্য দূর করাকে প্রধান উপায় হিসেবে দেখতে হবে। শহর ও গ্রামের পার্থক্য ডিঙিয়ে কীভাবে গ্রাম ও শহরের এই সমতা অর্জন সম্ভব? যদি ওই সমতা অর্জিত না হয়, তাহলে কি জাতীয়তাবাদ নিয়ে চিন্তা করা একেবারেই বৃথা? সে প্রসঙ্গে গেলনারের বক্তব্য যে নেই, তা নয়। তাঁর নিরীক্ষণ এ ক্ষেত্রে দ্বিমুখী। শহর ও গ্রামের সমতা অর্জনের একটি পথ তাঁর মতে হতে পারে শহরের উন্নত সংস্কৃতিকে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া অথবা গ্রামের নিম্ন পর্যায়ের সংস্কৃতিকে যেভাবেই হোক শহরের পর্যায়ে উন্নীত করা। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'শিল্পায়িত সমাজের জন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষাক্ষেত্রে সমান অগ্রগতি। ওই অগ্রগতির ফলে সমাজের উচ্চ ও নিম্ন সংস্কৃতির মিলন ঘটে। এটি সম্ভব হয় জনসাধারণের ওপর উচ্চ সংস্কৃতির উপাদান চাপিয়ে দিয়ে। অথবা নিম্ন সংস্কৃতিকে উন্নত করে উচ্চ সংস্কৃতির পর্যায়ে নিয়ে এসে। এভাবেই সম্ভব হয় জাতীয়তাবাদী আদর্শের সঞ্চালন।[৮] কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসব উপদেশের বাস্তবায়ন যেহেতু সময়সাপেক্ষ, সেহেতু জাতি-আকাঙ্ক্ষাকে কি সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না গ্রাম ও শহরের মধ্যে আদর্শগত এবং সংস্কৃতিগত পার্থক্য কমে আসছে অথবা সম্পূর্ণ বিমোচিত হচ্ছে?

গেলনারের এই শর্ত অনেকের কাছে নিতান্তই একপেশে মনে হয়েছে। তাঁদের মতে, পূর্বশর্ত হিসেবে জাতীয়তাবাদী শক্তির অভ্যন্তরে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির একচেটিয়া আধিপত্য অর্জন কখনো সম্ভব নয়। বিশেষ করে অনুন্নত সমাজের ক্ষেত্রে যা লক্ষণীয়; সেখানে অর্থনীতি অনুন্নত। গ্রাম তো বটেই, শহরও ওই অনুন্নতির মধ্যে আটকা পড়ে থাকে। ফলে মানুষের মনকে নির্ভেজাল আধুনিক চিন্তায় গড়ে তোলা সেখানে সম্ভব না-ও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে কি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে মানুষ দূরে থাকবে কিংবা তাদের জাতি-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে চেপে রাখাই যুক্তিসিদ্ধ বা শ্রেয় মনে করবে? এই প্রশ্নটি মাথায় রেখেই অনেকে জাতীয়তাবাদের উত্থানে আধুনিক নয়, এমন প্রাচীন আদি পরিচয় কোনো ভূমিকা পালন করতে সক্ষম কি না, সে বিষয়ে কৌতূহলী হয়েছেন। জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বস্তুত দুটি বিপরীত বা ভিন্নমুখী শক্তির যোগফল হিসেবে দেখতে হবে। যে জাতীয়তাবাদই হোক না কেন, তার মধ্যে একদিকে থাকে আধুনিক সমাজ সৃষ্টির উপাদান বা আগ্রহ; অন্যদিকে থাকে তারই বিরোধী উপাদান। সে উপাদান হতে পারে ধর্মীয়, হতে পারে লোকজ সংস্কৃতি-প্রভাবিত, হতে পারে আদি কোনো জাতি-পরিচয় উদ্ভূত। সুতরাং আমাদের এবার দেখতে হবে, ওই ধর্মীয় প্রভাব বাঙালি জাতীয়তাবাদের কোন অংশে লুকিয়ে ছিল এবং তার উত্থান কীভাবে সম্ভব

হলো। ইতিহাস থেকে আমরা দেখি, প্রতিটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অনিবার্যভাবে আধুনিক সমাজের ধারণার পাশাপাশি প্রাচীন ঐতিহ্যের ভূমিকা ছিল। প্রতিটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রাচীন ধর্মীয় উপাদান সহাবস্থান করেছে আধুনিক চেতনার সঙ্গে। এমনকি দেখা গেছে, প্রাচীন অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা বরং আরও শক্তিশালী হয়েছে।

সেদিক থেকে বিবেচনা করলে গেলনার যতই দাবি করুন না কেন, তাঁর পক্ষে যুক্তি দেখানো কঠিন, কেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হিন্দুধর্মের প্রতীক যেমন কালী এবং হিন্দুধর্মীয় প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান মানুষের মনকে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারায় প্রবাহিত করায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এবং সে সময় সেগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহারও করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত বিপিন চন্দ্রের বিশ্লেষণ এখানে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয়তাবাদের আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে হিন্দুধর্মের প্রতীক ও প্রথাকে রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছিল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে। উদাহরণ হিসেবে তিনি 'স্বরাজ' শব্দটির বিশ্লেষণ করেছেন। দেখা যায়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শব্দটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে, যদিও প্রত্যয়টি নিতান্তই ধর্মীয় এবং তার অর্থ হলো আত্মনিয়ন্ত্রণ : নিজের মন ও আত্মার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা। এই আত্মনিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় একজন ভক্তের মনকে পাপমুক্ত রাখা। কিন্তু সেটি যখন রাজনীতিতে প্রয়োগ করা হলো, তখন তার অর্থ আর ধর্মীয় থাকল না। তার মধ্যে মানুষ অনুভব করল ভারতবর্ষের পাপকে—ব্রিটিশ শাসন বা পরাধীনতা যার মূর্ত প্রতীক। এই আত্মোপলব্ধি মানুষের মনে পাপমুক্ত হওয়ার প্রবল আগ্রহের জন্ম দিয়েছিল। ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামাজিক ও ধর্মীয় উভয়ে একসঙ্গে মিলে যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল, সেটি অতি সহজেই মানুষের মনকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে। হিন্দুধর্মে যে দেবীর গলায় ঝোলানো রয়েছে মানুষের মাথা, সেই মা কালীর প্রতীকও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে বলে দাবি করেন অনেকে।[৯] একইভাবে গান্ধী নিজেও তাঁর অহিংস আন্দোলনে আধুনিক নয় এমন সব ধর্মীয় উপাদান ব্যবহারে কার্পণ্য করেননি। দেবদেবীর মাহাত্ম্য এবং তাঁদের ক্ষমতা ও ঐশ্বরিক গুণাবলির দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে তিনি অতি দ্রুত জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার ঘটাতে পেরেছিলেন জনগণের মধ্যে।

ধর্মীয় প্রতীক মানুষের মনের বিশেষ স্থানে আঘাত করে। মানুষের সুদীর্ঘ বিবর্তনে স্থান করে নেওয়া ধর্মীয়, প্রথাগত অথবা পূর্বপুরুষের কীর্তিময় কোনো মুহূর্ত জাগিয়ে তোলে গোত্রীয় সংহতিকে। ফলে তার পক্ষে মানুষের চেতনার গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। সম্ভব হয় জাতীয় সংহতি গড়ে তোলা। দক্ষিণ আমেরিকায় লিবারেশন থিয়োলজি বাইবেলকে মার্ক্সবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছিল।

নিকারাগুয়ার বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। ধর্মীয় ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তান আন্দোলনকেও এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে নিতে আপত্তি নেই। সেখানে ধর্মীয় প্রতীকের শক্তিশালী আবেদন প্রমাণ করেছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রাচীন অনুভূতির গুরুত্ব। যেসব সমাজে জাতীয়তাবাদের পূর্বশর্ত হিসেবে আধুনিক উপাদানের বিকাশ পরিপূর্ণভাবে ঘটেনি বা তার ঘাটতি রয়েছে, সেসব সমাজে প্রাচীন চেতনাকে জাতীয় জাগরণে ব্যবহার এমনকি অপরিহার্যও বোধ হতে পারে। জাতীয় সংহতিতে আধুনিক চেতনার ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ তার অনাধুনিক অতীতের প্রভাবও। সে কারণে এই দুটির কোনোটিকেই একক কারণ হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন নয়। তাদের উভয়ের ভূমিকাই প্রণিধানযোগ্য, তা যত তীব্র ও আপসহীনই মনে হোক না কেন তাদের ভিন্নতা। কথাটা যে সত্য, তার প্রমাণ মেলে অতীত ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের উৎস অনুসন্ধানে। সেখানে কেবল আধুনিকতা অথবা নিরঙ্কুশভাবে প্রাচীন সংহতি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সফলতার জন্য যথেষ্ট ছিল না কখনো। তার প্রমাণ মেলে জন হাচিন্সন ও অ্যান্থনি স্মিথের গবেষণায়।[১০] তাঁরা দুজন দেখিয়েছেন, কত দীর্ঘ ছিল ইউরোপে জাতীয়তাবাদের পথ। একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত মনের বিকাশ এবং জাতি অনুভূতি সৃষ্টিতে, তাঁদের মতে, প্রাচীন হিব্রু ও গ্রিক ভাষা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ওই দুই প্রাচীন ভাষা রেনেসাঁস এবং পরে রিফর্মেশনের আমলে ইউরোপের সংস্কৃতিতে গুরুত্ব পায়। যার প্রভাবে জন্ম নেয় গ্রিক এবং রোমান দেশপ্রেম ও জাতি-পরিচয়।

ইংল্যান্ডে ক্যালভিনের নেতৃত্বে যে ধর্মীয় সংস্কার ঘটে, সেখানে ওল্ড টেস্টামেন্টকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী চেতনা জোরদার হয়েছিল। সেখানকার মানুষ ধর্মীয় অনুভূতিকে আপামর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে জন্ম দিয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লবের। একইভাবে ১৭৭৫ সালে পোল্যান্ডের প্রথম ধর্মীয় বিভক্তি থেকে জাতীয়তাবাদী চেতনা জন্ম নিয়েছিল। ইহুদি ধর্মে বিশ্বাসীদের ওপর সুদীর্ঘ নির্যাতন, অত্যাচার, নিপীড়ন এবং পবিত্র ভূমি থেকে উচ্ছেদ ও বাস্তুহারা জীবন তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে রেখেছিল বিশেষ অবদান। ১০০ বছরের যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ও ফরাসি জাতীয়তাবাদ ইউরোপে শক্তি অর্জন করে, যার ফলে জন্ম হয় দুটি পৃথক রাষ্ট্রের। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, পোল্যান্ডে জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধে ওঠে ধর্মীয় বিভেদকে (ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট) পুঁজি করে। ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট পরিচয় সেখানে পালন করে প্রধান ভূমিকা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনে যে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়, তার মূলে ছিল উগ্র মুসলিম বিরোধিতা ও উগ্র ক্যাথলিকবাদী বিশ্বাস। কোরিয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কনফুসীয় ধর্মের বিশুদ্ধতার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক

জাতীয়তাবাদ। একইভাবে জাপান ও চীনে জাতীয়তাবাদের উত্থানে বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা উল্লেখ করা যায়। বস্তুত, ক্লিফোর্ড গিৎজ তাঁর রচনায় ধর্মীয় অনুভূতির এই দ্বৈত প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন (Clifford Geertz, একে টম নাইরন বলেছেন double inwardness)।

জাতীয়তাবাদ যে নিরবচ্ছিন্নভাবে আধুনিক কিংবা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রাক-আধুনিক সংহতি দিয়ে প্রভাবিত হয় না, বরং তার সাফল্য নির্ভর করে তাদের দ্বৈত প্রভাবের ওপর, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাঙালি জাতীয়তাবাদ। আমরা দেখতে পাই, গেলনারের পূর্বশর্ত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঠিক উপযুক্ত ছিল না। যদি তার কথামতো নাগরিকতার শর্তটি প্রধান হতো, তাহলে বেশ জটিল হয়ে দাঁড়াত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের বিষয়টি। ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান একটি কৃষিপ্রধান প্রদেশ ছিল। এমনকি ঢাকা নগরী ও অন্যান্য মফস্বল শহরের সঙ্গে গ্রামের পার্থক্যের পরিধি আজকের তুলনায় শতগুণ কম ছিল। শহরগুলো ছিল মূলত গ্রামেরই সম্প্রসারিত রূপ। কৃষক, দিনমজুর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা জীবনের অধিকাংশ সময়ে বিচ্ছিন্ন থাকতেন শহরের সামাজিক গতিধারা থেকে। শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রাম-শহরের অসমতা ছিল চোখ-ধাঁধানো। শহরের উচ্চ সংস্কৃতি ও গ্রামের নিম্ন সংস্কৃতির মিলন ঘটেনি। গ্রামের নিম্ন সংস্কৃতির পক্ষে উচ্চ সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রশ্নই ছিল অবান্তর। একইভাবে উচ্চ সংস্কৃতির চুইয়ে পড়া প্রভাবে গ্রামের নিম্ন সংস্কৃতি উপকৃত হয়েছে, তেমন বিশেষ দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে ছিল না। কিন্তু তার পরও শহুরে বাঙালি সমাজের চেতনা অতি দ্রুত জাতীয়তাবাদী খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। ধারণা করা যায়, জাতিসত্তার পরিচয় ও অর্থনৈতিক দাবির কারণে এই শহুরে জাতীয়তাবাদী অনুভূতি গ্রামের মানুষকেও আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। ব্যাপারটা যদি তা-ই হয়, তাহলে কিন্তু ধরে নিতে হবে, দুই বিপরীতমুখী চেতনা আধুনিক ও অনাধুনিকের প্রভাব বাঙালি জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করেছিল কোনো না কোনোভাবে। তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কিন্তু সে কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না যে জাতীয় অনুভূতির প্রতি গ্রামীণ সমাজ ছিল নির্লিপ্ত এবং কেবল শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকার কারণেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম। হতে পারে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাংলাদেশের কৃষকসমাজ তার অনুভূতি প্রকাশ করেছিল ভিন্ন ঢঙে, তার নিজস্ব মনসত্ত্ব ব্যবহার করে। অথবা তাদের সমর্থন ছিল নীরব ও পরোক্ষ। কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, আন্দোলন, জীবনদান ইত্যাদির অভিঘাত তাদের চেতনাকে উদ্বেলিত করেছে সন্দেহাতীতভাবে। ভাবের বহিঃপ্রকাশে হয়তো তারা শহুরে মানুষের থেকে ভিন্নতা দেখিয়েছে। আমাদের ইতিহাসচর্চা এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী

আন্দোলনের অবদানকে পরিপূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে, আর সে কারণে তা আজ অপরাধী হয়ে আছে এই গ্রামীণ মানুষের কাছে। জাতীয়তাবাদী চেতনার বৃহত্তর পরিসরে ওই বিশাল গ্রামীণ সমাজ কোন স্থান দখল করেছিল এবং তাদের চেতনা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল—এ প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং আজকের দিনের ধর্মীয় চেতনার উত্থানের পূর্বশর্ত।

শহুরে চেতনার সঙ্গে গ্রামীণ চেতনার সংযুক্তি হলো কীভাবে

আমরা দেখেছি, বাঙালি জাতি পাকিস্তানিদের সঙ্গে তার জাতিগত পার্থক্য এবং নিজেদের জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার কাজে সুচিন্তিতভাবে দুটি প্রধান অস্ত্র ব্যবহার করে। তার একটি সোনার বাংলা নামে কাল্পনিক এক দেশের ধারণা, অন্যটি তার ভাষা। এ দুয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয় আধুনিক রাষ্ট্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা। সোনার বাংলার প্রতীকে রয়েছে আধুনিক উপাদানের উপস্থিতি, ঠিক একইভাবে বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলনেও লক্ষ করা যায় আধুনিক উপাদানের প্রভাব। ভাষাকে সব কালেই আধুনিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। ভাষা আধুনিক শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা নাগরিক জীবনকে সমষ্টিবদ্ধ সামাজিকতায় পরিণত করে। সংবাদপত্র ও টেলিভিশনসহ অন্যান্য গণমাধ্যম ওই প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নেয়। একইভাবে সোনার বাংলা বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে এবং তা বাঙালির সার্বভৌমত্বের প্রতীক। সোনার বাংলা বাঙালির মনে নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছিল, পার্থ চ্যাটার্জি যাকে 'সার্বভৌমত্বের একটি আধার' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[১১] সোনার বাংলা বলতে একটি সমৃদ্ধিশালী সমাজকে বোঝায়, যে সমাজে মানুষের সার্বিক মঙ্গল ও ব্যক্তির সার্বিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা রয়েছে। সোনার বাংলায় জীবনের আরও বৃহৎ বৃহৎ এলাকাকে যুক্ত করার সম্ভাবনা নিহিত। অর্থাৎ, সোনার বাংলার উদ্দেশ্য ছিল পুরোনো ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে সে সময় লেখা হয়েছিল, এই দল বর্তমানের অবিচারের কাঠামোকে বদলে দিতে চায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন ইশতেহার প্রণয়ন করে। এই গঠনতন্ত্রে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য দূর হবে, দূর হবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ।[১২] ফলে যে দুটি অস্ত্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানকে নিশ্চিত করেছিল, তারা উভয়েই বাঙালি জাতিকে আধুনিক এক সমাজের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বলে দাবি করা যায়।

তবে এই আধুনিক চেতনার বাহক ছিল সেকালের শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বাংলা ভাষার পক্ষে-বিপক্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা উভয়েই শহুরে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী

থেকে আসা। সে কারণে যখন দাবি করা হয়, জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে ভাষা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে, তখন সে কথার দ্বারা শহরের আধুনিক সমাজের অবদানকে বোঝানো হয়। এই দাবি যথার্থ। কারণ, ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র যে কতটা অযৌক্তিক ছিল, সেটি ভাষার প্রতি ওই রাষ্ট্রের আচরণ থেকে বোঝা গিয়েছিল, আর তা প্রথমেই বুঝেছিল শহরের মানুষ; বিশেষ করে তার অগ্রবর্তী অংশ—মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচি শহরে অনুষ্ঠিত এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার আয়োজিত প্রথম জাতীয় শিক্ষাবিষয়ক তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী ফজলুর রহমান বাংলা ভাষার প্রতি অবমাননামূলক এক বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, 'আরবি এবং পার্সি ভাষাকে বিশেষ স্থান দিতে হবে। কারণ, তারাই পাকিস্তানের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উৎস।' তিনি উর্দু ভাষার ওপরও বিশেষ জোর দিতে বলেন। কারণ, ওই ভাষা পাকিস্তানের জাতিগত ও ভাষাভাষী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ঐক্যের একমাত্র মাধ্যম হতে পারে। উর্দুর আছে অতিমাত্রায় উৎকৃষ্ট ঐতিহ্য, যার ভিত্তিমূলে রয়েছে অন্য ভাষা থেকে নেওয়া ভাব এবং শব্দ। সেই সঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, উর্দু ভাষার সঙ্গে রয়েছে পার্সি, আরবি ও সংস্কৃত ভাষার ঐতিহাসিক বন্ধন।[১৩] ১৯২৭ সালেও লেখা হতো, 'উর্দু ভাষা না থাকিলে আজ ভারতের মুসলমানদের জাতীয়তাবিহীন ও কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হইত তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাংলাদেশের মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙলা হওয়াতে বঙ্গীয় মুসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তাহারা জাতীয়তাবিহীন নিস্তেজ দুর্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে।' (আহমদ শরীফ, পৃষ্ঠা ৭২)। এসব তত্ত্বীয় প্রতিরোধ উপেক্ষা করে শহুরে মধ্যবিত্ত বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলে।

প্রশ্ন হলো, ভাষাকে রক্ষা এবং সোনার বাংলা পুনরুদ্ধার—এই দুই সংগ্রাম যদি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান উৎস হয়ে থাকে,[১৪] তাহলে সেই আন্দোলনের সঙ্গে গ্রামের মানুষ যুক্ত হলো কীভাবে? কীভাবে শহুরে মধ্যবিত্তের সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের চেতনার সংযুক্তিকরণ ঘটল এবং সৃষ্টি হলো শহর-গ্রামের অভিন্ন বাঁধন। এই ঐক্যের প্রশ্নটি অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমরা এতকাল বিষয়টি নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহ দেখাইনি। দেশের বাকি ৯৫ শতাংশ মানুষ, হিসাবটি যদি ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ধরা হয়, যারা গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে যুক্ত, তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া জাতীয়তাবাদের সাফল্য আশা করা বৃথা ছিল। কিন্তু তার পরও প্রসঙ্গটি জাতীয়তাবাদীদের আলোচনায় উহ্য থেকে গেল কেন, সে প্রশ্ন আজ আমাদের তোলা উচিত। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অবশ্য একসময় লিখেছিলেন, 'বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়োজনীয়তার কথাটা বুদ্ধিজীবীরাই প্রথমে তুলেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের সে দাবিতে প্রাণ ছিল না। প্রাণ

দিয়েছে ছাত্ররাই। ছাত্ররাও পারত না যদি না সাধারণ মানুষকে পেত তাদের সঙ্গে।' (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২০০২, পৃষ্ঠা ২০৫)। বুদ্ধিজীবী বা ছাত্রসমাজকে এখানে শনাক্ত করা কঠিন নয়। কিন্তু যখন জনগণ নামে এক বিশাল সংখ্যার (quantity) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তখন এই জনগণ কারা এবং কীভাবে তারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রাণের সঞ্চালন করেছিল, সেটি পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে ওঠে না। জনগণকে বিমূর্ত কোনো গোষ্ঠী হিসেবে আমরা ভাবতে পারি না। তারা হতে পারে শহরের শ্রমিক, পেশাজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যাদের নৈতিক সমর্থন ছাড়া কোনোভাবেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় সম্ভব হতো না। কিন্তু জনগণ বলতে যদি শহরের এই কিয়দংশকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে বাকি থাকে গ্রামের ওই বিশাল জনসংখ্যা। গ্রামীণ সেই জনতার অংশগ্রহণ বলতে কী বোঝায় এবং তাদের ভূমিকার ধরন কেমন ছিল, সেটি 'জনগণ' এই বিমূর্ত ধারণাটির মধ্যে ধরা পড়ে না। এই গ্রামীণ জনগণ সভা-সমাবেশে অংশ নেয়নি সত্য। প্রতিবাদের প্রকাশে তাদের অংশগ্রহণ হয়তো নিতান্তই ক্ষীণ অথবা একেবারেই ছিল না। কিন্তু এই বিশাল পশ্চাদ্‌ভূমির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমর্থন ব্যতীত ২৫ বছর দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী ধর্মীয় প্রতিরোধকে পরাভূত করা কতটুকু সম্ভব হতো, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। একপর্যায়ে নিশ্চয় শহরের চেতনার সঙ্গে গ্রামীণ চেতনার এক অভিন্ন কারণে মিলন ঘটেছে এবং উভয়ের চেতনা এসে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্তাল তরঙ্গ। সেই চেতনা কী, তার কোনো বিশেষ অংশ শহুরে চেতনার সঙ্গে মিলিত হলো কি না এবং তাদের উভয়ের যৌথ ভূমিকা কীভাবে গড়ে উঠল, যা পুরো বাঙালি জাতিকে অভিন্ন এক সুতায় বাঁধতে সক্ষম হয়েছে, প্রশ্নটি সেখানে।

এই প্রশ্নের উত্তর কী হবে, তার ওপর নির্ভর করবে বদরুদ্দীন উমর বা বসন্ত চ্যাটার্জির বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিয়ে অভিযোগের একটি সৎ বিশ্লেষণ এবং মীমাংসা। বস্তুত, সেখানে লক্ষ করা যাবে, যে মুসলিম ধর্মীয় উপাদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা উভয়েই বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অস্পৃশ্য ভাবছে, সেটি যতটুকু না বাঙালির মধ্যবিত্ত শ্রেণী অথবা যাকে বদরুদ্দীন উমর শোষক ও শোষিত হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন তাদের ভ্রান্তি, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী এই বিশাল গ্রামীণ জনগণের অনাধুনিক চেতনার প্রভাব, যে গ্রামীণ জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত বাংলায় জাতীয়তাবাদ ও ভাষা আন্দোলন সফল হতো না। আবার তাদের কারণেই আমরা প্রত্যক্ষ করছি ধর্মীয় চেতনার এক অভূতপূর্ব উত্থান। ১৯৪৭ সালের বাঙালি মধ্যবিত্ত ধর্ম নিয়ে যেটুকু মাতামাতিটা করেছিল এবং যার ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম সম্ভব হয়েছিল, তা ছিল হিমশৈলীর চূড়া মাত্র (tip of the iceburg)। বরফ পাহাড়ের বিশাল দেহ, যার মধ্যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের মূল

শক্তি নিহিত ছিল, সেটি ছিল ওই কৃষকসমাজের মধ্যে। এখানে প্যারাডক্সটা হলো, এই কৃষকশ্রেণীর ধর্মীয় চেতনাই সেদিন শহুরে চেতনার সঙ্গে মিলে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে রক্ষা করেছিল। সম্ভব করেছিল তার বিজয়কে। আবার এই গ্রামীণ ধর্মীয় চেতনাই ৪২ বছর পর নতুন ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উৎসভূমি পরিণত হতে চলেছে আমাদের সবার অলক্ষ্যে, যেহেতু এই অংশটির প্রতি আমাদের অবহেলা ৪২ বছর আগে যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে।

আধুনিকতার মূল উৎস ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, উঠতি শিল্পপতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনা। গ্রাম থেকে আধুনিকতার জন্ম হতে পারে না। শহরের মানুষের মনন আধুনিকতার স্পর্শে বেড়ে ওঠে। গ্রামীণ মানুষ সনাতনী প্রথাগত চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। সে কারণে পার্থ চ্যাটার্জি গ্রামীণ সমাজে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে প্রতীকের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, 'মানুষ যখন অদ্ভুত আচরণ করে এবং নিজের আত্মপরিচয়ের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তখন ওই কাজকে প্রতীকী হিসেবে দেখা উচিত। এই প্রতীকী জগৎ হয়তো বা তার দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। কিন্তু ওই প্রতীকী জগতের ওপর নির্ভর করে সে প্রকৃতি সম্পর্কে তার নিজস্ব ধারণা গড়ে তোলে, প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং ওই সম্পর্ক যে নিয়মে বাঁধা, সেটিও তার মধ্যে নিহিত থাকে।'[১৫] বাংলাদেশের কৃষকসমাজের ক্ষেত্রে ওই প্রতীকী চেতনাটি কী হতে পারে, যদি আমরা বিষয়টিকে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করি? যদি এটি সঠিক হয় যে, কৃষকসমাজ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে এক বিশেষ উপায়ে এবং সে উপায়টি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল, তাহলে জীবন বাঁচানোর প্রাত্যহিক সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় বিমূর্তের চেয়ে বাস্তব এবং অনুভবযোগ্য বস্তুর মাধ্যমে তার অনুভূতি প্রকাশ করা স্বাভাবিক। তাহলে ধরে নিতে হয়, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, যেমন ভাষা আন্দোলন, ছয় দফার আন্দোলন তার চেতনায় আঘাত করেছে পরোক্ষভাবে এবং সেভাবেই সে সম্পৃক্ত হয়েছে জাতীয়তাবাদী চেতনার বৃহত্তর ধারার সঙ্গে।

ভাষা আন্দোলনের শহীদ কিংবা সোনার বাংলাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় আত্মদান, এ দুয়ের পেছনেই একটি শক্তিশালী মানবিক অনুভূতি লক্ষ করা যায়—সেটি হলো হারানোর অনুভূতি। বাঙালি তরুণ যখন নিজের জীবন আত্মাহুতি দেয় বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায়, তখন সেখানে অন্যরা বেদনা ও হারানোর ব্যথা অনুভব করে। সেটিই মানুষ নিজের মনে প্রধান অনুভূতি হিসেবে গেঁথে রাখে। সেই বেদনামিশ্রিত অনুভূতির সঙ্গে গ্রামীণ সমাজ একাত্ম হয়েছিল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক স্মৃতি বা memories-এর প্রভাবে। আবেগধর্মী ওই দুই ঘটনার একটি পলাশীর যুদ্ধ, অন্যটি কারবালায় হোসেনের করুণ মৃত্যু। এই দুই

চেতনা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকসমাজের কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী চেতনা, ওই চেতনা গ্রামীণ মানুষের মননের প্রধান খোরাক, ওই দুই চেতনা গ্রামীণ কৃষকসমাজের চেতনার উৎস—জাতীয়তাবাদী অনুভূতি প্রকাশে যার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে মুখ্য। এই চেতনা গ্রামীণ মানুষকে সংযুক্ত করেছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে, যদিও পরোক্ষভাবে। পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর হাতে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন এবং করুণভাবে মৃত্যুবরণ করেন। সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুকে বাংলার মানুষ সমীকরণ করেছিল সোনার বাংলাকে হারানোর সঙ্গে। ওই হারানোর ব্যথা তার একমাত্র সঞ্চয় ছিল, যদি জাতি-পরিচয়ের দিক থেকে ভাবা হয়। ঐতিহাসিকভাবে বাংলার স্বাধীন অস্তিত্ব সব কালেই সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। সে কারণে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যখন শুরু হয়, তখন তাকে শূন্য থেকে শুরু করতে হয়নি। খুঁজতে হয়নি বাঙালি জাতির সংজ্ঞা বা অস্তিত্বকে। গ্রামবাংলায় মানুষের মনে সোনার বাংলার ধারণা দীর্ঘকাল ধরে বাসা বেঁধে ছিল, যে ধারণা আদিকাল থেকে মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসন পেরিয়ে পৌঁছেছে আধুনিক যুগে। বাংলার কৃষক নিশ্চয় লক্ষ করেছে, বখতিয়ার খিলজির সময়কাল (লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের পর) থেকে দিল্লির সালতানাতের ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করে বাংলা কীভাবে তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে। তার সেই অস্তিত্বে রয়েছে কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণের পৌরাণিক উপাখ্যানের বাংলায় অনুবাদ অথবা কবি পরমেশ্বরের মহাভারত অনুবাদ। পরবর্তী সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে এবং ব্রিটিশ ভারতের পরাধীনতার পরিবেশেও বাংলা তার আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এক অভিন্ন অতীতকে কেন্দ্র করে সোনার বাংলা নামে এক কাল্পনিক জন্মভূমির ধারণা বিকশিত হয়েছে তার মনে, যেখানে বাংলা স্থান করে নিয়েছে সম্পদশালী ও দুঃখহীন এক অঞ্চল হিসেবে।

আর সে কারণেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় সোনার বাংলার প্রতীক জাতি-পরিচয়ের প্রধান উপকরণ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পরিচয়টি অতীত থেকে পাওয়া হলেও তার মধ্যে বাঙালি স্বপ্ন দেখে এক আধুনিক বিত্তশালী পৃথক আবাসভূমির। হতে পারে নবাব সিরাজউদ্দৌলা একজন দুর্বল শাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরাজয়ের সঙ্গে যে ট্র্যাজেডি যুক্ত, তার সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের একাত্ম হওয়া কঠিন ছিল না। তাঁর পরাজয়ের কারণ তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা। তাঁর মৃত্যু ঘটে ইংরেজ সেনাবাহিনীর হাতে, যাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন মীর জাফর। অর্থাৎ এই ট্র্যাজেডির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁর আপনজনেরা। সিরাজউদ্দৌলার খালা ঘসেটি বেগম এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা, যিনি তাঁর ছেলে শওকত জংকে ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছিলেন। এই ষড়যন্ত্র ব্রিটিশ ও বাঙালি

বণিক শ্রেণীর অশুভ আঁতাতের ফসল ছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধ ছিল একদিকে ক্ষমতাসীন বাঙালি এলিট শ্রেণীর বিরুদ্ধে, অন্যদিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে। নবাবের পরাজয় বাংলার স্বাধীনতার সমাপ্তি টানে, আর সে কারণে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিণত হন স্বাধীনতার প্রতীকে। নবাব ওই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু বাঙালি কৃষকসমাজের মনে গেঁথে আছে একটি শোকাবহ মুহূর্ত হিসেবে। সেটি হারানোর শোক, ভাষাশহীদদের জন্য যেমন। বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিয়ে তাঁরা বাংলাদেশকে রক্ষা করেছিলেন।

পলাশীর পরাজয়ের ওই বেদনাবিধুর মুহূর্তটিকে কৃষকের চেতনায় পরিণত করার ক্ষেত্রে বাংলার লৌকিক ও ঐতিহ্যবাহী সনাতনী সাংস্কৃতিক মাধ্যমের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। যার একটি ছিল যাত্রা। একধরনের ফোক অপেরা হিসেবে এই যাত্রা খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রচলন ছিল এবং এককালে গ্রামীণ জীবনের অবিভাজ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। খোলা মঞ্চের সামনে মিলিত হয়ে সিরাজউদ্দৌলার করুণ কাহিনির সঙ্গে শ্রোতাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, তাদের হাসি, কান্না এবং অসহায়ত্বের সঙ্গে যুক্ত হয় সংগীত, নৃত্য, অর্কেস্ট্রা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রবল আওয়াজ। আর তা থেকে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, সেটি ভালো ও মন্দের সংঘর্ষ দিয়ে প্রকাশ পায়। গ্রামের মানুষ দুয়ের পার্থক্যকে বোঝে অনেক সহজ-সরলভাবে। সুন্দর বর্ণনা, দর্শক-অভিনেতাদের অতি নিকট সম্পর্ক, নবাব সিরাজউদ্দৌলার জীবন-বর্ণনায় নাটকীয়তা এবং ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে তাঁর নিগৃহীত হওয়া ও পরিশেষে মৃত্যুবরণ নিয়ে ছিল গ্রামীণ জীবনের এই কথকতা। এই করুণ ইতিহাস যেটি সঞ্চিত হয়েছে তার চেতনায় বারবার পুনরাবৃত্ত হয়ে, সেটি তার নিজের, তার দেশের আর সে কারণে পাকিস্তানের হাতে নিহত একুশের শহীদেরা অতি দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে যায় জাতীয় দুঃখের প্রতীকে। সেখানে গ্রামীণ চেতনার সরলতা কোনো বাধা হয়ে দেখা দেয় না। বাঙালি কৃষকসমাজ এই চেতনাকে পাশ কাটিয়ে যায়নি। সে পরোক্ষভাবে সংহতি প্রকাশ করেছে তাদের শহুরে ভাইবোনদের সঙ্গে তাদের আন্দোলনে।

কৃষকসমাজের দ্বিতীয় স্মৃতি এবং সে কারণে তার চেতনার অপর উৎস হিসেবে আসে কারবালার করুণ বেদনাবিধুর কাহিনি। কারবালা কাহিনির মূল বিষয় ইমাম হোসেনের করুণ মৃত্যুর বর্ণনা। সেই বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে পুঁথি সাহিত্যে। দীর্ঘকাল ধরে পুঁথিপাঠ গ্রাম-বাংলার অন্যতম মাধ্যম ছিল। বাগদাদের গভর্নর মুয়াবিয়ার ছেলে ইয়াজিদের হাতে ফোরাত নদীর তীরে ইমাম হোসেনের সপরিবারে মৃত্যুর ঘটনা বহুবার পঠিত হয়েছে, সন্ধ্যায়, রাতে, কাজের অবসরে। গ্রামীণ জীবনের এটি তেমনি এক মুহূর্ত, যার প্রভাব মানুষের চেতনায় গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে যায় অতি দ্রুত। হাসান ও হোসেনের ভাগ্য যে নির্ধারিত ছিল এবং

তাঁদের মৃত্যু যে অবধারিত ছিল, সেটি নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। পুঁথির বর্ণনা পাঠকদের জানিয়ে দেয়, কী ঘটতে যাচ্ছে। হোসেন তাঁর পরিবার নিয়ে কুফার দিকে রওনা হলে কারবালার ময়দানে তাঁর মৃত্যু হবে। নামাজ পড়ার সময় এবং পানি পান করার সময় তাঁকে তিরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। গ্রামীণ মানুষের কাছে এটি এক মহা রহস্যের মতো। গ্রিক ট্র্যাজেডির মতো তাদের কাছে মনে হয়, কেন নিজের ভাগ্য সম্পর্কে জানার পরও মানুষ তার ভাগ্যের পরিবর্তনে অক্ষম। কেন সে পারে না ঘটনার ফলাফলকে পরিবর্তন করতে। তাদের দুঃখ আরও গভীর হয়। সাধারণ মানুষ পুঁথিপাঠ থেকে আভাস পায় হোসেনের জীবনের করুণ পরিণতি তাঁর তাঁবুতে বাস করা এবং পানির অভাব। এখানে নারী চরিত্র জীবন দিয়ে যুদ্ধ করে এবং মৃত্যুবরণ করে। আত্মদানের এই তুলনা করা যায় ভারতবর্ষের আদি গ্রন্থ মহাভারতে গান্ধার দ্রোপদী অথবা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে প্রীতিলতার অবদানের সঙ্গে। কারবালার সন্ত্রাসের সঙ্গে বর্তমানকালের পাকিস্তানি সন্ত্রাসের মিল খুঁজে পায় মানুষ।

তারা ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে যুবশ্রেণীর আত্মত্যাগের সঙ্গে কারবালার করুণ কাহিনির মিল খুঁজে পায়। এখানে সে সন্ধান খোঁজে তার জাতীয় পরিচয়ের উৎসের। মীর মশাররফ হোসেনের লেখা *বিষাদ সিন্ধু* ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মুসলমান চেতনার এক প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছিল এই কারণে। পুঁথিপাঠের মধ্যে সেকালের মুসলিম মনের কিছু পরিচয় মেলে। এসব পুঁথিতে রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য, আদমের জন্মরহস্য, শয়তান ও আল্লাহর সম্পর্ক, মহানবীর জীবন, নবীর মেরাজ-রহস্য, মুসা নবীর গল্প, কারবালার ট্র্যাজেডি, ফাতিমার জীবনগল্প, আলীর জীবন, ইউসুফ-জোলেখার ভালোবাসার গল্প ইত্যাদি। এসব লোকগাথা গড়ে উঠেছে বাংলার কৃষকসমাজের চেতনার পরিমণ্ডলকে ঘিরে, যে চেতনা দিয়ে সে বিশ্বকে দেখে, মেলাতে চায় তাদের আপন জীবন ও বাস্তবতার সঙ্গে। তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় প্রমাণিত হয় হাসানের বিষপানের অংশটি। সেটি মানুষের মনে দাগ কাটে। কাসেম-সখিনার জারি, কাসেম-সখিনার বিয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে কাসেমের মৃত্যু, সিমার কর্তৃক হোসেনের মস্তক বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি ঘটনার সঙ্গে মানুষ খুঁজে পায় তার জাতীয় ইতিহাসের সংযোগ। এসব ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় উপাদান বাঙালি গ্রামীণ সমাজের চেতনার মূল ভিত। বিভিন্ন লৌকিক সাহিত্যের প্রভাব সেখানে নিয়ামক, যার মধ্যে আরও রয়েছে যাত্রাগান। সেখানে দুই দলের মধ্যে বিবরণমূলক বিতর্ক ও প্রতিযোগিতা এবং সেই আবৃত্তি, পীরের জীবনবৃত্তান্ত, তাঁদের জীবনের সারকথা, নানা ধরনের ধর্মীয় বিতর্ক স্থান করে নিয়েছে কৃষক-চেতনায়। পীরের অলৌকিক ক্ষমতার প্রদর্শনী গাজির গান, গাজির যাত্রা, গাজির পাঠ, সত্য পীরের গান, সত্য পীরের যাত্রা, মানিক পীরের পাঁচালি,

মানিক যাত্রা, পুঁথিপাঠ, সওয়াল-জবাব, *বিষাদ সিন্ধু* পাঠ সেখানে অতীব গুরুত্ববহ (সৈয়দ জামিলের লেখা *In Praise of Niranjan: Islam Theatre and Bangladesh*, Dhaka: Pathak Somabesh-এ বাংলার গ্রামীণ জীবনের আরও অনেক ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে সুনিপুণভাবে)।

কারবালা কাহিনিতে ইমাম হোসেনের মৃত্যু, ফোরাতের পাড়ে পানির অভাবে শিশুদের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া—এই দৃশ্যগুলো চলচ্চিত্রের মতো মানুষের সামনে ফুটে ওঠে। এসব মানস-অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই একদা সৃষ্টি হয়েছিল জাতি-চেতনার এক বিশেষ ঐতিহ্য (the invention of tradition)। গ্রামীণ চেতনার এই উপাদানগুলো নিঃসন্দেহে শহুরে চেতনার ধরন থেকে ভিন্ন। এখানে মানুষ সোনার বাংলা ও ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে আবেগের ভিত্তিতে। তার সঙ্গে শহুরে চেতনার মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। আবেগের পরিবর্তে শহুরে মানুষ সোনার বাংলার মধ্যে পেয়েছে নতুন আধুনিক সমাজ নির্মাণের বার্তা। ভাষার জন্য জীবনদানও একইভাবে আধুনিক সমাজের প্রতিশ্রুতি হয়ে দেখা দিয়েছে। গ্রামীণ চেতনা ও শহুরে চেতনার ভিন্নতা সত্ত্বেও এই দুই বিপরীত চেতনার মিলন থেকে সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ফল্গুধারা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রভাব বৃদ্ধিতে এই দুই বিপরীতমুখী চেতনা অনেকটা তেল-জলের মতো হলেও একত্র হয়ে গড়ে তুলেছিল এক অভিন্ন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট।

এখানেই, অর্থাৎ এই প্রাচীন জাতি-চেতনার মধ্যেই নির্মিত হয়েছিল গ্রামীণ সমাজের লৌকিক অথচ জনপ্রিয় ধর্মীয় চেতনার এক বিশাল ভূখণ্ড। তার গুরুত্ব উপলব্ধিতে আমাদের শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতা ব্যর্থ হয়েছে। অনেকের দৃষ্টি কেবল শহরের মধ্যবিত্তকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের চেতনায় ধর্মীয় উপাদান অনুসন্ধান করেছে এবং তার প্রতিফল নিয়ে শঙ্কিত হয়েছে। অথচ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জোয়ারের মতো গ্রামীণ মানুষ শহরে এসে শহরায়ণ-প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে, কিন্তু তারা সঙ্গে করে এনেছে তাদের পুরোনো মূল্যবোধ ও আদর্শকে। এভাবে গ্রাম-শহর একাকার হয়ে গেছে অন্তত চেতনার দিক দিয়ে। ফলে জনগণ বলতে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ধরে নিয়ে বাঙালি আলোচনায় গ্রামীণ লৌকিক এবং জনপ্রিয় ধর্মীয় চেতনার কোনো স্থান রাখা হয়নি। হয়তো সে কারণে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আধুনিক সমাজ নির্মাণের প্রবক্তাদের বিচ্ছিন্নতার এক দেয়াল সৃষ্টি হয়েছিল, আর সেই বিচ্ছিন্নতার পুরো সুযোগ গ্রহণ করেছে রাজনৈতিক ইসলাম। এখানে উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সমাজ পরিবর্তনে ইতালীয় মার্ক্সবাদী আন্তোনিও গ্রামসি এই অজৈবিক চেতনার প্রতি কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাকে তিনি ভেবেছিলেন সেই নিয়ামক শক্তি হিসেবে, যাকে সমাজ প্রগতির পক্ষের শক্তির দিকে টেনে আনা আবশ্যক। গ্রামীণ সমাজের প্রাচীন

চেতনা, যার মূল ভিত লৌকিক ধর্মীয় চেতনা এবং শহুরে মানুষের আধুনিক চেতনার ঐক্য জাতীয়তাবাদী শক্তির মূল আধারে পরিণত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু নিয়তির পরিহাসের মতো ওই প্রাচীন চেতনাই তার প্রতি অবহেলার কারণে ধীরে ধীরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংকটের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হয়। আমাদের আজকের সংঘাতের একটি বড় কারণ নিহিত রয়েছে এখানে।

এই ধর্মীয় চেতনা বাংলাদেশে এত যে শক্তি অর্জন করল, এর মূলে রয়েছে ভিন্ন এক কারণ। প্রাক-আধুনিক জাতি-পরিচয়ের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেই। কৃষিভিত্তিক মধ্যযুগীয় সমাজে জাতি-পরিচয়ের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিবন্ধিত হয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা সেটি যুক্ত থাকে রাজা বা সম্রাটের বংশপরিচয়ের সঙ্গে। আধুনিক জাতি-পরিচয়ের আছে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। জাতীয়তাবাদী এই প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে রাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত, সেই প্রাচীন চেতনার বিরুদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়। রাষ্ট্রের হুমকির কারণে তারা খোঁজে নতুন আশ্রয়। আর সেই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহারে মৌলবাদী ধর্মীয় শক্তি কার্পণ্য করে না, করেনি কখনো। তারা মসজিদের মতো প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় হিসেবে পেয়েছে এবং তাকে ব্যবহার করেছে। ভুলে গেলে চলবে না, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ আজ আর কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জ নয়। তারা আজ কেবল অভ্যন্তরীণ জাতিরাষ্ট্রের ক্ষমতা-কাঠামোর মধ্যেই সংযুক্ত নয়, একই সঙ্গে তারা বিশ্বসমাজের সঙ্গেও যুক্ত—মুঠোফোন, ইন্টারনেট, যাতায়াতব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদি কারণে। বিশ্বায়নের প্রভাবে আজ নানা চেতনা তাদের আঘাত করে, তাদের প্রভাবের অধীনে তারা আসে। এ কথা আজ ভাবার কোনোই কারণ নেই যে এককালের পুঁথিসাহিত্য অথবা যাত্রা অথবা *বিষাদ সিন্ধু* তাদের আজকের মনের খোরাক জোগায়। তারা বরং পরিচিত আরও জটিল চেতনার সঙ্গে। যার মধ্যে মৌলবাদী ইসলাম, সালাফি, ওহাবি ইসলাম, জঙ্গিবাদী ইসলাম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। হেফাজতে ইসলামের উত্থান তারই এক বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বিশাল গ্রাম-বাংলাকে যুগে যুগে উপেক্ষা করা, তার পুনর্গঠনে প্রাতিষ্ঠানিক শৈথিল্য এবং অবজ্ঞার ফল আজ কেবল মধ্যবিত্তের ঘাড়ে চাপবে না; তার মাশুল দিতে হতে পারে সারা দেশকে, যদি না এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া যায়।

জাতি-পরিচয় ও ইউটোপিয়া

বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংকটের দ্বিতীয় উৎস হলো একটি কল্পনাশ্রয়ী সোনার বাংলার ধারণা, আসলে যা ছিল বালির প্রাসাদ। কল্পনাশ্রিত ধারণার বিপদ সম্পর্কে সমাজে একটি সাধারণ সতর্কবাণী আছে। সেই সতর্কবাণী কল্পনা ও বাস্তবের অসামঞ্জস্যতা বিষয়ে। সমাজপতি ও রাজনীতিবিদেরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে ঠিক সাধারণ মানুষের মতোই দুই বিপরীত জগতে বাস করে। একদিকে তাঁরা কল্পনার

(world of ideas, subjective world) জগৎ নিয়ে মগ্ন থাকেন; অন্যদিকে তাঁদের মুখোমুখি হতে হয় বাইরের কঠোর বাস্তবতার (outside world, physical world) সঙ্গে। প্রথম জগৎ কল্পনার—ভাবনা বা মতবাদের, যেটি স্বপ্ন দিয়ে গড়া এবং বাস্তবতার সঙ্গে যার মিল নগণ্য। একে ইউটোপিয়ার জগৎ, কল্পনাপ্রসূত জগৎ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে, ঠিক সোনার বাংলার স্বপ্নের মতো। সোনার বাংলায় বাঙালির এককালের ঐশ্বর্যের প্রতীকী উপস্থিতি আছে। সেখানে রয়েছে ব্রিটিশ শাসনপূর্ব একটি ঐশ্বর্যপূর্ণ সমাজের ধারণা। সেই সোনার বাংলার ছবি মানুষকে আশা দিয়েছিল। দিয়েছিল দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমাজের প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতীক সামাজিক মুক্তির পথনির্দেশক হয়েছিল। সেই সোনার বাংলা পরিণত হয়েছিল উপনিবেশবিরোধী চেতনায়। কিন্তু তা ছিল এক জগৎ। কল্পনার ধ্যানে ক্ষণিকের জন্য মানুষ বাস্তবের কঠিন পরিবেশ থেকে পলায়নের সুযোগ পেয়েছিল বটে। আর এভাবে সেটি পরিণত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রয়োজনীয় এক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে, যা মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, কিন্তু ওই স্বপ্ন থেকে মানুষের পাওয়ার আসলে কিছুই ছিল না।

কাউকে এ কথা মনে করিয়ে দেওয়াও প্রয়োজন হয় না যে বাস্তব জগৎ সুখ-দুঃখ, কল্পনা ও কঠোরতা দিয়েই গড়া। সেখানে জীবন সাদা-কালো এভাবে ভাগ করা নয়, জীবন সেখানে এগিয়ে চলে স্বপ্ন ও বাস্তবের জটিল মিথস্ক্রিয়া দিয়ে। এই মিথস্ক্রিয়ায় স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে ন্যূনতম সমন্বয় না হলে বিপদ। কেবল কল্পনা নিয়ে জীবনকে গড়া যায় না। আবার কেবল বাস্তবতার ফ্রেমে জীবনকে বন্দী রাখলে জীবন হয়ে পড়ে শুষ্ক, অতিমাত্রায় দুর্বিষহ। ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের প্রশ্নটি যেমন জরুরি, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক জীবনে ওই সমন্বয় থেকে যেকোনো বিচ্যুতি আনতে পারে সমূহ বিপদ। বাস্তব ও কল্পনার সমন্বয়ের অভাবকে প্রখ্যাত ইংরেজ চিন্তাবিদ Edward Hallett Carr সে কারণে রাজনৈতিক ট্র্যাজেডির প্রধান উৎস হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি তাঁর চিন্তার সারবস্তু তুলে ধরেছিলেন এভাবে: 'তাহলে এখানেই হলো জটিলতা। এখানেই রাজনীতির সব ধরনের আকর্ষণ এবং ট্র্যাজেডি। রাজনীতি সৃষ্টি হয় দুটি দিক নিয়ে—একদিকে ইউটোপিয়া, অন্যদিকে বাস্তবতা। এরা দুটি ভিন্ন জগৎ, তাদের কখনো মিলন হয় না। তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে ব্যর্থ হলে স্বচ্ছ রাজনৈতিক চিন্তা লোপ পায়। আদর্শকে যদি ধরা হয় ইউটোপিয়া হিসেবে এবং প্রতিষ্ঠানকে যদি ধরা হয় বাস্তবতা হিসেবে, তাহলে তাদের পার্থক্য নিরূপণ করা এবং ওই পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা যেকোনো সুস্থ রাজনীতির পূর্বশর্ত।'[১৬]

কারের এই সতর্কবাণী—বাস্তব ও অবাস্তবের ভেদরেখা সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং ওই দুইয়ের মধ্যে সঠিক সমন্বয়ের প্রশ্নটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল

বাংলাদেশের জন্য ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পর। যে কাল্পনিক সোনার বাংলার ধারণা নিয়ে বাংলাদেশ তার যাত্রা শুরু করে, সেই ধারণার কাল্পনিক দিকটি আমরা ভুলে বসেছিলাম। আমরা স্বাধীনতাকে দেখেছিলাম নিতান্তই প্রত্যক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, কার্যকারণের ছাঁচে। ছয় দফা, এগারো দফা আন্দোলন, মিটিং-মিছিল, প্রতিরোধ, যুদ্ধ এবং তা থেকে স্বাধীনতা—ঘটনাপ্রবাহের এই ধারাবাহিকতা দিয়েই আমরা তাকে বুঝেছি কেবল। সেখানে অতীন্দ্রিয়, বাস্তববহির্ভূত কোনো কল্পনার প্রভাব নিয়ে ভাবিনি। সোনার বাংলার ইউটোপিয়া বা কাল্পনিক দিকটি কী ক্ষতি করতে পারে, সেটি আমাদের বিবেচনায় উপেক্ষিত থেকে গেছে। তার বিপদের দিক সম্পর্কে আমরা নিজেদের সচেতন করতে পারিনি। আর সে কারণে ইউটোপীয় এক সমাজ গড়তে গিয়ে প্রগতির বদলে পেয়েছি সংঘাতময় এক বাস্তবতা। সোনার বাংলার কল্পনাশ্রয়ী রূপ সংঘাত সৃষ্টিতে কী ভূমিকা পালন করেছিল, তার একটি চিত্র এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।[১৭]

প্রথমত, যেকোনো কাল্পনিক ধারণা নিজেকে বিশুদ্ধ রাখতে চায়, আর সেই বিশুদ্ধতার প্রশ্নকে ঘিরে জন্ম নেয় রাজনৈতিক বিভেদ। একটি বিশুদ্ধ সমাজ নির্মাণের ভাবনা কীভাবে বিভেদের জন্ম দিয়েছিল, সেটি দেখা যেতে পারে সোনার বাংলার উদাহরণ থেকেই। সোনার বাংলা কীভাবে গড়ে তোলা হবে, তার একটি কর্মসূচি আওয়ামী লীগের সরকার স্বাধীনতার প্রথম বছরে গ্রহণ করেছিল। সেই কর্মসূচির অন্যতম একটি দিক ছিল বাংলাদেশকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের পথে এখানে কী কী বাধা থাকতে পারে, সেই ভাবনাগুলো কোনো গুরুত্ব পায়নি। কারণ, ইউটোপিয়াকেন্দ্রিক যেকোনো চিন্তার প্রধান একটি প্রবণতা হলো যে সে প্রথমেই কল্পনা ও বাস্তবতার তফাতটিকে গুলিয়ে ফেলে। সেখানে কল্পনাকে বাস্তব মনে করা হয়, বাস্তবতাকে কল্পনার মতো করে ভাবা হয়। ফলে সে চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয় একধরনের মধ্যবর্তী অবস্থান 'between illusion and reality'। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিমালা প্রণয়নে সোনার বাংলার আক্ষরিক অনুবাদ প্রাধান্য পেয়েছিল। সোনার বাংলা ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক এলিটদের কাছে বাস্তবায়নযোগ্য একটি প্রত্যয়। তবে ইউটোপিয়ার আদর্শিক বিশুদ্ধতার প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল বিরোধ ও সংঘর্ষ। কে সোনার বাংলা নির্মাণের সত্যিকার কারিগর, কে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিশুদ্ধ অনুসারী, সমাজতন্ত্রের কোন মডেলটি বাংলাদেশের জন্য অনুসরণীয় এবং কোনটি নয়, এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। ঠিক যেমনটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের অভিজ্ঞতায়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে

কেন্দ্র করে বিভেদের পর বিভেদের জন্ম হয়েছে। লেনিনকে মার্ক্স থেকে ভিন্ন ভাবা হয়েছে, প্লেখানভ থেকে ট্রটস্কি ভিন্ন, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে ইউরো কমিউনিজমের ভিন্নতা, এম এন রয় থেকে লেনিন পৃথক—এসব তাত্ত্বিক বিভেদ কেবল বিভেদে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা সংঘাত সৃষ্টিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। পৃথিবী দেখেছে ওই আদর্শিক সংঘাতের ভয়াবহ ফল। বাস্তবায়নের দিকে থেকে দেখলেও সেখানে জন্মেছে বিভেদের পর বিভেদ। সোভিয়েত-চীন বিভেদ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তাদের মধ্যে যুদ্ধও দেখেছি। ইউরোপীয় পথের সঙ্গে সোভিয়েত পথের বিভেদ, এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের বিভেদ, লাতিন আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েতের বিভেদ কেবল তাত্ত্বিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছোট-বড়-মাঝারি— এসব বিভেদ বা মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে জন্ম নিয়েছে অসহিষ্ণুতা এবং তা থেকে ঘটেছে একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠামোর আবির্ভাব। নিজের অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্যের। সেই আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সংঘাত ব্যতীত সম্ভব হয়নি কখনো।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ওই বিভেদ ছিল রক্তক্ষয়ী। কেবল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক মডেলের সঙ্গে চীনা মডেলের নয়, নতুন নাম নিয়ে হাজির হলো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দাবিদার এক ভিন্ন দল, যারা আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে (বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই বিভেদ সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে) তাদের বিরোধিতার কথা জানিয়ে দেয় দেশবাসীকে। পাশাপাশি সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন আরেক উপদল—তারাও নিজেদের সমাজতন্ত্রের সত্যিকার অনুসারী হিসেবে দাবি করে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় হক, তোয়াহা, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি-মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ইত্যাদি নানা দল-উপদল। এরা সবাই নিজেদের সমাজতন্ত্রের সাচ্চা অনুসারী বলে দাবি করে। এরা প্রত্যেকেই একে অপরের প্রতি আক্রমণাত্মক। ইতিমধ্যে বিশ্ব পরিসরে সোভিয়েত-চীন বিরোধ তীব্র রূপ ধারণ করে এবং ইউরো-কমিউনিজমও হাজির হয় বিশুদ্ধতার প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে। এই কলহে আওয়ামী লীগের মতো জাতীয়তাবাদী আদর্শে পরিচালিত একটি দল কেন সমাজতান্ত্রিক ব্র্যান্ড নিয়ে রাজনীতিতে উৎসাহী হবে, সে প্রশ্ন তোলেন অনেকে। আওয়ামী লীগের এই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাকে ঘায়েল করার সহজ এবং মস্ত সুযোগ হাতছাড়া করতে কেউ পিছপা হয়নি। মোট কথা, আলোর চারদিকে যেমন মথ আকর্ষিত হয়, তেমনি সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে ঘিরে বহু বর্ণের ও বহু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের শক্তি শ্রেণী-সংগ্রামের নামে এক অভূতপূর্ব রক্তক্ষয়ী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় বাংলাদেশের সূচনালগ্নে।

এই প্রতিযোগিতার অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল প্রতিপক্ষের ওপর নিপীড়ন। প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সে সময়ের আধিপত্যকারী এই দল আওয়ামী লীগ

নিপীড়নের পথ বেছে নেয়, সেটি যেমন জাসদের বিরুদ্ধে, তেমনি পরিচালিত হয় সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত অন্যান্য দল-উপদলের বিরুদ্ধে। ফলে দেখা গেল, একটি ইউটোপিয়া নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও (সোনার বাংলা) মাত্র তিন বছরের মাথায় বাংলাদেশ বহু ইউটোপিয়ার দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে যায়। সেটি কাউকে যে খুব বেশি অবাক করেছিল, তা নয়। কারণ, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক গ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন পথে ইউটোপিয়া বাস্তবায়নের চিন্তা করে। তার পেছনে থাকে প্রতিটি গ্রুপের নিজস্ব আবেগ। সেই আবেগের তাড়না থেকে জন্ম নেয় অভ্যন্তরীণ বিভেদ। এই বিভেদ দখল করে নেয় রাজনীতির ক্ষেত্রকে। কীভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়, সেটিই তখন পরিণত হয় রাজনীতির ধ্যানে। ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকেন্দ্রিক বিতর্কের স্থলে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয় নিজের অনুসৃত পথের সঠিকতার দিকটিকে, তাঁর বিশুদ্ধতার প্রশ্নটিকে। বাংলাদেশে এক জাতীয় অগভীর রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্মের সঙ্গে এর রয়েছে ওতপ্রোত সম্পর্ক। সমাজে বহু ইউটোপিয়ার উপস্থিতি সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে জন্ম দেয় সংঘাতের। বহু ইউটোপিয়া প্রভাবিত যে রাজনীতি, তা রাজনীতি ব্যাপারটিকেই দেখে এক চিন্তার উত্থান অথবা অন্যটির পতন হিসেবে, এক দলের ক্ষমতায় যাওয়া, অন্যকে ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করার সংগ্রাম হিসেবে। চারটি সামরিক অভ্যুত্থান—১৫ আগস্ট ১৯৭৫, ৩ নভেম্বর ১৯৭৫, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ ও ১৯৮১ সাল এবং দুই রাষ্ট্রপতির নিহত হওয়ার সঙ্গে ১৯৭২ সালের সোনার বাংলার কাল্পনিক সমাজের দায়বদ্ধতার সম্পর্কটিকে অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, ইউটোপিয়ার ওপর ভর করে গড়ে ওঠে মিথ্যা চেতনা (false consciousness)। এই মিথ্যা চেতনা সোনার বাংলার কল্পনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। কেন এই মিথ্যা চেতনা আওয়ামী লীগের মধ্যে জন্ম নেয়, এখানে তার অন্তত তিনটি কারণ উল্লেখ করা যায়। এই কারণগুলো প্রতিটিই একে একে আওয়ামী লীগকে একটি স্বৈরাচারী শক্তিতে পরিণত করেছিল। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হাতে পাওয়া এবং তা-ও মাত্র নয় মাসের মাথায়, আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশাল মাপের পরিবর্তন আনে। ক্ষমতাসীন দলের অনেক রাজনীতিবিদের মনে এই মিথ্যা আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয় যে এমন কিছু নেই, যা তাঁদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়, ঠিক যেভাবে তাঁদের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এই বিশ্বাস রাজনীতিতে বাস্তববাদী ধারা গড়ে তোলার পথে প্রধান বাধা হয়ে দেখা দেয়। অবাস্তববাদী প্রত্যাশা রাজনীতিবিদদের আচার-আচরণে আমূল পরিবর্তন আনে। দেশের স্বাধীনতাকে আওয়ামী লীগ একধরনের রাজনৈতিক ট্রফি হিসেবে দেখতে শুরু করে। তারা দাবি করে, তারাই সেই দল, যে দল বাংলাদেশের জন্মের পুরো কৃতিত্বের দাবিদার। আর তারাই পারে বাংলাদেশকে স্বল্প সময়ের মধ্যে

সোনার বাংলায় রূপান্তর করতে। এ ধরনের একটি মিথ যখন তৈরি হয়, তখন রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তোলার মানসিকতাও লোপ পায়। রাজনৈতিক নিশ্চয়তা (certainty) ও গোঁয়ার্তুমি রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রধান উপধারায় পরিণত হয়। অতিমাত্রায় কর্তৃত্বপরায়ণ মানসিকতা থেকে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতাযুদ্ধে বিজয়ের পূর্ণ কৃতিত্ব দাবি করে বসেছিল। ওই মানসিকতা তাদের অগ্রাহ্য করতে শিখিয়েছিল অন্য সব রাজনৈতিক শক্তির ভূমিকাকে। আর সে কারণে তারা সর্বদলীয় সরকার গঠনের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

দ্বিতীয় কারণ, স্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্য অনেকটা অপ্রত্যাশিত ছিল। ১৯৭০-এর নির্বাচনে দেশকে স্বাধীন করার কোনো চিন্তা বাঙালিদের মনে স্থান করে নেয়নি। সে চিন্তা বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্নভাবে রাজনৈতিক ত্যাগের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের প্রথম দুই মাস আওয়ামী লীগ এবং পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন নিয়েই ভেবেছে। ওই নির্বাচনে ১৫৩ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৫১টি লাভ করে। ৯ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিব ছয় দফায় স্বায়ত্তশাসনের দাবি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সংবিধান প্রণয়নের দাবি রাখেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকারকে মওদুদ আহমদ এভাবে বর্ণনা করেছেন: 'ইয়াহিয়া মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে মুজিবকে শুধু "পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী" হিসেবেই সম্বোধন করলেন না। উপরন্তু ইঙ্গিত দিলেন যে খুব শিগগির তিনি সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন। ঢাকা ত্যাগের আগে ইয়াহিয়া মুজিবকে আশ্বাস দিলেন যে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে।' (মওদুদ আহমদ, ২০১০, পৃষ্ঠা ১৭১)। কিন্তু ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হলে সর্বস্তরের জনগণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ধাপে ধাপে দানা বেঁধে ওঠে। ২ ও ৩ মার্চ হরতাল ডাকা হয়েছিল। ১০ মার্চ ইয়াহিয়া সব দলের সংসদীয় গ্রুপের নেতাদের যে মিটিং ডাকেন, সেটির বর্ণনা দিয়ে মওদুদ লেখেন, 'মুজিব এই আমন্ত্রণকে নিষ্ঠুর প্রহসন বলে বর্ণনা করেন। মুজিব সে সময় ছিলেন অসহায়। স্বাধীনতার ঘোষণা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার অর্থ ছিল সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং মূলত একজন নিয়মতান্ত্রিক নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনায় অক্ষম। তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক নীতিমালা ও শাসনতান্ত্রিক রাজনীতির অনুসারী। উদারপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন। কাজেই বাঙালিরা যা প্রত্যাশা করেছিল, তা তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আলোচনার টেবিলে বসে সমঝোতার মাধ্যমে অর্জন করার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন।' (মওদুদ আহমদ, ২০১০, পৃষ্ঠা ১৮৬)।

জাতীয় পরিষদ গঠন, তার অধিবেশন ডাকা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে

ক্ষমতা হস্তান্তরের মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং একটি গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের ভিত্তি গড়ে তোলা। সেই সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে এবং পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের পর নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে অনেকটা পরিস্থিতির চাপে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়। স্বাধীনতার প্রশ্নটি এভাবে আওয়ামী লীগের সামনে এসে যাবে, সেটি তাদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে ছিল। সেই সঙ্গে নয় মাসের মতো স্বল্প সময়ে স্বাধীনতা লাভও ছিল তাদের জন্য অকল্পনীয়। নয় মাসের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম সুশৃঙ্খল এবং শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না, যদি না ভারতের সামরিক ও মানবিক সহায়তা পাওয়া যেত। ভূ-স্ট্র্যাটেজিক পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ ভারত পাকিস্তানের বিভক্তিকে মনে-প্রাণে কামনা করত বললে ভুল হবে না। এটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন, ওই নয় মাস যুদ্ধকালীন আত্মনিবেদিত, ত্যাগী রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও মুক্তিযোদ্ধা ব্যতীত অনেকেই ভারতে বসে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় দিন গুনেছে। সকল অভ্যন্তরীণ বিভেদ ও ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে বাংলাদেশের জন্ম হলেও তা আওয়ামী লীগের কাছে সহজলভ্য এক বিজয় হিসেবেই প্রতীয়মান হয়েছে।

কাল্পনিক একটি সমাজ গড়ার প্রয়াস আধিপত্যের মানসিকতা ও স্বৈরাচারী সরকারের জন্ম দিতে বাধ্য। সে অভিজ্ঞতা কেবল বাংলাদেশের বেলায়ই ঘটেনি। পৃথিবীর ইতিহাসে তার বহুবিধ উদাহরণ রয়েছে। প্লেটোর *রিপাবলিক*কে যে কাল্পনিক ও বিশুদ্ধ সমাজ গড়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে এলিটদের শাসন নিশ্চিত করা হয়েছিল। এই এলিটদের দায়িত্ব কথাটার দ্বারা তিনি কেন্দ্রীভূত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং একনায়কতান্ত্রিকতাকে উৎসাহিত করাকে বুঝিয়েছিলেন। প্রতিটি ইউটোপিয়া একধরনের নিয়ন্ত্রিত, বদ্ধ সমাজব্যবস্থার ধারণাকে উৎসাহিত করে। ফলে তার মধ্যে proto-Fascism-এর উপস্থিতি রয়ে যায়। সেখানে নিয়মগুলো অনমনীয় ও অপরিবর্তনীয় থাকে, যার উদাহরণ হিসেবে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের আওয়ামী লীগের কথা ভাবা যেতে পারে। জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৭টি পাওয়ার ফলে তাদের মনে এক উৎকট আত্মপ্রেমের জন্ম হয় (extreme form of narcissism)। তার ফলাফল কী হয়েছিল, সেটি আমরা সবাই জানি। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর, ১২ জানুয়ারি তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং ২২ মার্চ ১৯৭২ দেশের আইন প্রণয়নের একচেটিয়া অধিকার লাভ পরপর এই ব্যাপারগুলো ঘটে। অন্যদিকে আইন পরিষদের একমাত্র দায়িত্ব হয় শাসনতন্ত্র পাস করা। ১৯৭২ সালের নভেম্বরে শাসনতন্ত্র বিল পাস হয়। অতঃপর ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর আইন পরিষদ বাতিল করা হয় এবং ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি-ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং একদলীয় বাকশাল শাসনব্যবস্থা জারি করা হয়, যদিও জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের সদস্যসংখ্যা

ছিল ৩০০-এর মধ্যে ২৯৩ (এটি এক অদ্ভুত স্ট্র্যাটেজি বললে ভুল হবে না)। এই প্রভুত্ব (হেজেমনি) আওয়ামী লীগের চরিত্রে গভীর রূপান্তর ঘটায়। সেখানে লক্ষ করা যায় দুটি প্রবণতা—একদিকে সংকীর্ণ ও উৎকট আত্মপ্রেম (শোভিনিজম), অন্যদিকে অপরাজেয় মনোভাব।

অথচ দেশে সুস্থ এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার পক্ষে ওই সময়টাই উপযুক্ত ছিল। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের মূল কথা হলো সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতা। কিন্তু আত্মগরিমায় মুগ্ধ আওয়ামী লীগ অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে, যারা তাদের সঙ্গে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদেরকে অবজ্ঞা করে। তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করে। যেখানে রাজনীতিতে বিরোধী দলের উপস্থিতি অপরিহার্য, সেখানে সংখ্যাগত দিককে উল্লেখ করে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়।[১৮] সেদিন শক্তিশালী বিরোধী দলের (সংসদে বিরোধী সদস্যের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল যদিও) প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। এবং সেই নগণ্য সংখ্যাকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দিয়ে হয়তো বা গড়ে তোলা যেত গণতন্ত্রের প্রাথমিক ভিত। সংসদে বিরোধী দলের উপস্থিতি নিশ্চিত হলে সামরিক বাহিনীর সংবিধানবহির্ভূত ক্ষমতা দখল ও সামরিক অভ্যুত্থানের সুযোগও হয়তো অনেকাংশে কমে যেত। তার পরিবর্তে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টে বাকশাল নামে একদলীয় ক্ষমতা-কাঠামো সৃষ্টি করে বিরোধী শক্তির বিকাশকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত করার লক্ষ্যে। বাকশাল ছাড়া অন্য সব দলকে বেআইনি ঘোষণার ফলে অনেকেই একে স্বৈরাচারী মনোভাব হিসেবে বিবেচনা করে। ঐক্যের পরিবর্তে বিভেদের রাজনীতি গুরুত্ব পায়। গণতন্ত্রকে রক্ষা এবং তাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে সমাজের এলিট গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতার অপরিসীম গুরুত্বকে উপেক্ষা করে কেবল যে একটি মুকুলিত গণতন্ত্রের বিকাশের পথকেই সেদিন রুদ্ধ করা হয়েছিল, তাই নয়, সেই সঙ্গে অতিশয় অপরিপক্ব রাজনৈতিক এলিট শ্রেণী, যাঁদের রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, তাঁরাও বঞ্চিত হয়েছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থেকে। কারণ, সেই দক্ষতা অর্জন সম্ভব ছিল জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহিকে নিশ্চিত করে। কিন্তু সেই পথও সেদিন রুদ্ধ হয়ে যায়। আজকের দিনে সংঘাতময় সমাজের যে বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে, তার শিকড় রয়ে গেছে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের রাজনীতিতে।

শেষ কথা

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবল স্রোত ৪২ বছর আগে বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বসভায় স্থান করে দিয়েছিল। আজ সে দেশ একটি সংঘাতময় দেশ

হিসেবে পরিচিত। মধ্যবিত্ত জীবনের সীমানায় যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের জন্য দেশের এই পরিচয় এক অদ্ভুত বিড়ম্বনার জন্ম দিচ্ছে। তারা দেখছে কীভাবে সংঘাতের ঋজুতা রাজনীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। দুই বৃহৎ রাজনৈতিক জোট দেশের বিধাতা হলেও তাদের মধ্যে সহযোগিতা বা সমঝোতা নেই। তারা যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নিয়োজিত রয়েছে। কৌশল হিসেবে তারা কারণে-অকারণে সংসদ বর্জন করে। গালভরা স্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত করে। অবরোধ, ভাঙচুর, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সভ্য-অসভ্য ভাষায় গালিগালাজ, রাজনৈতিক হত্যা, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতাকে তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে এখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো হয়। সংখ্যালঘুদের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা করার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তারই পরিণতিতে এখানে যেমন অন্তঃসারশূন্য ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি স্থান করে নিয়েছে, তেমনি গড়ে উঠেছে সংঘাতের এক সংস্কৃতি। সেই সংঘাতে বাঙালির প্রধান দুই আত্মপরিচয়, ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয়কে, মূল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত করা হয়েছে। ৪২ বছর পার হলেও ওই দুই পরিচয় কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি। দুই পরিচয়ের দ্বন্দ্ব সে কারণে এখানে তীব্র ও রক্তাক্ত। জাতি পরিচয় বিগত ৪২ বছরে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছে। উগ্রধর্মপন্থা সহিংসতার মাধ্যমে সমাজে পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বাংলাদেশের রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি আজ বিভক্ত ও সংঘাতপূর্ণ। এমনই বিষাক্ত যে তাকে বিষমুক্ত করা না গেলে এ দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা আছে। প্রশ্ন হলো, কীভাবে?

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে সার্বিক জাতীয় সমঝোতা গড়ে তোলা। জাতীয় সমঝোতা ছাড়া এই সংঘাতের কোনো আশু সমাধান নেই। জাতীয় সমঝোতা বলতে বুঝতে হবে এক ধরনের চার্টার। সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিগুলোর মধ্যে জাতীয় মূল বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে একটি মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা চুক্তিনামা তৈরি করা। যে চুক্তিনামার কথা বলা হচ্ছে, সে ধরনের জাতীয় সমঝোতা দলিল বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রণয়ন করা যেত। সেটি প্রণয়নের পথে সে সময়ে কোনো বাধা ছিল না। বরং তার সব পূর্বশর্ত সে সময় উপস্থিত ছিল। কিন্তু তা হয় নি। পঁচাত্তর পরবর্তী রাজনীতিতে জাতি-পরিচয়, ধর্ম, জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পিছনে হেঁটেছে; রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বিরোধপূর্ণ অবস্থান ক্রমাগত ধাপে ধাপে আরো গভীরতর হয়েছে। ফলে জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। আজ সময় এসেছে সেই ধরনের চুক্তিপত্রে সব রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা, যার প্রতি সকল ব্যক্তি আনুগত্য দেখাবে এবং

দলীয় গঠনতন্ত্রে স্থান দিয়ে অলঙ্ঘনীয় হিসেবে বিবেচনা করবে। তিনটি প্রধান দিক ওই চুক্তিনামায় অলঙ্ঘনীয় হিসেবে বিবেচিত হবে :

১. বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে পরিচালিত হবে, যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। তাকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে না দেখে কারও পক্ষে এখানে নৈতিকভাবে রাজনীতি বা সমাজনীতির কোনো ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা যায় না।

২. এ দেশে নানা ধর্ম ও জাতির মানুষ বাস করে। হিন্দু, মুসলিম বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান তো আছেই, সেই সঙ্গে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা, গারো, খাসিয়া ইত্যাদি রয়েছে। মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা অধিকাংশ হলেও অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর সমাধিকার নিশ্চিত না করে বাংলাদেশ এগোতে পারে না। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে হলে ইসলাম ধর্ম অবমাননার জন্য শাস্তিও যে আইনের বিধি আছে, সেটি অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও বৈষম্যমূলক আচরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বৈষম্যবিরোধী আইন এবং জাতিধর্মসংক্রান্ত বৈষম্যবিরোধিতা জাতীয় ঐক্য চুক্তির অন্যতম অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩. বাংলাদেশ হবে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বিশ্বব্যাপী আজ এক অভূতপূর্ব বিপ্লব চলছে। এই বিপ্লব আধুনিক ধ্যান-ধারণাকে লালিত করে। মানবাধিকার নিশ্চিত করে। উদারনৈতিক ধ্যান-ধারণার লালন এখানে আজও অত্যন্ত নগণ্য পর্যায়ে রয়েছে। এটি সমাজে এককভাবে প্রভুত্বকারী কোনো দর্শন নয়। পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার প্রতি সদয় ও সহনশীল ব্যক্তিদের অভাব না থাকলেও জাতিগতভাবে সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা খুব পিছিয়ে আছি। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

আধুনিক রাষ্ট্রের প্রধান স্তম্ভ বলতে আমরা বুঝি নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্রকে, তার অধীনে রাষ্ট্রের নির্বাহী কাজ সম্পন্ন করাকে, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও নির্বাহী ক্ষমতার হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকাকে। সেখানে আরও বোঝায় সুস্থ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ গড়ে তোলার স্থায়ী ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করবে। আধুনিক সমাজ বলতে আরও বোঝায় নাগরিক অধিকার, বাকস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের পরিবেশ, সমাজকে প্রগতিমুখী করে তোলা, নারী-পুরুষ বিভেদ কমিয়ে আনা ইত্যাদি। বাংলাদেশের ৪২ বছরের ইতিহাসে নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল। যে কটি ঘটেছে সেগুলো হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। নির্বাচন সুস্থভাবে পরিচালনার জন্য এখানে তত্ত্বাবধায়ক

সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু সেটি ক্ষমতাসীন দলের উদ্যোগে সংবিধানবিরোধী বলে বাতিল করা হয়েছে, যদিও শাসকগোষ্ঠী ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে। সে কারণে ক্ষমতার বৈধতার প্রশ্নটি বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে আছে। এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রয়োজন, যেন তাকে কেন্দ্র করে দেশকে সংঘাতের ক্ষেত্রে পরিণত করা না হয়। তা ছাড়া দেখা গেছে, জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্ট প্রতিনিধিত্বকারী গণতন্ত্রের মূল প্রতীক হলেও বাংলাদেশে সে কখনো দুই পায়ের ওপর ভর করে পূর্ণ উদ্যমে হাঁটার সুযোগ পায়নি। দুই পায়ের বর্ণনাকে এখানে প্রতীকী অর্থে বুঝতে হয়। সুস্থ মানুষ যেমন দুই পায়ের ওপর ভর করে হাঁটে, তেমনি গণতন্ত্রের পূর্ণতা লাভে প্রয়োজন হয় সরকারি ও বিরোধী দলের দায়িত্বশীল উপস্থিতি। তর্ক ও বিতর্কের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে আমরা গণতন্ত্র হিসেবে ধরে থাকি। রাষ্ট্রপরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তিতর্ক, জনগণের কাছে প্রতিনিধিত্বকারীদের নৈতিক দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে পালিত হলেও বাংলাদেশে তার প্রতিটির অনুপস্থিতি প্রকটভাবে ধরা পড়ে ওই একপেয়ে গণতন্ত্রের কারণে। জাতীয় ঐক্যভিত্তিক চুক্তিনামায় এর নিরসনের ব্যবস্থা থাকবে।

প্রয়োজনে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট জাতীয় সংসদের কথা চিন্তা করা যেতে পারে, যেখানে নিম্ন চেম্বার প্রতিনিধিত্বমূল ভোটে গঠিত হবে এবং উচ্চ চেম্বার সমাজে অভিবাবক স্থানীয় শ্রদ্ধেয় মানুষ, দক্ষ পেশাজীবী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ভোট দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। নিম্ন চেম্বার পরামর্শ করবে উচ্চ চেম্বারের সঙ্গে এবং বিল পাস হবে উচ্চ চেম্বারের পরামর্শসাপেক্ষে। জাতীয় সংসদ পাঁচ বছর মেয়াদের পরিবর্তে চার বছরের যে প্রস্তাব বিভিন্ন চিন্তায় দেখা যায়, সেটিও এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

নিরপেক্ষ ন্যায়পাল প্রথা চালু করার চিন্তা স্থান পেতে পারে ওই চুক্তিনামায়, যারা নাগরিক অভিযোগের মীমাংসা করবে। এটি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হতে হবে।

একটি নিরপেক্ষ পেশাভিত্তিক আমলাতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্র দুরভিসন্ধিগ্রস্ত ও অকার্যকর। উন্নয়নের সহায়ক শক্তির পরিবর্তে প্রগতির পথে সে বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে প্রয়োজন পরিবর্তনের। আমলাতন্ত্রকে রাজনীতিমুক্ত করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। সর্বোচ্চ পেশাদারি কীভাবে অর্জন করা সম্ভব সেটির জন্য বিশেষ পরিকল্পনা প্রয়োজন।

জাতীয় চুক্তিনামায় এগুলোকে উপস্থাপন করে এবং পরিপূর্ণভাবে পালন করলে বাংলাদেশ সংঘাত থেকে মুক্তি পেতে পারে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. 'Formation in praxis always involved both processes- the articulation of group boundaries that excludes others, and the development of internal criteria for solidarity' (Cynthia Talbot p. 90)

২. পিটার অলটার লেখেন, 'Common structural component or feature of nationalism include 'consciousness of the uniqueness or peculiarity of a group of people, particularly with respect to their ethnic, linguistic or religious homogeneity; emphasising of shared socio-cultural attitudes and historical memories; a sense of common mission' (Alter, 1985: 7).

৩. জাতীয়তাবাদ কেন ব্যর্থ হয়, অলটারের মতে তার অন্যতম কারণ হলো এই যে এটি একাধারে বিপদের সংকেত দেয়, অন্যদিকে সুযোগ ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। acts simultaneously as 'a repository of dangers and opportunities' (Alter, 1985:5).

৪. Hobsbawm লেখেন, 'The hunger to belong quickly fell out of favor and was 'no more a moving force' compared to the hunger for 'law and order', (Hobsbawm, 1991: 177) which became an equally important agenda for people in a new post liberated Bangladesh.

৫. 'There has happened a communal transformation of the exploiting and ruling classess and this is what marks the difference between West Bengal and Bangladesh.' (Badruddin Umar 1987: 118)

৬. 'Bangladeshi nationalism is a cent percent new and a cent percent Muslim nationalism whose future course of evolution is along the line of Bengali Muslim culture.' (Chatterjee, B. 1973: 152)

৭. উমর লেখেন, Is it not true that this significant transformation, this communal character of the ruling and the exploiting classes is the foundation on which the nationalism of the people of Bangladesh can be said to stand. If this be so then does it not mean that in a very real sense the standard of Bangladeshi nationalism is the unmistakable standard of communalism hidden under the garb of a secular state? The basis of Bangladeshi nationalism is nothing but communalism based on religion and a revival of the two nations theory under a new and a far more deceptive garb. (Badruddin Umar, 1987: 118)

৮. 'Industrial society requires a homogeneous system of education that merges high and low culture, either by imposing the high culture on the population or by upgrading a low culture to a high culture, during which nationalism is generated.' (p.4) In Stein Tonnesson and Hans Antlov (ed), *Asian Forms of the Nation*, (London: Routledge, 2003) p. 362.

৯. 'In fact, in Hinduism, the social and the spiritual are strangely blended together. Consequently, the new national spirit has found apt vehicles for expressing itself in the current religious rites and formulas of the people.' Pal himself gives a very good instance of this politicization of originally religious notions. The word Swaraj is today commonly taken to mean self-government and is inseparably associated with the struggle with the congress party to overthrow British rule. (John Hutchinson and Anthony D. Smith, (Ed.), *Nationalism,* Oxford, Oxford University Press, 1994) p. 206.

The word was originally a Hindu philosophical term and meant to the state of self-rule or self-control in which a man abstains from action and escapes from the painful and evil cycle of perpetual reincarnation. From Elie Kedourie Dark Gods and their rites.

'How the cult of Kali and the modalities of this cult were exploited for political ends may again be illustrated by a speech of Pal's at a political rally in which he recommended the worship of Rahbha Kali which is white not black and to which a sacrifice of white, not black goat was acceptable. If at every new moon 108 white goats were sacrificed, this, Pal said, would be a good thing. The theme was taken up by another speaker whose words made clearer the allusion to the white goats: for this speaker advised his audience to go abroad and learn the manufacturing of bombs and other destructive weapons and then to come back to their country and sacrifice at every new moon 108 whites.' Elie Kedourie, 'Dark Gods and their Rites,' in *Nationalism*, edited by J. Hutchinson, and Anthony D Smith, (Oxford: Oxford University Press, 1994) pp. 205-209.

১০. 'Some of the conceptual haze is burnt away, however, if it is realized that the people of the new states are simultaneously animated by two powerful, thoroughly independent, yet distinct and often actually opposed motives- the desire to be recognized as responsible agents whose wishes, acts, hopes, and opinions matter, and the desire to build an efficient, dynamic modern state. The one aim is to be noticed; it is a search for an identity, and a demand that that identity be publicly acknowledged as having import, a social assertion of the self as 'being somebody in the world'. The other aim is practical; it is a demand for progress, for a rising standard of living, more effective political order, greater social justice and beyond that of 'playing a part in the larger area of world politics, of exercising influence among the nations' (Geertz Clifford, 'Primordial and Civic Ties,' p. 30, in *Nationalism*, edited by John Hutchinson and Anthony D. Smith, Oxford, Oxford University Press, 1994. pp. 29-34)

১১. Chatterjee এটিকে 'a domain of sovereignty' হিসেবে বর্ণনা করেছেন (Chatterjee, 1966: 217)।

১২. আওয়ামী লীগের ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়, 'the present structure of injustice by a new constitutional, political, economic and social order, in which justice between the regions and between man and man, would prevail' (See in Bhattacharjee, 1973: 325)

১৩. Arabic and Persian would have to be given prominent positions because they were the sources of Pakistan's religious and cultural heritage. He [Fazlur Rahman] also mentioned the role and importance of Urdu which he said was well-equipped to serve this role of unification among the different provinces and regions of Pakistan, as Urdu has a rich tradition of borrowing and assimilating words and ideas from other languages as well as from aborad. He highlighted the historical relation of Urdu with Persian, Arabic and Sanskrit. (Anwar Dil and Afifa Dil, 2011, p. 322)

১৪. সাধারণত ভাষা আন্দোলনকে দেখা হয় জাতীয়তাবাদের উত্থানের প্রধান কারণ হিসেবে, 'The Pakistani troops laid down their arms and that was the end of East Pakistan- the culmination of the Bangla Bhasha (Bengali language) Movement leading to the creation of Bangladesh.' (In Anwar Dil and Afia Dil, *Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh*, San Diego: Intercultural Forum, 2011, p. 136)

১৫. The behavior of people acting apparently strangely that is to sacrifice life for the cause of identity 'should be interpreted as symbolic acts' and their 'meaning should be sought for in terms of their place within an entire symbolic pattern, whose fundamental structure may also be latent in consciousness, by which man's perception of nature, of his relations with nature and with other men, are ordered' (Chatterjee, 1986: 12)

১৬. ই. এইচ. কার আমাদের সতর্ক করে দিয়ে লেখেন, 'Here then, is the complexity, the fascination and the tragedy of all political life. Politics are made up of two elements- utopia and reality- belonging to two different planes, which can never meet. There is no greater barrier to clear political thinking than failure to distinguish between ideals, which are utopia, and institutions, which are reality.' (E. H. Carr, *The Twenty Years' Crisis 1919-1939,* NY Palgrave 2001, p. 87)

১৭. There will not be one kind of community existing and one kind of life led in utopia. Utopia will consist of utopias, of many different and divergent communities in which people lead different kinds of lives under different institutions. Some kinds of communities will be more attractive to most than others; communities will wax and wane. People will leave some for others or spend their whole lives in one. Utopia is a framework for utopias, a place where people are at liberty to join together voluntarily to pursue and attempt to realize their own vision of the good life in the ideal community but where no one can impose his own utopian vision upon others. R. Nozick, 1974, *Anarchy, State, and Utopia,* p. 311 Totowa, NJ: Rowman & Littlefield Publishers.

১৮. হাসানউজ্জামান লেখেন, 'A parliamentary system of government replaced the revolutionary government immediately after the triumphant return of Sheikh Mujib from Pakistan prison on January 10, 1972.' (Hasanuzzaman 1998, 39)
Sheikh Mujib took prompt steps and promulgated on March 23, 1972 the presidential order 22. This order provided for the establishment of a constituent assembly comprising the members elected in 1970 from East Pakistan to Pakistan's National Assembly and East Pakistan's provincial Assembly. (Hasanuzzaman, 1998, 40)
Constitutional Committee was formed comprising of 34 members where only Suranjit Sen Gupta was from the opposition.

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, J. Syed. *In Praise of Niranjan: Islam Theatre and Bangladesh*. Dhaka: Pathak Somabesh, 2001.

Chatterjee, Partha. 'The Second Partition of Bengal,' in *Partition of India Why 1947?* edited by Kaushik Roy, pp 146-163. Oxford University Press, 2012.

Dallmayr, Fred., and Devy, G. N. (ed.). *Between Tradition and Modernity: India's Search for Identity*. New Delhi: Sage Publications, 1998.

Dil, Anwar., and Dil, Afia. *Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh*. San Diego: Intercultural Forum, 2011.

Gellner, Ernest. *Nation and Nationalism.* Oxford: Blackwell, 1983.

Giddens, Anthony. *The Nation State and Violence*. Cambridge: Polity Press, 1985.

Geertz, Clifford (ed). *Old Societies and New States.* New York: Free Press, 1963.

Hasanuzzaman, Al-Masud. *Role of Oppostion in Bangladesh Politics.* Dhaka: University Press Limited, 1998.

Hutchinson, John. *Modern Nationalism*. London: Fontana, 1994.

Hutchinson, John., and Smith, Anthony. (eds) *Nationalism*. Oxford and New York: Oxford University Press, 1994.

Carr, E. H. *The Twenty Years' Crisis 1919-1939*. New York: Palgrave, 2001.

Kohn Hans 'Western and Eastern Nationalism,' in *Nationalism*, edited by John Hutchinson and Anthony D. Smith, pp 162-165. Oxford: Oxford University Press, 1994.

Smith, Anthony D. *Nationalism and Modernity*. London and New York: Rutledge, 1998.

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ ঢাকা : ১৯৮৭।

মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১০।

খাতি অর্থনীতি চিন্তা

ইয়াংকি বণিকদের বঙ্গবাণিজ্য ও প্রাচ্যচর্চা
(১৭৮৫-১৮৩০)

সিরাজুল ইসলাম

সারসংক্ষেপ

এ প্রবন্ধে লেখক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বঙ্গবাণিজ্য ও প্রাচ্যচর্চার বেশ কতগুলো বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। ইয়াংকি বণিকদের বঙ্গবাণিজ্যের সূত্রপাত কীভাবে হলো, মার্কিন বাংলা বাণিজ্যের ফলে পুঁজিপতি শ্রেণীর উত্থানপ্রক্রিয়ার সঙ্গে নিউ ইংল্যান্ডে নতুন প্রাচ্যচর্চা আন্দোলন কীভাবে মার্কিন প্রাচ্যবাদ বিকাশে সহায়তা করেছে, কলকাতার সঙ্গে মার্কিনদের বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যম, রপ্তানিপণ্যের সাংস্কৃতিক মূল্য, প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি ইয়াংকিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তা কীভাবে বাণিজ্যকে প্রভাবিত করেছিল, মার্কিন শিল্পায়নে বঙ্গবাণিজ্য কীভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এবং সর্বোপরি মার্কিন বাণিজ্যের সাংস্কৃতিক দিকগুলো কী তা বিশ্লেষণাত্মকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: ইয়াংকি, বঙ্গবাণিজ্য, প্রাচ্যবাদ চর্চা, মার্কিন শিল্পায়ন, শিল্পবিপ্লব, ট্রান্সডেন্টালিজম, শিল্পপণ্য

প্রারম্ভিক কথা

খ্রিষ্টাব্দ পঞ্চদশ শতক থেকে ভৌগোলিক আবিষ্কার ও তৎপরবর্তী প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে প্রথম ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও পরবর্তী সময়ে এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র স্থাপন প্রভৃতি ঘটনা বিদ্যমান বিশ্ব অর্থনীতি ও মানব সম্পর্ককে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এ প্রভাব বিস্তারে একটি সাধারণ উপাদান ছিল প্রাচ্যবাদ চর্চা। প্রাচ্যদেশে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনুষঙ্গ হিসেবে প্রাচ্যচর্চা ছিল অবধারিত। তবে এর ব্যত্যয় দেখতে পাই মার্কিনদের মধ্যে। স্বাধীনতা লাভের পর পরই বঙ্গোপসাগরীয় এলাকায় মার্কিন বণিকদের আগমন ছিল কেবলই বাণিজ্যিক কারণে।[১] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইয়াংকি বণিকদের প্রাচ্যে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করে এ শর্তে যে তাঁরা কোনো অজুহাতেই সেখানে কোনো ঔপনিবেশিক বা অন্য কোনো রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পাববেন না। ইউরোপের বিভিন্ন বাণিজ্য গোষ্ঠী কর্তৃক প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রাচ্যবিদ্যা।[৩] মূলত, ইউরোপীয় বিভিন্ন একচেটিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রাচ্যে ঔপনিবেশিক প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজনেই শুরু হয় প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা, বিশেষ করে প্রাচ্য ভাষাচর্চা। তাই লক্ষ করি, প্রাচ্যবিদ্যার প্রথম ধ্বজাধারী হচ্ছে বিভিন্ন পাশ্চাত্য বণিক গোষ্ঠী। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইউরোপের প্রতিটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাচ্যচর্চার নানাবিধ প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে প্রাচ্য ভাষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান। এ ধারার একমাত্র ব্যত্যয় দেখতে পাই যুক্তরাষ্ট্রে প্রাচ্যচর্চার বেলায়। মার্কিন বণিকেরা ব্যক্তিগতভাবে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে অবতীর্ণ হলেও সমষ্টিগতভাবে তাঁরা প্রাচ্য ভাষা ও সভ্যতার নানা উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং একপর্যায়ে তাঁরা সম্মিলিত হয়ে স্থাপন করেন প্রাচ্যবিষয়ক জাদুঘর ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য, প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য মার্কিন বণিকেরা ইউরোপীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আদলে আমেরিকায়ও একটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু কংগ্রেস সে প্রস্তাব বাতিল করে দেয় এ যুক্তিতে যে এক দেশের ওপর আরেক দেশের একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার স্থাপন মার্কিন রাজনৈতিক আদর্শের পরিপন্থী। অতএব, 'একচেটিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' স্থাপনের পরিবর্তে কংগ্রেস তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে প্রাচ্যে বাণিজ্য পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে।[৪] শর্ত থাকে এই যে মার্কিন বণিক গোষ্ঠী প্রাচ্যে কোনো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।[৫] তবে কংগ্রেসের ওই প্রস্তাবে বণিকদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রাচ্যচর্চায় কোনো বাধা আরোপ করা হয়নি।

মার্কিন বণিকদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে প্রাচ্য সভ্যতার নিদর্শন সংগ্রহে লিপ্ত হন। তাঁরা এশিয়ার, বিশেষ করে ভারতের ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় নিদর্শন সংগ্রহ করে তা প্রথমে তাঁদের নিজস্ব সংগ্রহশালায় জমা রাখেন এবং ক্রমেই এগুলোর যথা সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন জাদুঘর নির্মাণ করেন। যেমন নিউ ইংল্যান্ডের সেলেম শহরে মার্কিন বণিকেরা যৌথভাবে একটি প্রাচ্যবিষয়ক জাদুঘর স্থাপন করেন, যা কিনা বর্তমানে প্রাচ্য সংস্কৃতি বিষয়ে আমেরিকার একটি অন্যতম এবং সর্ববৃহৎ জাদুঘর। নাম পিবডি মিউজিয়াম। এ জাদুঘরের প্রয়োজনে বরাদ্দ করা বিশাল জায়গাটির নাম দেওয়া হয় ইন্ডিয়া স্কয়ার, যা এখনো বিদ্যমান। এ ছাড়া নিউ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বন্দর নগরে রয়েছে

সমকালীন ইয়াংকি বণিকদের বঙ্গবিষয়ক প্রতিষ্ঠিত ছোট-বড় বেশ কয়েকটি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা। তা ছাড়া নিউ ইংল্যান্ডের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে হার্ভার্ড ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমকালীন যুগে স্থাপিত হয়েছে প্রাচ্য সভ্যতাবিষয়ক অনেক আর্কাইভস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যা এখনো কোনো আলোচনায় আসেনি। মূলত এ সমস্যাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

সতেরো ও আঠারো শতকে পাশ্চাত্যের যেসব নৌ-জাতি ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক কারণে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে আগমন করেছিল তাদের মধ্যে সর্বশেষ জাতি ইয়াংকি নামে অভিহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ডের বণিকেরা।[৬] স্বাধীনতা লাভের পরের বছরই অর্থাৎ ১৭৮৪ সালের শেষ নাগাদ ইয়াংকিরা ইউনাইটেড স্টেটস নামের একটি বাণিজ্যিক জাহাজ নিয়ে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। এর পর থেকে বাংলা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলায় তাদের বাণিজ্য এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে পনেরো বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র কলকাতা বন্দরের মোট ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণে খোদ ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমকক্ষ হয়ে ওঠে।[৭] উল্লেখ্য, তখন ইউরোপ ও এশিয়ার প্রতিটি বাণিজ্যিক দেশ ছিল কলকাতা বাণিজ্যে সক্রিয়। আমেরিকার জন্য কলকাতা বাণিজ্যের বার্ষিক নিট মুনাফা ছিল এতই ব্যাপক এবং ক্রমবর্ধমান যে অচিরেই এর যুগান্তকারী প্রভাব পড়ে নিউ ইংল্যান্ডের সার্বিক অর্থনীতিতে।[৮] ১৮১৯ সালে সেলেমের বঙ্গবণিকেরা মার্কিন সিনেটকে এক স্মারকপত্রে জানান যে মার্কিন শিল্পবিপ্লবের নেপথ্যে রয়েছে কলকাতা বাণিজ্য থেকে আসা বিপুল মুনাফা। স্মারকপত্রের ভাষায়, 'মার্কিনদের কলকাতা বাণিজ্যই সর্বপ্রথম আমেরিকায় বাণিজ্যিক পুঁজির বিকাশ ঘটিয়েছে। পুঁজি ছাড়া বাণিজ্য, পণ্যোৎপাদন ও সেবা প্রদান সম্ভব নয়। পুঁজি সৃষ্টি ও এর উৎপাদনশীল বিনিয়োগের জন্য অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে আমেরিকার কলকাতা বাণিজ্য। এর ফলেই মার্কিন দেশে সর্বপ্রথম শুরু হয় পুঁজিবাদ বিকাশের যাত্রা। পুঁজিবাদ বিকাশের ফলে কৃষিপণ্যের চাহিদা ও তৎপ্রসূত আয় অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এরই ফলে কৃষি খাতেও পুঁজির বিকাশ লক্ষ করা যায়। মানতে হবে, পুঁজির বিকাশসহ কলকাতা বাণিজ্যের নানাবিধ অনুকূল প্রভাবের ফলেই আমেরিকা এখন বিশ্বের একটি অন্যতম বড় নৌ-বাণিজ্যিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।'[৯] বঙ্গবাণিজ্যকে কেন্দ্র করে যে পুঁজিপতি শ্রেণীটির উত্থান দেখতে পাই তাঁদেরই পুঁজি বিনিয়োগের ফলে আমেরিকায় ঘটল পৃথিবীর দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব।[১০] এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস, যারা ছিল আমেরিকায় শিল্পবিপ্লবের পথিকৃৎ।[১১] এ গোষ্ঠীর সবাই ছিলেন কলকাতা বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। লক্ষণীয় যে এই নব্য পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রায় সবাই ছিলেন শিক্ষিত এবং প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁরা ১৭৯৯ সালে

সেলেমে ইস্ট ইন্ডিয়া মেরিন সোসাইটি নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে একটি ছিল ব্যবসার পাশাপাশি প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা। এ উদ্দেশ্যে প্রাচ্যগামী প্রত্যেক ব্যবসায়ী ও নাবিকের ওপর নির্দেশ থাকত তাঁরা যেন প্রত্যেকেই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রহ নিজস্ব দিনপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত করেন।[১২] তাঁদের ওপর আরও নির্দেশ ছিল তাঁরা যেন তাঁদের নিজস্ব জার্নাল, ডায়েরিসহ প্রাচ্যবিষয়ক গ্রন্থ, ভাস্কর্য, শিল্পকর্ম সংগ্রহ করে নিউ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দান করেন। এ কর্তব্য পালন ছাড়াও তাঁরা নিজেরাও সম্মিলিত হয়ে সেলেমে স্থাপন করেন একটি প্রাচ্যচর্চা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রাচ্য সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া মেরিন মিউজিয়াম একটি অন্যতম বড় প্রতিষ্ঠান। ১৭৯৮ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া মেরিন মিউজিয়ামে প্রতিবছর একটি দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য প্রাচ্যমেলার আয়োজন করা হতো। এ বার্ষিক মেলায় ১৮৩০ সাল পর্যন্ত প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টসহ বিভিন্ন জাতীয় নেতা। ১৮৩০-এর দশক পর্যন্ত মূলত ইয়াংকি বণিকেরাই মার্কিন একাডেমিশিয়ান ও লেখকদের তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রাচ্যচর্চায় উৎসাহী করে তোলেন।

কলকাতায় মার্কিন বণিক

ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার সুবিধার্থে ইতিপূর্বে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এ দেশে আগত প্রতিটি পাশ্চাত্য বণিক গোষ্ঠী সরকার থেকে স্থায়ী ইজারা নিয়ে এক বা একাধিক বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছে। অধিকাংশ কুঠি পরবর্তী সময়ে স্থায়ী ঔপনিবেশিক বসতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন: কলকাতায় ইংরেজদের বসতি, চন্দন নগরে ফরাসিদের বসতি, হুগলির অদূরে চুচুড়ায় ওলন্দাজদের বসতি ইত্যাদি। স্থায়ী বাণিজ্য বসতি স্থাপন এবং বসতিকে সময়মতো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত করার ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিউ ইল্যান্ডের ইয়াংকিরা কোনো ঔপনিবেশিক বসতি স্থাপন করবেন না এবং কোনো যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হবেন না, এ শর্তেই কংগ্রেস ইয়াংকি বণিকদের ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়।

১৭৯৫ সাল থেকে কলকাতা বন্দরের বার্ষিক আমদানি-রপ্তানি বিষয়ে দেশভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান প্রকাশ করা শুরু হয়। ওই পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ইয়াংকি বণিকেরা কলকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অচিরেই বঙ্গোপসাগর বাণিজ্যে ব্রিটেন ছাড়া অন্যান্য সব ইউরোপীয় দেশকে অতিক্রম করে যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার,

ইয়াংকিরা মাত্র সামান্য পুঁজির ওপর ভর করে একটিমাত্র মাঝারি আয়তনের জাহাজ নিয়ে ১৭৮৫ সালে কলকাতার আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় অংশগ্রহণ করেন এবং ১৭৯৫ সাল পর্যন্ত যাঁদের পুঁজির বেশির ভাগই ছিল তাঁদের স্থানীয় বানিয়াদের কাছ থেকে সুদে ধার করা, পরবর্তী এক দশকের মধ্যে তাঁদের বাংলা বাণিজ্য এমনই বিস্তার লাভ করে যে কলকাতা বন্দরের দেশভিত্তিক আমদানি-রপ্তানি হিসাবে ১৭৯৫ থেকে ১৮০৫ সালের মধ্যে মার্কিনরা ব্রিটেন ছাড়া কলকাতা বাণিজ্যে লিপ্ত বাকি সব ইউরোপীয় দেশের সম্মিলিত বাণিজ্যের পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যান।[১৩] এমনকি, ১৮১০ সাল নাগাদ কলকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানিতে ইয়াংকিরা বাংলায় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের পরিমাণকেও অতিক্রম করে যান।[১৪] অর্থাৎ ব্রিটিশ বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে নেন ইয়াংকিরা। ইয়াংকিদের কলকাতা বাণিজ্য ক্রমেই নিউ ইংল্যান্ডে একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক পুঁজিপতি শ্রেণী সৃষ্টি করে এবং ওই শ্রেণীটিই রচনা করে প্রথম মার্কিন শিল্পবিপ্লবের ভিত্তি।[১৫]

তবে এ উপস্থাপনায় আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো মার্কিনদের বঙ্গবাণিজ্যের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান আলোচনায় নিয়ে আসা। আমরা দেখাতে চাই যে মার্কিনদের বাংলা বাণিজ্যের ফলে একদিকে যেমন নিউ ইংল্যান্ডে একটি পুঁজিপতি শ্রেণীর উত্থান ঘটেছে এবং এ শ্রেণীর প্রচেষ্টায় নিউ ইংল্যান্ডে বিকাশ লাভ করেছে একটি শিল্পবিপ্লব, অপরদিকে একই সময়ে এই সদ্য সৃষ্ট পুঁজিপতি শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিজমের আদলে একটি নতুন প্রাচ্যচর্চা আন্দোলন, যাকে আমরা বলতে পারি মার্কিন প্রাচ্যবাদ (অ্যামেরিকান ওরিয়েন্টালিজম)।

মার্কিন প্রাচ্যবাদের বিকাশ

সদ্য স্বাধীন মার্কিন বণিকেরা যখন বাণিজ্য ব্যাপদেশে ভারত মহাসাগরের পথে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করেন তখন এ প্রকল্পের সাফল্য নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেক সংশয় ছিল। কেননা মার্কিনদের কাছে ভারত মহাসাগর ছিল একটি অজানা এলাকা। তদুপরি, তাঁদের হাতে পুঁজিও সীমিত। আরও সীমিত তাঁদের অভ্যন্তরীণ বাজার।[১৬] ১৭৯০ সালে মার্কিন জনসংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে তিন মিলিয়ন। যা হোক, ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে মার্কিন কংগ্রেস আপত্তি দেয় আরেকটি প্রধান কারণে। ইউরোপীয় মার্কেনটিলিস্ট বা একচেটিয়া বাণিজ্য অর্থনীতির অভিজ্ঞতায় আশঙ্কা করা হয়েছিল যে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার পরিবেশে আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী। এসব কারণে একপর্যায়ে ভারত মহাসাগর বাণিজ্য প্রকল্প মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক বাতিল করে

দেওয়ার ওপর বিতর্ক চলছিল। ওই বিতর্কে মতামত দেন ইয়েল ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সেমিটিকস বিশেষজ্ঞ প্রফেসর এজরা স্টাইলস (১৭২৭-১৭৯৫)। তিনি তাঁর দুই বন্ধু প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন ও বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন উভয়কে ভারত বাণিজ্যের অনুকূলে তাঁর যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন যে মার্কিন-ভারত বাণিজ্য শুধু পণ্যের লেনদেন নয়, এ বাণিজ্যে নিহিত থাকবে মানব সভ্যতা বিষয়ে জ্ঞানের লেনদেনও। স্টাইলের ভাষায়, 'ভারত বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে আমেরিকা সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে বিশ্বাঙ্গনে অনুপ্রবেশ করবে। প্রথমবারের মতো মার্কিন জাহাজ পাড়ি জমাবে প্রাচ্য জগতে। এর মাধ্যমে ওই অজানা জগতে পরিচিত হবে সদ্য স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র। এর ফলে বিশ্বের পূর্ব গোলার্ধে উড়তে দেখা যাবে আমেরিকার ডোরা কাটা পতাকা। মার্কিন পতাকা উড়তে দেখা যাবে বাংলায়, গঙ্গায়, সিন্ধু ও চীনে। এর বিপরীতে বাণিজ্যের বিনিময়প্রক্রিয়ায় আমেরিকা লাভ করবে মুনাফার পাশাপাশি প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক তথ্য।'[১৭] স্টাইলস মনে করেন যে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক দেশগুলো যদি প্রাচ্যের সান্নিধ্যে এসে তাদের নিজ নিজ দেশের অর্থনীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নতুন উপাদান যোগ করে বিশ্ব সভ্যতার বিকাশে অবদান রাখতে পারে, তাহলে মার্কিনরাও বাণিজ্যের পার্শ্ব ফসল হিসেবে প্রাচ্য সভ্যতা থেকে অনুরূপ সুফল লাভ করতে পারে। যা হোক, অনেক যুক্তিতর্কের পর অবশেষে মার্কিন কংগ্রেস এশীয় বাণিজ্যের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে শর্ত থাকে এই যে ইউরোপীয় আদলে তাঁরা কোনো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করতে পারবেন না। ১৭৮৪ সাল থেকে মার্কিন জাহাজ বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে আসতে শুরু করে, তবে বাংলার সঙ্গে মার্কিন বাণিজ্য নিয়মিতভাবে শুরু হয় ১৭৯০ সাল থেকে।

মার্কিন ও বাঙালির প্রথম সাক্ষাৎ

প্রশ্ন করা যায়, মার্কিনরা কলকাতার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপনের আগে বাংলার সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল কি না। থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। যেখানে ব্যাপক আকারে এবং নিয়মিত পণ্য যাবে, সেখানে বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষও যেতে পারে। যেমন আঠারো শতকে 'আয়া' পেশার অসংখ্য বাঙালি নারী ব্রিটেনে কর্মরত ছিলেন। একই সময়ে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন পর্যটকও ব্রিটেন পরিভ্রমণ করেছেন। এঁদের কেউ কেউ ব্রিটিশ কলোনি আমেরিকায়ও যেতে পারেন, এমনটি মনে করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেমন ১৭৮৪ সালে বারো জন বাঙালি লস্কর (জাহাজের শ্রমিক) পেনসিলভানিয়ার নিউ হ্যাভেন বন্দরে আটকা পড়েন। এঁদের নিয়োগদাতা ও জাহাজের মালিক ওই বন্দরে গিয়ে তাঁর জাহাজ

বিক্রি করে উধাও হয়ে যান বাঙালি লস্করদের পাওনা পরিশোধ না করেই। এমতাবস্থায় স্থানীয় লোকেরা নাচার বাঙালিদের উপদেশ দেন স্বদেশে ফেরার চেষ্টা না করে অন্যান্য বাসিন্দার মতো এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করতে। কিন্তু তাঁরা দেশে ফেরার জন্য অস্থির। এ মানবিক সমস্যা মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন মার্কিন জাতির প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের অন্যতম স্টেটসম্যান, চিন্তাবিদ, দার্শনিক বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন। তিনি নিজে চাঁদা তুলে আটকে পড়া বাঙালি খালাসিদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করেন।১৮

পাল যুগে আন্তদেশীয় পণ্যের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

পাল যুগে আন্তদেশীয় সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হয়েছে প্রধানত বাণিজ্যিক পণ্যের মাধ্যমে। ভৌগোলিক কারণে মানুষে মানুষে সাক্ষাতের সুযোগ যেখানে সীমাবদ্ধ, সেখানে একে অপরকে আন্দাজে জানার একটি বড় মাধ্যম বাণিজ্যিক পণ্য। একটি দেশের উৎপাদিত পণ্য প্রতিনিধিত্ব করে এর অর্থনীতি, প্রাযৌক্তিক-কারিগরিক কৌশল, সংস্কৃতি, রুচি-অভিরুচি ও আরও অনেক কিছু। পাল যুগে ইউরোপীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে বাংলার নানা পণ্য, বিশেষ করে বস্ত্র রপ্তানি হয়েছে বিশ্বের সব মহাদেশে। এ পণ্যের অভিভূত ভোক্তারা মানস চোখে অনুভব করেছেন বাংলার বস্ত্রের প্রাযৌক্তিক, সাংস্কৃতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক তাৎপর্য। আমেরিকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছবিসহ বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো বাংলা থেকে আমদানি করা বিভিন্ন পণ্যের, বিশেষ করে বিভিন্ন সুতি ও রেশমি বস্ত্রের। মার্কিন গ্রাহক-ভোক্তারা স্বচক্ষে না দেখতে পারলেও কল্পনার মাধ্যমে আঁচ করতে পেরেছেন বাংলার তাঁতশিল্পের শৈল্পিক মুনশিয়ানা সম্পর্কে। উৎপাদনের নেপথ্যে যে শ্রম, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, প্রাযৌক্তিক কলাকৌশল, রুচি-অভিরুচি, পরিবেশ-প্রতিবেশ নিহিত তা বাস্তবে জানার বাসনা জেগেছিল অনেক মার্কিনের মনে। কলকাতায় দীর্ঘকাল বসবাসকারী বোস্টনের বণিক হেনরি লি-এর স্ত্রী যেমন লিখেছেন তাঁকে বিস্তারিত জানাতে কেমন করে, কেমন হাতে এবং কোন প্রযুক্তিতে তৈরি হয় ওই সব অবিশ্বাস্য 'উটের লোমের শাল, শুভ্র শাল, ঢাকাই মসলিন' ইত্যাদি। লি জানালেন, 'তা যে বর্ণনার অতীত, কেননা তিনি কখনো জানার চেষ্টা করেননি কীভাবে তৈরি হয় ওই সব সূক্ষ্ম ও কারুকার্যমণ্ডিত মূল্যবান সূক্ষ্ম বস্ত্র। কেননা তিনি মনে করেন বঙ্গ সংস্কৃতির বাইরের কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়ে বেশি কিছু জানা সম্ভব নয়। অতএব, এসবের কারিগরি দিক জানার চেয়ে আমার একমাত্র কামনা হলো বাণিজ্যের মাধ্যমে অঢেল সম্পদ তৈরি করে দেশে ফিরে তোমাকে নিয়ে সুখে জীবনযাপন করা।'১৯

বাংলায় উৎপাদিত কাপড় ছিল বিদেশি বণিকদের কাছে একদিকে গুণে উত্তম

এবং অপরদিকে টেকসই ও অকল্পনীয়ভাবে সস্তা। স্বাভাবিকভাবেই, আমেরিকায় বাংলার তাঁতশিল্পপণ্যের চাহিদা ছিল ব্যাপক।

১৮২০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ আমেরিকার প্রথম শিল্পবিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার তাঁত ও রেশমশিল্পের বড় ক্রেতা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাংলা থেকে আমদানি করা সব সুতি ও রেশমি বস্ত্র মার্কিন অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মিটিয়ে আমদানিকারকেরা বাড়তি পণ্য পুনঃ রপ্তানি করত দক্ষিণ আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অন্যান্য স্থানে। যা হোক, মার্কিন বণিকেরা বাংলা থেকে যেসব রকমারি তাঁত ও রেশম বস্ত্র আমদানি করতেন সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কতিপয় ব্র্যান্ড, যেমন গুঁড়া, মৌ, মামুদি, বাফতা, সান্না, লঙক্লথ, চিনজ, চেক, গামছা, রুমাল, গিলাচাদর, লুঙ্গি, বন্দনা, শিরসাকার, সানা, চেক কাপড়, ইংলিশ রুমাল, মার্কিন রুমাল, চম্পা রুমাল, বন্দনা, মৌ-সানা, মামুদি, মোগা কোষা, মৌ-আমের্তি, চিতাবুলি, বাফতা, কোশা, হাতব্যাগ ইত্যাদি।২০ উল্লেখ্য, প্রত্যেক আমদানিকারক তাঁদের পণ্য স্থানীয় বাজারে নিলামে বিক্রি করতেন। নিলামের খবর ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচার করা হতো। এসব বিজ্ঞাপনের সাধারণ ভাষা ছিল এমন বাহারি যে বাংলা যেন পৃথিবীর একটি স্বর্গরাজ্য, যে রাজ্যের সব পণ্যই গুণে সুন্দর, কিন্তু দামে সস্তা।

প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি ইয়াংকিদের দৃষ্টিভঙ্গি

১৮২০-এর দশকে দেখা যায়, মার্কিন বণিকেরা বিভিন্ন পণ্যের পাশাপাশি কলকাতায় পাশ্চাত্য বইপুস্তক আমদানি করছেন। বইয়ের বিষয়বিন্যাস ছিল সাধারণত উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণকাহিনি, সাধারণ বিজ্ঞান, ধর্ম, সমুদ্র, প্রাকৃতিক ইতিহাস ইত্যাদি।২১ ১৯২০-এর দশকে অনেক মার্কিন ধর্মযাজক খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন, অনেকেই এসেছেন সপরিবারে। সমকালীন পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায়, প্রায়ই মার্কিন যাজকেরা মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছেন, এমনকি অনেক সময় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে।

মার্কিন বণিকদের অনেকেই কলকাতা থেকে ভারতীয় ঔৎসুক্যে পণ্য সংগ্রহ করতেন। এসব সংগ্রহ দিয়ে অনেকেই তাঁদের নিজ বাড়িতে ব্যক্তিগত জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেলেমের পেস্টার বেন্টলি উইলিয়াম (১৭৫৯-১৮১৯) তাঁর বিখ্যাত ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন, সেলেমের নাবিক মি. পিয়ার্স বাংলা থেকে নানা বিরল পণ্য এনে সে যুগের প্রসিদ্ধ বন্দর নগর সেলেমে একটি সুন্দর ব্যক্তিগত জাদুঘর নির্মাণ করে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর সংগ্রহের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাংলার পোশাক পরিচ্ছদ।২২ উল্লেখ্য, মার্কিন নাবিক ও বণিকেরা কলকাতা থেকে দৃষ্টি

কাড়ে, এমন নানা পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে নিজেদের সংগ্রহশালায় রাখতেন এবং অনেক সময় তা সেলেমে অবস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া মেরিন সোসাইটি মিউজিয়ামে ও অন্যান্য প্রাচ্য সাংস্কৃতিক সংগ্রহশালায় স্থায়ীভাবে জমা দিতেন। উল্লেখ্য, সেলেমের ভারত-বণিকেরা সম্মিলিত হয়ে ১৭৯৯ সালে সেলেমে একটি প্রাচ্যবিষয়ক জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন এ উদ্দেশ্যে যে মার্কিনরা বাংলায় না এসেই যেন বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি চিত্র মানসপটে অঙ্কন করতে সক্ষম হন। জাদুঘরটির নাম সেলেম ইস্ট ইন্ডিয়া মেরিন সোসাইটি মিউজিয়াম।২৩ বর্তমানে এর পরিবর্তিত নাম পিবডি এসেক্স মিউজিয়াম, (ইস্ট ইন্ডিয়া স্কয়ার, সেলেম)।

১৭৯৫ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত সেলেমের ইস্ট ইন্ডিয়া বাণিজ্যে জড়িত বণিকেরা একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। ওই অনুষ্ঠানে বণিকদের চেষ্টা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়ার সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কিত নানা আকর্ষণীয় সংগ্রহ প্রদর্শন করে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা। ওই প্রদর্শনীর একটি আকর্ষণীয় বিষয় ছিল সোসাইটির অনুষ্ঠানে সব সদস্য কর্তৃক বাঙালি পোশাক পরা। প্রদর্শনীতে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে বাঙালি পোশাকে পথযাত্রার আয়োজন করা হতো। এই পথযাত্রায় শরিক হতেন তাঁরাই যাঁরা কোনো না কোনো সময় কলকাতায় অবস্থান করেছেন। ওই পথযাত্রায় প্রত্যেক যোগদানকারীর হাতে দেওয়া হতো এমন কোনো না কোনো আকর্ষণীয় বস্তু, যা বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। এরই একটি অংশ ছিল ছয়জন নিগ্রোবাহিত একটি পালকি, যা তখনকার কলকাতায় ছিল একটি নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় বাহন। কলকাতায় বাঙালি ভদ্রলোকদের সাধারণ অভ্যেস ছিল পালকিতে চলাচল করা। অতএব কলকাতায় মার্কিনরা পালকিতেই চলাফেরা করতেন এবং সে পালকি ছিল অধিকাংশই তাদের নিজ মালিকানার। সেলেমের বণিকেরা কলকাতা থেকে একটি পালকি আমদানি করে মেরিন সোসাইটি জাদুঘরে সংরক্ষণ করেন। সোসাইটির বার্ষিক ভোজের শোভাযাত্রায় ওই পালকিটি ব্যবহার করা হতো। পালকিটি বহন করত চারজন নিগ্রো ভৃত্য। শোভাযাত্রার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল বাঙালি পোশাক প্রদর্শন। বাংলায় অবস্থান করেছেন এমন সব বণিক, নাবিক, কর্মকর্তা সবাই বাঙালি পোশাক পরে মিছিলে যোগদান করতেন এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে শোভা পেত বাংলার কোনো না কোনো বাণিজ্যিক পণ্য, বিশেষ করে তাঁতবস্ত্র, যেমন বন্দনা, চিন্টস, গুঁড়া, মামুদি, আমের্তি, লুঙ্গি ইত্যাদি। পালকি মিছিলের পর শুরু হতো ইস্ট ইন্ডিয়া সংস্কৃতিবিষয়ক বক্তৃতা ও ভোজোৎসব, যেখানে যোগদান করতেন মহামান্য অতিথিরাও। যেমন ১৮২৫ সালের বার্ষিক উৎসবের প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কুইন্সি অ্যাডামস (১৮২৫-১৮২৯)। ভোজে প্রেসিডেন্ট অ্যাডামসের দেওয়া টোস্টিংগুলো ছিল :২৪

1. To the merchants of the United States–May they inherit the spirit of Cosmo de Medicis and learning and arts bear testimony to their munificence.
2. To our Navigators–They have been enlightened by distinguished men of all countries.
3. To trade to India–No commercial nation has been great without it–May the experience of ages induce us to cherish this rich source of national wealth.
4. To foreign commerce–The great civiliser of Nations.

টোস্টিংগুলোর বিষয় স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করে যুক্তরাষ্ট্রের ধনাঢ্য শ্রেণীর জীবনযাত্রায় বঙ্গবাণিজ্য তথা প্রাচ্য বাণিজ্যের অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব। উল্লেখ্য, আঠারো শতকের প্রথমার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কালকে গণ্য করা হয় অ্যামেরিকান এনলাইটেনমেন্টের যুগ। বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন (১৭০৬-১৭৯০), এজরা স্টাইলস (১৭২৭-১৭৯৫), টমাস পেইন (১৭৩৭-১৮০৯), টমাস জেফারসন (১৭৪৩-১৮২৬) প্রভৃতি মনীষী ছিলেন সে আলোকিত যুগের প্রাকৃতিক প্রতিনিধি। তাঁরা মার্কিনদের উৎসাহিত করেন ক্ষুদ্র আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে এককভাবে এবং আপন করে গ্রহণ করার জন্য। মার্কিন এনলাইটেনমেন্টের একজন প্রবক্তা হিসেবে প্রেসিডেন্ট কুইন্সি অ্যাডামস (১৮২৫-১৮২৯) ওপরে উল্লিখিত তাঁর ভোজ টোস্টিংয়ে তাগিদ দিচ্ছেন এই বলে যে বিশ্ব সংস্কৃতি ও বিশ্ব সভ্যতার সঙ্গে মার্কিনদের সম্পৃক্ত হওয়ার একটি বড় মাধ্যম বঙ্গবাণিজ্য, যা কিনা ভারত মহাসাগরীয় তথা বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক দেশগুলোর নাম উচ্চারণ না করে তিনি তাঁর ওপরের ৩ নম্বর টোস্টিংয়ে উল্লেখ করছেন, বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্য ছাড়া আধুনিক কোনো দেশ শিল্পায়নের পথে পা বাড়াতে পারেনি। স্পষ্টতই তিনি ইউরোপের প্রথম শিল্পায়িত দেশ ইংল্যান্ডকেই ইঙ্গিত করেছেন। যা হোক, আমরা জানি যে একইভাবে বঙ্গবাণিজ্য ইয়াংকিদের হাতেও পুঁজির বিকাশ ও শিল্পায়নের পথে সরাসরি অবদান রেখেছে।২৫

মার্কিন শিল্পায়নপ্রক্রিয়ায় বঙ্গবণিক

ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের পর বিশ্বে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ঐতিহাসিকভাবে এ ঘটনা খুবই অপ্রত্যাশিত, কেননা মার্কিনরা আদর্শগতভাবে ছিল ফিজিওক্রেসি বা কৃষি অর্থনীতিতে বিশ্বাসী, যেমন ছিল ফ্রান্স ও স্পেন। রাষ্ট্রীয় নেতা জর্জ ওয়াশিংটন, জন অ্যাডামস, জেফারসন, মেডিসন সবাই ছিলেন ফিজিওক্রেসি তত্ত্বে বিশ্বাসী এবং তাঁদের নেতৃত্বে মার্কিন অর্থনীতি পরিচালিত

হয়েছে ফিজিওক্রেসি তত্ত্বানুসারেই। কৃষির সঙ্গে ব্যাপক প্রাচ্য বাণিজ্য মার্কিন অর্থনীতিকে যখন ক্রমেই শক্তিশালী করে তুলছিল, তখন ইউরোপে দেখা দিল ফরাসি বিপ্লবোত্তরকালের দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ। এর অভিঘাতে শুধু যুদ্ধে লিপ্ত ইউরোপীয় দেশগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, যুদ্ধে নিরপেক্ষ আমেরিকার বঙ্গবাণিজ্যও চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। মার্কিন বণিকদের ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য ক্রমেই আমেরিকাকে যুদ্ধে ঠেলে দিতে পারে, এই ভয়ে মার্কিন সরকার আন্তমহাদেশীয় বাণিজ্য অর্থাৎ মার্কিনদের ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য একটি ঘোষণার মাধ্যমে (এমবার্গো অ্যাক্ট, ১৮০৭) বন্ধ করে দেয়। ফলে বঙ্গবাণিজ্যে বিনিয়োজিত কোটি কোটি টাকার মার্কিন বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়, অলস হয়ে পড়ে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যে বিনিয়োজিত বিপুল পুঁজি ও অসংখ্য বাণিজ্যিক জাহাজ। এদিকে, ইউরোপে নেপোলিয়নিক যুদ্ধের সংঘাতময় পরিবেশে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় মার্কিন সরকার এক ঘোষণা দিয়ে ইয়াংকি বণিকদের বঙ্গবাণিজ্য বন্ধ করে দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বঙ্গ ব্যবসায় রত বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস নামের একটি পুঁজিপতি গোষ্ঠী বাণিজ্যের বদলে পুঁজি বিনিয়োগের বিকল্প ক্ষেত্র হিসেবে দেশে শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ উদ্দেশ্যে ১৮১৩ সালে তাঁরা বোস্টন কোম্পানি অব ওয়ালথাম নামে একটি শেয়ারভিত্তিক যৌথ কোম্পানি স্থাপন করেন। এ কোম্পানির মূল মালিক ১১ জন বঙ্গবণিক, যাঁরা ১৭৯০-এর দশকে বঙ্গ ব্যবসায় যোগদান করেন এবং ১৮১০ পর্যন্ত এ ব্যবসা থেকে বিপুল মুনাফা অর্জন করে এঁদের প্রত্যেকেই আমেরিকার প্রথম কোটিপতি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[২৬]

কিন্তু নেপোলিয়নিক যুদ্ধের অভিঘাতে এঁদের ভারত ব্যবসা দুরূহ হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে পুঁজি বিনিয়োগের বিকল্প পন্থা হিসেবে তাঁরা একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্তটি এমন যে তাঁদের পুঁজি ঝুঁকিপূর্ণ বঙ্গবাণিজ্য থেকে প্রত্যাহার করে তা দেশের শিল্পায়নে বিনিয়োগ করবে। এ চিন্তাধারার নেতৃত্ব দেন বোস্টন বন্দরের ইন্ডিয়া হুয়ারফ ও ইন্ডিয়া স্টোরের মালিক এবং ভারত বাণিজ্যে বিনিয়োগকারী কোটিপতি বণিক ফ্রান্সিস কেবল লয়েল (১৭৭৫-১৮১৭)। তাঁর এ পরিকল্পনায় প্রধান পুঁজিদাতা হিসেবে যোগদান করেন তাঁর শ্যালক কলকাতা বণিক পেট্রিক ট্রেসি জ্যাকসন (১৭৮০-১৮৪৭) ও জ্যাকসনের অন্যান্য তিন ভাই, যাঁরা সবাই ছিলেন কলকাতা বাণিজ্যের কোটিপতি বণিক। লয়েলের এ পরিকল্পনায় আরও শরিক হন কলকাতা বণিক নাথান এপলটন (১৭৭৯-১৮৬১), চার্লস জেমস ও এবট লরেঞ্চ। মার্কিন শিল্পবিপ্লবের অন্যতম ঐতিহাসিক ভেরা শ্লেকম্যান এসব বঙ্গবণিক প্রাথমিক উদ্যোক্তাদের নাম দেন বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস।[২৭] এঁদেরই যৌথ উদ্যোগে এবং যৌথ পুঁজিতে ১৮১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বোস্টন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি নামে আমেরিকার প্রথম একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি।

এ কোম্পানির উদ্যোগে ১৮১৪ সালে বোস্টনের অদূরে ওয়ালথামে স্থাপিত হয় এর প্রথম বস্ত্র কারখানা। এ কারখানায়ই সর্বপ্রথম এর উৎপাদনপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রে শুরু থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত একই ভবনে সম্পাদিত হয়। অচিরেই এর অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয় আরও কয়েকটি কারখানা, যার উদ্যোক্তা ছিলেন সবাই বঙ্গবণিক। এমনিভাবে আমেরিকার বঙ্গোপসাগরীয় বণিকদের উদ্যোগে ও পুঁজিতে শুরু হলো আমেরিকার প্রথম এবং বিশ্বের দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব।[২৮] মার্কিন শিল্পায়নপ্রক্রিয়া ছিল এমনই দ্রুত ও ব্যাপক যে ১৮১৭ সালের মধ্যে নিউ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্টেটে বিভিন্ন সেক্টরে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রায় আঠারো শত লাইসেন্স ইস্যু করা হয় এবং এর অধিকাংশই ইস্যু করা হয়েছে ম্যাসাচুসেটসের প্রাক্তন 'ইন্ডিয়া ট্রেডার্সদের অনুকূলে'।[২৯]

নেপোলিয়নিক যুদ্ধের সময় আমেরিকার শত শত বাণিজ্যিক জাহাজ গভীর সমুদ্রের বুকে যুদ্ধরত ইউরোপীয়দের হাতে লুট হয়। ক্ষতিগ্রস্ত বণিকেরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন সাগরবক্ষে তাঁদের নিরাপত্তা বিধানে একটি ফ্রিগেট পাঠানোর জন্য। সরকার এ সার্ভিস দিতে রাজি হয় একটি শর্তে যে ওই ফ্রিগেট নির্মাণের ব্যয় বহন করতে হবে বণিকদেরই। বণিকেরা এ প্রস্তাবে রাজি হন। তাঁদের অর্থায়নে নির্মিত হয় এসেক্স নামের যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম ফ্রিগেট।[৩০] প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন এই ফ্রিগেটের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন সেলেমের বিখ্যাত বঙ্গবণিক ও একজন তুখোড় নাবিক কাপ্তান জেকব ক্রাউনিনশিল্ডকে। বঙ্গবাণিজ্যকে কেন্দ্র করে এভাবেই প্রথম শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর অভিযাত্রা।[৩১]

মার্কিন বঙ্গবাণিজ্যের সাংস্কৃতিক উপাদান

স্বাধীনতা লাভের পর পরই মার্কিনদের বাংলায় আগমন শুধু যে একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ ছিল তা নয়। এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ছিল সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক অভিলাষও। এ ব্যাপারে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট এজরা স্টাইলস প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনকে লেখেন যে, 'বাণিজ্যোপলক্ষে মার্কিনদের প্রাচ্যযাত্রা শুধু বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধাই সৃষ্টি করবে না, পণ্যের সঙ্গে এ সম্পর্ক লাভ করবে প্রাচ্যের জ্ঞান ও সাহিত্যও, যা কিনা হবে মার্কিন এনলাইটেনমেন্টের এক বড় দিক।'[৩২] তাঁর মতে, এশিয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততার ফলে মার্কিন এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন বিশ্বজ্ঞান লাভের পথে এক নতুন মাত্রা যোগ হলো। আমরা লক্ষ করি যে মার্কিন চিন্তাবিদ, লেখক ও সংগ্রাহকেরা বণিকদের মাধ্যমে প্রাচ্য সভ্যতাসম্পর্কিত তাত্ত্বিক ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন। পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে

কয়েকটি বড় ইয়াংকি পরিবারকে অসাধারণভাবে উদ্যোগী হতে দেখি, যেমন: পিবডি, গার্ডনার, লয়েল, হিগিনসন, ক্রাউনিনশিল্ড, থর্নডাইক প্রভৃতি পরিবার। এঁরা সবাই বঙ্গবাণিজ্যে লিপ্ত আমেরিকার প্রথম কোটিপতি। প্রাচ্য সভ্যতা সম্পর্কে তাঁরা সবাই ছিলেন সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল। তাঁদের আর্থিক সহযোগিতায় হার্ভার্ড, ইয়েলসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্য সভ্যতাবিষয়ক ফ্যাকাল্টি প্রবর্তন করে। এসব ফ্যাকাল্টি প্রাচ্য গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক মূর্তি প্রভৃতি উপাদান সংগ্রহে ছিল সক্রিয়। এ ছাড়া জাহাজের অনেক মালিক ও কাপ্তানদেরও দেখা যায় প্রাচ্য সভ্যতা বিষয়ে নানা উপাদান সংগ্রহ করতে। এদের সংগ্রহ তালিকার শীর্ষে ছিল বাংলার নানা মনিহারি বস্ত্র। বস্ত্রের শিল্পশৈলী ও স্থান অনুসারে ছিল নানা চিত্তাকর্ষক নাম। যেমন: বন্দনা, মামুদি, আমের্তি, চিতাবুলি, লুঙ্গি, রুমাল, গিলাপ ইত্যাদি। এগুলোর সস্তা মূল্য ও বর্ণাঢ্যতা আলোচনার বিষয় ছিল ভোক্তা, সংগ্রাহক ও দর্শকদের মধ্যে।

মার্কিনদের প্রাচ্য বাণিজ্যের সাংস্কৃতিক উপাদানের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে যখন বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে সম্পৃক্ত সেলেমের বণিকেরা সম্মিলিত হয়ে ১৭৯৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন প্রাচ্যবিষয়ক একটি সাংস্কৃতিক জাদুঘর, নাম ইস্ট ইন্ডিয়া মেরিন সোসাইটি অ্যান্ড মিউজিয়াম। ১৮৬৭ সালে এর এক আদি পৃষ্ঠপোষক ও বঙ্গবণিক যোসেফ পিবডির (১৭৫৭-১৮৪৪) সম্মানে এর নতুন নামকরণ করা হয় পিবডি মিউজিয়াম। এর বর্তমান নাম পিবডি এসেক্স মিউজিয়াম। যা কিনা বর্তমানে প্রাচ্য সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহৎ জাদুঘর। এ জাদুঘরের আদি সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে সমকালীন পূর্ব ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্প, ভাষা, সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থরাজি, শিল্পকর্ম, বস্ত্র, ভাস্কর্য, তৈজসপত্র ও অন্যান্য ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন।

বঙ্গ সংস্কৃতির যে দিকটি ইয়াংকি বণিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটি হলো ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতি। মার্কিনরা লক্ষ করেছেন যে বাঙালি জীবনব্যবস্থায় ধর্ম সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ডের (১৮৮৫-৮৯) দাদা ভারত বণিক রিচার্ড ফ্রি ক্লিভল্যান্ড ১৭৯২ থেকে ১৭৯৯ পর্যন্ত বহুবার কলকাতায় অবস্থান করেছেন এবং প্রত্যক্ষ করেছেন বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'The most striking feature in the character and culture of the people is their veneration for the customs, traditions and institutions of their ancestors. Their food, their dress, their marriages and production systems are all under the jurisdiction of religion."[৩৩] ক্লিভল্যান্ড বিস্ময় প্রকাশ করছেন ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা ও পরিপক্কতা নিয়ে, কিন্তু একই সঙ্গে ম্রিয়মাণ হচ্ছেন তাঁর নিজ জাতি মার্কিনদের মধ্যে গর্ব করার মতো

এমন কিছু না থাকার জন্য। তবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে প্রাচ্যের সান্নিধ্যে আসার ফলে মার্কিন সংস্কৃতি অনেক সমৃদ্ধ হবে।

ভারতীয় ভেষজ ওষুধ বিষয়ে গবেষণার জন্য হার্ভার্ড অধ্যাপক জ্যাকভ বিজেলো কলকাতায় আসেন। ভেষজ ওষুধবিদ্যায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অর্জন দেখে তিনি বিস্মিত হন, তবে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন ধর্মের নামে সামাজিক সম্পর্কে বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি করার জন্য।[৩৪] বোস্টনের লি বিজনেস হাউসের কলকাতা বাণিজ্য দেখাশোনা করার জন্য চার্লস এলিয়ট নর্টন (১৮২৭-১৯০৮) কলকাতায় আসেন ১৮৪৯ সালে। পরবর্তীকালে তিনি ছিলেন প্রভাবশালী *নর্থ অ্যামেরিকান রিভিউ*য়ের সম্পাদক (১৮৬৩-১৮৬৮) এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হিস্ট্রি অব ফাইন আর্টসের অধ্যাপক (১৮৭৪-১৮৯৮)। বঙ্গ সংস্কৃতির বৈপরীত্য সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, বাঙালি গুণীরা যে ধর্মেরই হোন না কেন দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাঁরা একাধারে পালন করেন কিছু আদি বর্বর প্রথা প্রতিষ্ঠান, অপরদিকে প্রদর্শন করেন সাহিত্য, অর্থনৈতিক উৎপাদন, শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঔৎকর্ষ।[৩৫] নর্টনের বন্ধু কবি হেনরি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলো (১৮০৭-১৮৮২) তাঁর কাছে জানতে চান বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যের মান সম্পর্কে। উত্তরে নর্টন জানান, 'হিন্দুদের মধ্যে যোগ্য লোকের খুবই অভাব এবং সাহিত্য ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা খুবই সীমাবদ্ধ। এখানে ইয়ং বেঙ্গল নামে একটি ছোট ও তরুণ সাহিত্য গোষ্ঠী আছে। কিন্তু এরা এমনই বুরবক যে নিজের ভাষায় ও নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে সাহিত্য চর্চা না করে এরা ইংরেজি ভাষায় নিম্নমানের কবিতা ও গল্প লেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করছে।'[৩৬]

নিউ ইংল্যান্ডের ভারত বণিকদের গর্ব ছিল যে তাঁরা ঘর ছেড়ে প্রাচ্যদেশে গিয়ে বিত্তশালী হয়েছেন, অর্জন করেছেন বিপুল সামাজিক প্রভাব। তাঁরা রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের কৃষি অর্থনীতিকে বেগবান করার উপাদান জুগিয়েছেন। নিউ ইংল্যান্ডে তাঁদের উত্থান ঘটে একটি সংগঠিত ধনী অভিজাত শ্রেণী হিসেবে। ১৮১৫ সাল থেকে পরিবারগতভাবে এই বণিক শ্রেণীর শীর্ষে ছিল ক্রাউনিনশিল্ড, পিকম্যান, রজার্স, লিজ, কেবটস, মেকে, কুলিজে, পিবডি, স্টোন, সিলসভি, লি, গার্ডনার, লয়েল, হিগিনসনস, বুলার্ড, ব্রাউন, থর্নডাইক ও পিকারিং পরিবার। এঁদের সবাই কোটিপতি হয়েছেন বঙ্গবাণিজ্য থেকে এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হয়েছেন বঙ্গবাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই। বিখ্যাত সমকালীন জনপ্রিয় মার্কিন লেখক অয়েনডেল হোমস তাঁদের সামাজিক, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রভাবের নিরিখে নাম দিলেন 'Brahmin Caste of New England', যেমন ইংল্যান্ডে বেঙ্গল ফেরতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের ডাকা হতো 'নবাব' বলে। বেঙ্গল ফেরতা সমকালীন মার্কিন বণিকদের বিপুল সম্পদ ও প্রভাব-

প্রতিপত্তি সম্পর্কে হার্ভার্ড ঐতিহাসিক স্যামুয়েল এলিয়ট মরিসন মন্তব্য করেন :

'An East India merchant in Boston before 1812, possessed social kudos to which no cotton millionnaire could pretend, unless previously initiated through Federalist commerce to have an office on India Wharf, Boston, or to live in the India Row that comprised the fine old square–built houses of many a sea-port town, conferred distinction. Among sailors, the man who had made an East India voyage took no back-wind from any one; and on Cape Cod it used to be said of a pretty, well bred girl, 'She's good enough to marry an East India Captain.'[৩৭]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে লিপ্ত অনেক ইয়াংকি বণিক বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। যেমন ১৮০৪ সালে নিকোলাস ব্রাউন তাঁর নামে স্থাপন করেন ব্রাউন ইউনিভার্সিটি। উনিশ শতকের প্রথম সিকিতে ইয়াংকি বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয় অনেক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর। হার্ভার্ড, ইয়েল, মিসিসিপি প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় নিয়মিত অনুদান লাভ করেছে ইয়াংকি ভারত-বণিকদের থেকে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারত বণিক জোসেপ পিবডি ও তাঁর ছেলে জর্জ পিবডি অনুদান দিয়েছেন কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিকে।[৩৮] পিবডিদের প্রস্তাব ও অর্থায়নেই প্রথম অ্যামেরিকান ফিলোসফিক্যাল সোসাইটির কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। পিবডির সুপারিশ ও অর্থায়নে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে একটি চুক্তি হয় যৌথভাবে সংস্কৃত ভাষাসংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও আদান-প্রদানের।[৩৯] ইয়াংকিদের মধ্যে কলকাতা ব্যবসায় অন্যতম ধনী ব্যক্তি ফিলাডেলফিয়ার এডওয়ার্ড হল। একপর্যায়ে তিনি ব্যবসার পাশাপাশি কলকাতায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সংস্কৃত ভাষার একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়ন করেন। এ প্রকল্পেরই একটি শর্ত ছিল সোসাইটির পণ্ডিতেরা তাঁকে সংস্কৃত ভাষা শেখাবেন। হল তাঁর ব্যবসা ছেড়ে কয়েক বছর কলকাতায় সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেন। উল্লেখ্য, আমেরিকার প্রাচ্যবিদ সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে হলই প্রথম সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ।[৪০] উইলিয়ম ডুয়ান নামে নিউইয়র্কের এক ব্যবসায়ী তাঁর বঙ্গ ব্যবসা পরিত্যাগ করে কলকাতায় *দ্য ওয়ার্ল্ড* নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৭৯১)। এর প্রথম ইস্যুতে তিনি ঘোষণা দেন যে তিনি বাঙালিদের সেবা করতে চান একজন বিশ্ব নাগরিক হিসেবে। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বৈরতান্ত্রিকতার সমালোচনা করার অভিযোগে সরকার তাঁর পত্রিকাটি বন্ধ ঘোষণা করে (১৭৯৪), তাঁকে বঙ্গ থেকে বহিষ্কার করে।[৪১]

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় মার্কিন-কলকাতার বণিকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার প্রভাবে আমরা অচিরেই নিউ ইংল্যান্ডে একটি উদারমনা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উত্থান দেখতে পাই। উল্লেখ্য, ধর্মীয়ভাবে নিউ ইংল্যান্ড ছিল একটি রক্ষণশীল সমাজ। কিন্তু প্রাচ্য সভ্যতার সান্নিধ্যে এসে অনেক ইয়াংকি বণিক ধর্মকে নতুনভাবে বিচার করার প্রয়াস পান। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনে সনাতন সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নতুন প্রবাহ সৃষ্টি হোক, এ বাসনা নিয়ে অনেক ইয়াংকি বণিক প্রাচ্যচর্চায় উদারভাবে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিতে শুরু করেন। এর প্রভাবে অচিরেই নিউ ইংল্যান্ডের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিকশিত হয় একটি নতুন শ্রেণী, যাদের স্লোগান হলো মুক্তচিন্তার মাধ্যমে মানুষের সনাতন জীবনের বাঁধন থেকে মুক্তিলাভ। এ আন্দোলনকে সার্বিক সহযোগিতা দান করে নিউ ইংল্যান্ডের বঙ্গবণিক গোষ্ঠী। তাঁদের আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতায় অচিরেই বিকশিত হয় একটি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক-দার্শনিক গ্রুপ, যাদের প্রাচীনপন্থীরা ব্যঙ্গ করে উপাধি দেয় New England Brahmin. নিউ ইংল্যান্ড ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব দেন দার্শনিক রালফ ওয়াল্ডো ইমারসন (জ. ১৮০৩)। অন্যান্য সহযোগী 'ব্রাহ্মণ' ছিলেন নাথানিয়েল হোথর্ন (জ. ১৮০৪), হেনরি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলো (জ. ১৮০৭), হেনরি ডেভিড থরো (জ. ১৮১৭), ওয়াল্ট হুইটম্যান (জ. ১৮১৯) ও আরও অনেকে। নিউ ইংল্যান্ড ব্রাহ্মণদের প্রত্যেকেই মার্কিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন একেকজন গুরু, যাঁদের চিন্তাধারা ছিল মৌলিক ও সাহসিক। সামগ্রিকভাবে নিউ ইংল্যান্ড 'ব্রাহ্মণদের' চিন্তাধারার দার্শনিক নাম দেওয়া হয় ট্রান্সডেন্টালিজম। এ তত্ত্বের দার্শনিক প্রেরণা জোগায় প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক শংকর আচার্যের মায়াবাদ দর্শন।[৪২] শংকরের মায়াবাদ দর্শন আর ইমারসনের ট্রান্সডেন্টালিজম তত্ত্বের মধ্যে মিল লক্ষণীয়। পণ্ডিতেরা একমত যে শংকরের মায়াবাদ তত্ত্ব ইমারসনের ট্রান্সডেন্টালিজম মতবাদকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে এবং তা ইমারসন নিজেই তাঁর জার্নালে বহুবার উল্লেখ করেছেন।[৪৩]

সিদ্ধান্ত

এ আলোচনায় আমরা লক্ষ করি, মার্কিনরা সমকালীন অন্যান্য ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর মতো এ দেশে কোনো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেননি। বাণিজ্যই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। মার্কিন কংগ্রেস ইয়াংকি বণিকদের প্রাচ্যে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেছে এই শর্তে যে ইউরোপীয়দের মতো প্রাচ্যে তাঁরা কোনো উপনিবেশ স্থাপন করতে পারবেন না এবং স্থানীয় কোনো শক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না। সরকার প্রাচ্যে বাণিজ্য করার জন্য অনুমতি দেয় ব্যক্তিকে, কোনো কোম্পানিকে নয়। তবে দেখা যায় যে ভারত বাণিজ্যের সার্বিক প্রতিযোগিতায়

ক্রমেই প্রাচ্য বাণিজ্য নিউ ইংল্যান্ডের কতিপয় পরিবারের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে। নিউ ইংল্যান্ডে তাঁদের উত্থান ঘটে একটি সংগঠিত ধনী অভিজাত শ্রেণী হিসেবে। ১৮১৫ সাল থেকে পরিবারগতভাবে এই বণিক শ্রেণীর শীর্ষে ছিল ক্রাউনিনশিল্ড, পিকম্যান, রজার্স, লিজ, কেবটস, মেকে, কুলিজে, পিবডি, স্টোন, সিলসভি, লি, গার্ডনার, লয়েল, হিগিনসনস, বুলার্ড, ব্রাউন, থর্নডাইক, পিকারিং প্রভৃতি পরিবার। এঁদের সবাই কোটিপতি হয়েছেন বঙ্গবাণিজ্য থেকে এবং নিউ ইংল্যান্ডে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হয়েছেন আবার বঙ্গবাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই। বিখ্যাত সমকালীন জনপ্রিয় মার্কিন লেখক অলিভার অয়েনডেল হোলমস তাঁদের সামাজিক, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রভাবের নিরিখে নাম দিলেন Brahmin Caste of New England। যেমন ইংল্যান্ডে বেঙ্গল ফেরতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের ডাকা হতো 'নবাব' বলে। এসব পরিবারের নেতৃত্বে ইয়াংকিদের বঙ্গবাণিজ্য পরিচালিত হয় ১৮৩০ সাল পর্যন্ত। এর পর থেকে ইয়াংকিদের বঙ্গবাণিজ্য নানা বৈশ্বিক কারণে ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে এবং উনিশ শতকের শেষ নাগাদ এসে তা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।

তবে বাণিজ্যিক দিক থেকে মার্কিন-বাংলা সম্পর্ক তাৎপর্যহীন হয়ে পড়লেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে তা তেমন স্তিমিত হয়নি কখনো। মার্কিন বঙ্গবণিকদের স্থাপিত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এখনো বিদ্যমান এবং বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুকূলে পালন করছে শক্তিশালী ভূমিকা।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. মার্কিন কংগ্রেস ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করে এই শর্তে যে মার্কিন বণিক গোষ্ঠী কোনো অজুহাতেই সেখানে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বা ঘাঁটি স্থাপন করতে পাববে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য, দেখুন Sirajul Islam, Golden Jubilee Lecture on 'America's Maritime Contact with Bengal 1785-1870: Commerce, Competition, Knowledge,' 24 October 2002, at Asiatic Society of Bangladesh.

২. বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, Susan S. Bean, *Yankee India, American Commercial and Cutural Encounters with India in the Age of Sail 1784-1860*, (Peabody Essex Museum, 2001, Salem, M.A., USA. ; G. Bhagat, *Americans in India 1784-1860,* (New York University, 1970); William Milburn, *Oriental Commerce,* (London 1819); and Amales Tripathi, *Trade and Finance in the Bengal Presidency, 1790-1833*, (Calcutta 1956).

৩. দেখুন, 'Collections of Massachussetts Historical Society,' 7th Series, vol. X, Commerce of Rhode Island, vol. V11 (1775-1800), Boston MDCCCCXV, p.207.

৪. US Congress, American State Papers: Commerce and Navigation, 1790-1836.

৫. যেহেতু নিউ ইংল্যান্ডের ইয়াংকিরাই বঙ্গবাণিজ্যে বরাবর লিপ্ত ছিল, তাই বর্তমান প্রবন্ধে মার্কিন বলতে ইয়াংকিদেরই চিহ্নিত করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব কোণের ছয়টি স্টেটসকে শাসনতান্ত্রিকভাবেই বলা হয় নিউ ইংল্যান্ড। স্টেটসগুলোর নাম কানেটিকাট, মেইন, ম্যাসাচুসেটস, নিউ হ্যাম্পশায়ার, রোড আইল্যান্ড ও ভার্মন্ট। এ স্টেটসগুলোর শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক মূলে ব্রিটিশ। নিউ ইংল্যান্ড নামে এই অঞ্চল শাসনতান্ত্রিকভাবে স্বীকৃত। নিউ ইংল্যান্ডের বাসিন্দাদের বলা হয় ইয়াংকি।

৬. British Parliamentary Papers, 'Fourth Report, 1812,' Appendix 47, Supplement no. 6, p. 43.

৭. উল্লেখ্য যে সে সময়ে আমেরিকার অধিকাংশ স্টেট ছিল কৃষি অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। স্বাধীনতার পর শুধু নিউ ইংল্যান্ডের কয়েকটি স্টেট বাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে ম্যাসাচুসেটস স্টেটের বোস্টন ও সেলেম বন্দর ছিল বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে সবচেয়ে উদ্যমী। এ প্রবন্ধে আমেরিকা বলতে আমরা মূলত বুঝিয়েছি নিউ ইংল্যান্ডকে।

৮. The Memorial of the Merchants of Salem and its Vicinity to the Congress of the United States of America, 31 December 1819, (Baker Business School Library, Harvard), pp. 3-4.

৯. এ গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা নেতা ছিলেন ফ্রান্সিস কেবট লয়েল (১৭৭৫-১৮১৭) এবং অন্যান্য প্রধান প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন পেট্রিক ট্রেসি জ্যাকসন, নাথান এপলটন, চার্লস জেমস, এবট লরেঞ্চ। এঁরা সবাই পুঁজি তৈরি করেছেন কলকাতা ব্যবসা থেকে এবং এঁরা সবাই কলকাতায় অবস্থান করেছেন।

১০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, Robert F. Dalzell, *Enterprising Elite: The Boston Associates and the World They Made,* (Harvard University Press, 1987).

১১. *American Neptune*, vol. 4, No. 1, 1944.

১২. দেখুন Amales Tripathi, *Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793-1833*, (Calcutta, 1979), Appendix- Countrywise Charts,273-289 ; Susan S. Bean, *Yankee India: American Commercial and Cultural Encounters with India in the Age of Sail 1784-1860*, (Peabody Essex Museum, 2001), p. 7; and Sirajul Islam, 'America's Maritime Contact with Bengal, 1785-1870,' pp.151-180, Golden Jubilee Volume, Asiatic Society of Bangladesh (1952-2002), pp 130-151.

১৩. এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য ও পরিসংখ্যানের জন্য দ্রষ্টব্য, Amales Tripathi, *Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793-1833*; Appendix, pp. 273-290; G.A. Prinsep, *Remarks on the External Commerce of and Exhanges of Bengal with Appendices and Accounts and Estimates* (London, 1823); H.H. Wilson, *A Review of the External Commerce of Bengal from 1813-14 to 1827-28,* (Calcutta, 1830); and H. Furber, *John Company at Work*, (Cambridge, Mass., 1948).

১৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, Sirajul Islam, 'Contributions of Asian Trade to the Early Transformation of the United States of America,' *Journal of the*

Asiatic Society of Bangladesh (Hum.), vol. 54, No. 1, June 2009, pp.1-25; 'The Yankee Maritime Merchants in India Trade: Their Contributions to American Industrial Revolution 1790-1830", Asiatic Society of Bangladesh Presidential Lecture 29 December 2011.

১৫. ১৭৯০ সাল থেকে আমেরিকায় দশ-বার্ষিকী লোকগণনা ব্যবস্থা শুরু হয়। প্রথম এই গণনায় আমেরিকার মোট লোকসংখ্যা ছিল চার মিলিয়নের একটু নিচে (৩৯২৯২১৪)।

১৬. উদ্ধৃত, James McCutcheon, "The Asian Dimension in the American Revolutionary Period", in Cedric B. Cowing (ed.), *The American Revolution: Its Meaning to Asians and Americans*, (Hawaii 19770) p. 89.

১৭. Proceedings of the Supreme Executive Council of Pennsylvania, November 3, 1785, Colonial Records of Pennsylvania, vol. X1V, p.569.

১৮. Henry Lee's Memorandum, Calcutta, October 16, 1812 in Lee Family Papers, Massachusetts Historical Society, হেনরি লি (১৭৮২-১৮৬৭) ব্যবসায় সব পুঁজি খুঁইয়ে অবশেষে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় এসে হাজির হন এবং একটানা পাঁচ বছর ব্যবসা করেন।

১৯. Auction sales list by the auction firm T.K. Jones and Co Auctioneer, Baker Library, Harvard.

২০. Vaughan Family Papers, Manuscript No. 83, Massachusetts Historical Society Collections.

২১. *The Diary of William Bentley,* (Salem, Mass. Essex Institute), vol. 3, p. 52.

২২. East India Marine Society, Salem; Susan S. Bean, *Yankee India: American Commercial and Cultural Encounters with India in the age of Sail, 1784-1860*, (Peabody Essex Museum, Salem, 2001), pp. 27-28.

২৩. *Essex Register*, 17 October 1825.

২৪. আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, সিরাজুল ইসলাম, 'The Yankee Maritime Merchants in India Trade: Their Contributions to American Industrial Revolution, 1790-1830,' (Presidential Lecture at Asiatic Society of Bangladesh, 29 December 2011); 'The Cargo and Culture of the New Englanders' Voyages to Calcutta, 1785-1850,' *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*; 'America's Maritime Contact with Bengal 1785 – 1870: Commerce, Competition, Knowledge,' Golden Jubilee Lecture 24 October 2002.'

২৫. For names of Boston Associates, see Robert F. Dalzell, *Enterprising Elite: Boston Associates and the World They Made*, (Harvard University, 1987), pp 28-29.
Lowell (owner of India Wharf), Patrick Tracy, Jackson (brother in law of Lowell), James (Jackson's brother), James (Jackson's brother), Charles (Jackson's brother), Nathan Appleton, Samuel Appleton, John Gore, Israel Thorndike (senior), Meria Gotting (Lowell's partner in IndiaWharf).
Authorised limit of capital 400,000.00 Dollars

২৬. Vera Shlakmen, *Economic History of a Factory Town: A Study of Chicopee,* (Massachusetts, 1935).

২৭. Kenneth Wiggins Porter, *The Jacksons and the Lees,* vol. 1, pp. 765-768; (Harvard University Press, 1937), pp. 765-768.

২৮. Bernard Bailyn et.al., *The Great Republic,* (Heath and Company, 1977), p.395.

২৯. এ ফ্রিগেট নির্মাণে অর্থ দান করেন ১৩ জন ভারত বণিক। দানের পরিমাণ অনুসারে তাঁদের নাম যথাক্রমে বেঞ্জামিন পিকম্যান, উইলিয়ম গ্রে, ইলিয়াস হাসকেট ডার্বি, জন সরিস, ইশাবোধ নিকোলাস, জন ডার্বি, ইজেকেল ডার্বি, ই এইচ ডার্বি (জুনিয়র), নেথানিয়েল ওয়েস্ট, রিচার্ড ডার্বি, ক্লিফোর্ড ক্রাউনিনশিল্ড, বেঞ্জামিন হজেজ ও স্যামুয়েল পোপস। Source: Howard Corning, 'Salem Men in the Early Nineteenth Century', *Essex Institute Historical Collections,* LXXV (January 1939).

৩০. দেখুন Crowninshield's memorandum to U.S. President Thomas Jefferson, January 29, 1805, in Jefferson MSS, State Department Archives, 1805.

৩১. James McCutcheon, 'The Asian Dimension in the American Revolutionary Period', in *The American Revolution: Its Meaning to Asians and Americans,* edited by Cedric B Cowing (Honolulu, Hawaii, 1977), p. 89.

৩২. Richard Feffrey Cleveland, *Voyages and Commercial Enterprises of Sons of New England,* (First published, New York 1857, reprinted edition, 1968), pp.124-25.

৩৩. Jacob Bigelow's Journal, 1811-12, at Massachusetts Historical Society, Boston.

৩৪. Norton to Charles H. Mill, 10 February 1850, See Norton Papers at Houghton Library, Harvard.

৩৫. Norton to Longfellow, Calcutta 21 October 1849, Norton Papers. Peabod Museum, Salem.

৩৬. Samuel Eliot Morison, *The Maritime History of Massachusetts, 1783-1860*, (Harvard University Press, 1921), p.285.

৩৭. Norton to Longfellow, Calcutta 21 October 1849, Norton Papers, Peabod Museum, Salem.

৩৮. Abu Taher Majumdar, Sir William Jones: Glimpses into Eighteenth Century Critical Thoughts, (1992), p. 28.

৩৯. George Baghot, *Americans in India* (*1784-1860*), (New York, 1970), pp.117-18.

৪০. Samarjit Chakraborti, *The Bengali Press (1818-1868): A Study in the Growth of Public Opinion,* (Calcutta, 1976), p. 7.

৪০. Louis K. Harnett, 'Emerson and the Bhagavad-Gita,' *Ariel*, VII (May 1907); Arthur Christy, *The Orient in American Transcendentalism*, (New York, 1932).

৪১. Satya S. Pachori, *Emerson's Essay on "Illusions" and Hindu Maya,* Kyushu American Literature, No. 18, October 1977, pp.45-51.

রাজনীতি চিন্তা

বাংলাদেশে হরতাল ও স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো

বার্ট সুইকেন্স ও **আইনুল ইসলাম**

সারসংক্ষেপ

হরতাল—সাধারণ ধর্মঘট, অবরোধ কিংবা সম্পূর্ণ অচলাবস্থা, বাংলাদেশের রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিরোধী দলগুলো সরকারি দলকে চাপে ফেলতে হরতালকে একমাত্র অবলম্বন মনে করে, কিন্তু বাংলাদেশি মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংগঠনগুলো হরতালকে ধ্বংসাত্মক কর্মযজ্ঞ হিসেবেই দেখে। বাংলাদেশের স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোর সংগঠনে হরতাল কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা স্থানীয় পর্যায়ে হরতাল-প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে দেখানো হয়েছে। হরতালকে একটি জটিল রাজনৈতিক কর্মসিদ্ধি হিসেবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, হরতাল স্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠকদের স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোতে নিজেদের অবস্থানকে প্রদর্শন করা, বজায় রাখা এবং উন্নত করতে অনেক সুবিধা প্রদান করে থাকে। বহুস্তরের জনগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারায় হরতাল তাদের স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সুবিধাজনক পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এসব সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছা এবং হরতালে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করার সামর্থ্য, দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হিসেবে কাজ করে। এই পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখানে দুটো বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যার একটি হলো হরতালে অংশগ্রহণকারীদের আকৃষ্ট করা এবং অন্যটি হরতালে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা। এ ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক নেতাদের বিবেচনায় হরতাল ছেড়ে 'কম ধ্বংসাত্মক' প্রতিবাদের ধরনকে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা খুব কমই আকৃষ্ট করে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: হরতাল, ধর্মঘট, স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো, রাজনৈতিক কর্মক্ষমতা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

১. প্রারম্ভিক কথা

স্বাধীনতার পর থেকে হরতাল, সাধারণ ধর্মঘট, অবরোধ এবং সম্পূর্ণ অচলাবস্থা বাংলাদেশের রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব দোকানপাট ও যান চলাচল বন্ধ এবং জনজীবন সম্পূর্ণ স্তিমিত হয়ে গেলে হরতালকে সফল ধরে নেওয়া হয়। এর মধ্যে সীমিত পরিসরে রিকশা চলাচল করতে দেওয়া হয়। হরতালের মতো সমন্বিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড উদ্ভব হয়েছিল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময়। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন এবং স্বাধীনতার পর স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে হরতাল বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও বিরোধী দলের জন্য হরতাল সুবিধাজনক অবলম্বন হিসেবে তাদের দাবি-দাওয়া ক্ষমতাসীন দলের কাছে পৌঁছাতে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে অঘোষিত পদ্ধতিটি হলো বিজয়ী রাজনৈতিক দলই সবকিছু পাবে। এটিই বিরোধী দলগুলোকে জাতীয় সংসদের পরিবর্তে রাজপথের আন্দোলনকে উৎসাহিত করে থাকে। হরতালের মতো কার্যকলাপ প্রাত্যহিক কাজকর্ম বিঘ্নিত করে বলে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা এবং জাতীয় পর্যায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এর তীব্র নিন্দা জানায়। পণ্য উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং এর স্থানান্তর ব্যাহত করায় হরতাল অর্থনীতির জন্য চরম ক্ষতিকর একটি কর্মসূচি এবং রাজনৈতিক শ্রেণীর জন্য অবক্ষয় হিসেবেই গণ্য হয়। কিন্তু এই ক্ষোভ থাকার পরও হরতাল থেমে নেই। বিরোধী দলগুলোর দাবি, তাদের অসন্তুষ্টি জানানোর জন্য এটিই একমাত্র পন্থা; অন্যদিকে মধ্যবিত্ত এলিট শ্রেণী মনে করে হরতালের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় বলেই হরতালব্যবস্থা টিকে থাকে।

যে বিষয়টি নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই সেটি হলো ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণের পর থেকে হরতালের সংখ্যাগত বৃদ্ধি। আশির দশকে হরতালের মাত্রা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। যেখানে ১৯৪৭-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত মোট ২০৩ দিন হরতাল ডাকা হয়েছিল, সেখানে ১৯৮৭-১৯৯০ সালের মধ্যে ২৪৫ দিন হরতাল পালিত হয়, যার বেশির ভাগই স্বৈরাচার এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে। ১৯৯১ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে হরতাল পালিত দিনের সংখ্যা হয়েছে আকাশচুম্বী, ৮২৭ দিন। (ইউএনডিপি বাংলাদেশ ২০০৫)। ২০০২ সালের পর আজ অবধি হরতালের ধরন, পরিসর ও প্রক্রিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। যোগ হয়েছে অনেক নিত্যনতুন কারণ। ২০১২-২০১৩ সালে হরতাল অনেকটাই স্থানীয়করণ হয়েছে। একসময় হরতাল বাস্তবায়নের নির্দেশনা আসত কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পর্যায় থেকে। কিন্তু এখন স্থানীয় পর্যায় থেকেও হরতাল পালনের নির্দেশনা দেখা যায়। প্রক্রিয়াগত দিক থেকে একে একটি বড় পরিবর্তন বলা যায় (এই বিষয়ে পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করা হবে।)

যাই হোক, ক্রমবর্ধমানভাবে হরতালের গুরুত্ব বাড়লেও এই বিষয়ের ওপর সুনির্দিষ্ট ও বিস্তৃত গবেষণা খুব কমই হয়েছে (হোসেন ২০০০, মনিরুজ্জামান ২০০৯, রাশিদুজ্জামান ১৯৯৭, ইউএনডিপি বাংলাদেশ ২০০৫)। বেশির ভাগ গবেষণাই হরতালকে বৃহত্তর পরিসরে দেখতে চেয়েছে। হোসেন (২০০০)

দেখেছেন হরতালকে ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একচেটিয়াকরণ এবং সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির ফলাফল হিসেবে। বিপরীতভাবে মনিরুজ্জামান (২০০৫) মনে করেন, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যকার আদর্শিক দ্বন্দ্বই হরতালের কারণ, যদিও উনি মনে করেন যে দুটি দলের মধ্যে ক্রমেই আদর্শিক মিল ঘটছে। বেশির ভাগ বিশ্লেষক মনে করেন, বাংলাদেশে হরতাল রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভঙ্গুর অবস্থার একটি চিত্র (রাশিদুজ্জামান, ১৯৯৭)। যদিও এই গবেষণাগুলো গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিচারে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর হতাশার প্রতিফলন, কিন্তু তাঁরা 'সংঘাতময় রাজনীতির' উৎপাদনশীল দিকটি বিবেচনা করেননি। হরতাল কীভাবে সংগঠিত হয়, এই প্রক্রিয়াগত বিষয়টি বরাবরই অনালোচিত রয়ে গেছে।

২০০৫ সালে ইউএনডিপি Beyond Hartal নামে একটি গবেষণা পরিচালনা করে, যেখানে হরতালের ইতিহাস ও এর অনুশীলনের একটি বিস্তৃত এবং গভীর পর্যালোচনা দেওয়া হয়। এখানে দুজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ইরাজ আহমেদ এবং গোলাম মর্তুজা স্থানীয় পর্যায়ে এবং বাস্তবিক অর্থে হরতাল কীভাবে সংগঠিত হয়, তার একটি চমৎকার বর্ণনা দেন। এতৎসত্ত্বেও, এই কাজটিও এই বিষয়ের ওপর অন্যান্য কাজের মতো একই জায়গায় আলোকপাত করেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশকে যেভাবে উপস্থাপন করে ঠিক সেভাবেই হরতালকে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখেছে। সবশেষে, তারা হরতালের বিকল্প সম্ভাবনাগুলো উদ্‌ঘাটন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। যদিও এই প্রচেষ্টা অবশ্যই মূল্যবান, এবং সাধারণ মানুষ মনে করেছিল ২০০৭-০৮ সালে হরতালের অনুপস্থিতি তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক, তদুপরি, হরতালের উপস্থিতিকে একটি অগণতান্ত্রিক ব্যাধি হিসেবে না দেখে এটিকে একটি সুবিধাজনক রাজনৈতিক উপকরণ হিসেবে দেখা উচিত।

রাজনৈতিক কর্মক্ষমতার[১] আলোচনায় আগ্রহী বেশির ভাগ লেখক হরতালকে দেখে একটি একক কর্মক্ষমতা হিসেবে, যেটি একই ধরণের প্রতীকী বিষয়বস্তুসম্পন্ন, কিন্তু বিশাল সংখ্যক মানুষকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। তাঁরা অনেকগুলো নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমিত মনোযোগ দেন, যেগুলোর রাজনৈতিক কর্মক্ষমতা অনেক ব্যাপক এবং উদ্দেশ্য বহুসংখ্যক দর্শককে আকৃষ্ট করা। হরতালের এই বিশেষ কর্মক্ষমতার দিকগুলো এই লেখার পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হবে। প্রকৃতপক্ষে দূর থেকে দেখলে মনে হয়, হরতালে যারা অংশগ্রহণ করে তারা নির্দিষ্ট হরতাল কর্মসূচি (লিউকস ১৯৭৫) বা বিষয়বস্তুতে (টিলি ১৯৯৩) একমত। হরতালের সংগঠনের দিকটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করলে বিশেষ সক্ষমতার দিকসমূহ, তাদের লক্ষ্যবস্তু এবং আরও স্থানীয় পর্যায়ে এর কার্যকারিতা বোঝা যাবে। আমরা জোসেফ এশেরিকের (২০০৭ :২৪৩) সঙ্গে একমত যে রাজনৈতিক কর্মক্ষমতা রাজনীতিকে

দৃশ্যমান করে। এটি বহু পর্যায়ের রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আলোচনারও দাবি রাখে। মুম্বাইয়ে শিবসেনার রাজনীতির স্থায়ী কর্মক্ষমতার বিশ্লেষণে থমাস ব্লম হ্যানসেন সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে 'ছবি ও দৃশ্য তৈরি, বক্তব্যের ধরন, পোশাক এবং গণমানুষের আচরণ একটি আন্দোলন বা দলকে সমুন্নত করে, তার সদস্যদের সংজ্ঞায়িত করে এবং এটার হেতু বা বিশ্ব দর্শনকে উন্নত করে, আর এসব নিয়েই রাজনৈতিক পারফরম্যাটিভিটি গঠিত হয়' (হ্যানসেন ২০০৪ : ২৩)। এই সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে তিনি রাজনৈতিক কর্মক্ষমতার অন্যান্য অনেক বিশ্লেষণের চেয়ে আচরণগত ও সামাজিক ভূমিকার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে অধিকতর সক্ষম হয়েছেন। হরতালকে বুঝতে হলে হরতালের সময়ে অংশগ্রহণকারী এবং সংগঠকেরা কীভাবে বহু পর্যায়ের লক্ষ্যবস্তুকে গুরুত্বসহকারে হরতাল কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করে তা মনোযোগসহ অনুধাবন করতে হবে। আমরা ভিনসেন্ট ফচারের (২০০৭ : ১২০) সেনেগালে পার্টি সোশ্যালিস্ট অনুষ্ঠানের আলোচনার সঙ্গে একমত : 'পার্টি সোশ্যালিস্টকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে বুঝতে হবে যে এই অনুষ্ঠানে তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো অভ্যন্তরীণ এবং এই অনুষ্ঠানটি হলো অভ্যন্তরীণ পার্টি সোশ্যালিস্ট রাজনীতির মূল উপাদান।'

সংক্ষেপে বলতে গেলে এই প্রবন্ধ দুটি মূল যুক্তির ওপর ভিত্তি করে এগিয়েছে : প্রথমত, হরতালের ঘটনা বুঝতে হলে আমাদের এর বিশেষ কর্মক্ষমতার দিকটি বুঝতে হবে। আমরা যুক্তি দেখিয়েছি যে হরতালের দিন কীভাবে স্থানীয় এলিট এবং হরতাল সংগঠকেরা কর্মক্ষমতা দেখাল সেটার ওপর তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এ জন্য হরতাল এবং হরতালে যে ভূমিকা রাখা হয় সেটা সংগঠকদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে এবং স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোয় এলিটদের 'বেড়ে ওঠার' সঙ্গে সম্পৃক্ত। মূলত কতগুলো প্রত্যক্ষ কারণ, যেমন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কিংবা সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনকানুনের পক্ষ-বিপক্ষকে কেন্দ্র করে, হরতাল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলেও প্রকৃতপক্ষে হরতালের কর্মক্ষমতা অনেক গভীর। হরতালের দিনে বিশেষ করে ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারে কী ধরনের ভূমিকা পালন করা হয়, স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ভবিষ্যতে সেটার একটি বড় ভূমিকা আছে।

দ্বিতীয়ত, প্রথম যুক্তির সমর্থনে এই বিশেষ কর্মক্ষমতার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর ধরন নিয়ে আলোচনা করা হবে। সাদা চোখে হরতালের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু খুব পরিষ্কার। এর উদ্দেশ্য হলো জনজীবন নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতাসীন দলের কাছে বিরোধী দলের চলমান ক্ষমতাকে প্রকাশ করা। হরতাল সংগঠনপ্রক্রিয়া এবং হরতাল সংগঠনে বিভিন্ন কর্মকের (actor) ওপর দায়িত্ব ভাগাভাগির দিকে ভালোভাবে নজর দিলে দেখা যাবে, উদ্দেশ্যকৃত বিষয়বস্তু মোটেও একটি নয়। হরতালের কতগুলো বিশেষ কর্মক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করে পরবর্তী অংশে দেখানো হবে

হরতালের বিষয়বস্তু বহু পর্যায়ের, যার সম্পৃক্ততা গাণিতিক আকারে বৃদ্ধি পায়।

এই প্রবন্ধটি ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের মাঠ পর্যায়ের গবেষণার ফলাফল। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় পর্যায়ে কীভাবে হরতাল সংগঠিত হয় তার একটা বিশ্লেষণ দাঁড় করানো। এই গবেষণায় ঢাকার প্রধান তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকারগুলোর (রাজনীতিক, সাংবাদিক, গবেষক ও নাগরিক সমাজ) সঙ্গে চট্টগ্রামে স্থানীয় পর্যায়ে হরতালে অংশগ্রহণকারী এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত অনানুষ্ঠানিক এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনার একটি সমন্বয় রয়েছে। ঢাকার পর চট্টগ্রামই প্রধান হরতালপ্রবণ শহর। তাই প্রধান তথ্যদাতাদের সঙ্গে কথা বলে এমন একটি ওয়ার্ড বাছাই করা হয়েছে, যেখানে হরতাল সংগঠনে শহর কেন্দ্রের সঙ্গে কাছাকাছি দূরত্বের হওয়ায় এবং হরতালে প্রয়োজনীয় লোকবল সহজেই পেয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকায় এটা স্থানীয় পর্যায়ে হরতাল সংগঠন বোঝার ক্ষেত্রে একটি আদর্শ জায়গা, যেটি পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মসূচির ঐতিহ্যও বহন করে।

২. বিজয়ীই সব পাবে (winner-takes-all) : বাংলাদেশে সাংঘর্ষিক রাজনীতি এবং হরতাল

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ কখনো একদলীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে, আবার কখনো সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকারের অধীনে অনেকটা সময় পার করলেও, সবশেষে ১৯৯১ সালের পর থেকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সেই থেকেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নামক দুটি রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে এবং দুই নারী নেত্রীর অনেকটা ব্যক্তিগত শাসনের অধীনে। একজন হলেন শেখ হাসিনা, যিনি নিহত জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা এবং আরেকজন খালেদা জিয়া, যিনিও নিহত সাবেক সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের স্ত্রী (কচানেক ২০০০, ভ্যান শেন্ডেল ২০০৯)। যদিও তীব্র লড়াইয়ের মাধ্যমে নির্বাচন হচ্ছে, তথাপি শাসনক্ষমতা এই দুই দলের মধ্যেই পালাবদল হচ্ছে। ১৯৯১ সালের পর বিএনপি প্রথম নির্বাচনে জিতেছিল, তার পরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে এবং তার পর থেকে ক্ষমতার এই চক্রাকার পালাবদলই চলছে।

যদিও জনমনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে ক্ষমতার পালাবদলে একটি স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পাওয়া যাবে, তথাপি বিরোধী দলের ভাষ্য প্রকাশের তেমন কোনো সুযোগ আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিজয়ী সব পাবে মানসিকতা বিরাজমান, যেটিকে ঢাকায় অবস্থিত ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স স্টাডিজ তাদের প্রভাবশালী 'স্টেট অব গভর্ন্যান্স' প্রতিবেদনে পার্টিআর্কি বলে আখ্যায়িত করে :

> বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় যেখানে বিজয়ী তার রাজনৈতিক মেয়াদকালে ক্ষমতার একক কর্তৃত্ব ভোগ করে, সেখানে ক্ষমতাসীন দল এবং তার অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব রাজনৈতিক ক্ষমতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই অভ্যন্তরীণ চক্রটির সমগ্র দল, আইনসভা, সংসদীয় কমিটিসমূহ, প্রকিউরমেন্ট নীতিসমূহ, উন্নয়ন বরাদ্দ, আমলাতন্ত্র এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর কার্যত কর্তৃত্ব রয়েছে। এটার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা কিছুটা সীমিত হয় মাঝে মাঝে উচ্চতর আদালত এবং সময় সময়ে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সংগঠনসমূহ কর্তৃক গঠিত গণ-নিরীক্ষণের মাধ্যমে। (হাসান ২০০৬ : ২০)

যেহেতু আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা রাখার সুযোগ সীমিত, ১৯৯১ সালে গণতন্ত্রে ফিরে আসার পর থেকে সাংঘর্ষিক রাজনীতিই বাংলাদেশের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে (হাসান ২০০৬, কচানেক ২০০০, মনিরুজ্জামান ২০০৯, রহমান ২০০৭)। যদিও বিশ্লেষকদের মধ্যে এর নির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগই একমত যে রাজনৈতিক সহিংসতা বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক সহিংসতার মাত্রা এবং রাজপথের রাজনীতির কারণে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয় এবং ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালু থাকে। হরতাল এই সাংঘর্ষিক রাজনীতির একটি অন্যতম প্রধান উপকরণ।

৩. প্রথম ধাপ : হরতালের স্ক্রিপ্ট/বিষয়বস্তু

হরতাল পালনের প্রথম স্তরে যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো কড়াকড়িভাবে নিয়ম এবং কৌশলাদি মেনে চলা (টিলি ১৯৯৩, ২০০৮)। এর মানে হলো হরতাল পালনকারীরা বা সংগঠনকারীরা আওয়ামী লীগ-বিএনপি যে দলেরই হোক না কেন, তারা একইভাবে, একই জায়গায় এবং একই দৃশ্যপট অনুসরণ করে।[২] যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তারা হরতালের পূর্ব-মুহূর্তে এবং হরতাল চলাকালে একই ধরনের কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেছে। যারা হরতালে অংশগ্রহণ করে না, তারাও অনুমান করতে পারে হরতালের দিন কী ঘটবে। এই অনুমান হরতাল সফল করার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, লোকজন তাদের যানবাহন চালায় না হরতাল পালনকারীরা জ্বালিয়ে দিতে পারে এই ভয়ে, দোকানিরা তাদের দোকান বন্ধ রাখে হরতালে ভাঙচুরের ভয়ে। এ জন্য সাধারণ ধর্মঘট স্বতঃস্ফূর্ত নয়, অনেকটা আরোপিত। সাধারণ মানুষ হরতালের নিয়মনীতি জানে এবং এ-ও জানে হরতালের নির্দেশনা না মানলে এর পরিণতি কী হবে।

হরতাল শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকে ভবিষ্যৎ হরতাল সম্পর্কে অনুমান করা শুরু হয়। আমাদের প্রায় সব উত্তরদাতাই মনে করে, নির্বাচনের এক-দেড় বছর

আগে থেকে যে হরতাল আসবে তা জানা সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার এবং যত নির্বাচন ঘনিয়ে আসবে ততই এর মাত্রা বাড়তে থাকবে। যখনই প্রত্যাশা করা হয় যে হরতাল আসবে, তখনই সংবাদপত্রগুলো হরতাল সম্পর্কে সংবাদ এবং গুজব ছড়ানো শুরু করে এবং দলের নেতারা যে হরতাল নিয়ে আলোচনা করছেন সে কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সবশেষে, দলীয় নেতৃত্ব যেদিন হরতাল হবে তার প্রায় এক সপ্তাহ আগে হরতালের তারিখ ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবারগুলোকে অধিক পছন্দের তারিখ হিসেবে ধরা হয়, কারণ এর পর থেকেই লম্বা সাপ্তাহিক ছুটি শুরু হয়—শুক্রবার এবং শনিবার যেহেতু সাপ্তাহিক ছুটির দিন। হরতাল শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ আগে থেকে পুলিশ কিছু সুপরিচিত হরতাল সংগঠনকারীকে গ্রেপ্তার করতে থাকে অথবা হরতালপ্রবণ এলাকাগুলোতে নির্বিচারে গ্রেপ্তার চালাতে থাকে। হরতালের দিন কী ঘটবে, সেটির জন্য আগের রাতটি গুরুত্বপূর্ণ। সে রাতে, কিছু যুবক—আমরা পরে নির্দিষ্ট করব—ঘোরাফেরা করে এবং কিছু দেশীয় তৈরি বোমা (ককটেল) বিস্ফোরণ ঘটায় এবং বাসসহ কিছু যানবাহন ভাঙচুর করে। হরতালে এই ধরনের সহিংসতা খুবই স্বাভাবিক এবং যেসব এলাকায় যানচালিত ভ্রমণে এই ধরনের সহিংসতার আশঙ্কা বেশি থাকে, সেদিক দিয়ে অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত পরিহার করা হয়।

হরতালের দিনগুলোতে বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা চলতে থাকে। এর মধ্যে দোকানপাট অবশ্যই বন্ধ হয়ে যায় এবং সাধারণ সময়ে জনাকীর্ণ ও ট্রাফিক-জ্যামে পরিপূর্ণ শহরের রাস্তাঘাটও খালি হয়ে যায়। ট্রাফিক জ্যাম পরিপূর্ণ রাস্তাঘাট সম্পূর্ণরূপে খালি দেখতে অদ্ভুত ও ভীতিকর মনে হয়। একটি অবরুদ্ধ অবস্থা অনুভূত হয়। দ্বিতীয়ত, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হরতালকারীরা শহরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়। কিছু কিছু জায়গা প্রতীকীর দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পাকিস্তান এবং এরশাদবিরোধী আন্দোলনে এগুলো হরতাল সংগঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিছু লোক গোষ্ঠীগতভাবে আশপাশে ঘোরাফেরা করে এবং যেসব যানবাহন হরতাল অমান্য করে রাস্তায় বের হয়েছে সেগুলোকে থামিয়ে দেয়। প্রায়ই যেসব যানবাহন হরতালের ডাককে উপেক্ষা করেছে এবং যেসব দোকানপাট খোলা হয়েছে সেগুলোকে ভাঙচুর করে। তৃতীয়ত, এক বা একাধিক মিছিল বের করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে হরতাল পালনকারীদের শক্তির জানান দেওয়া হয়। এসব মিছিল স্থানীয় বা জাতীয় রাজনীতিবিদদের বক্তব্য দেওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয় এবং প্রায়ই সহিংসতায় রূপ নেয়। সহিংসতার সময় দুটি প্রধান বিষয় চোখে পড়ে : একটি হলো যখন হরতাল সমর্থকেরা কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে চায় বা সফল হরতাল সম্পাদন করতে চায় তখন ক্ষমতাসীন জোটের মোতায়েন করা পুলিশ বাহিনী বাধা প্রদান করে। সাক্ষাৎকারদাতাদের কেউ কেউ মনে করে পুলিশ ইচ্ছা করেই সহিংসতা উসকে

দিতে চায়, যাতে করে বিরোধী দলের সহিংস রূপ মানুষ দেখতে পায়। আর আরেকটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন হরতাল সমর্থকগোষ্ঠী এবং ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের[৩] হরতালবিরোধী গোষ্ঠী মুখোমুখি হয়। তখন সংঘর্ষে আহত ও নিহতের ঘটনাও ঘটে। মূলত সহিংসতা এখন হরতালের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে, যার ফলে যারা হরতালের বিরোধী তারা নিন্দা জানায় এবং হরতালের নামে এসব কার্যকলাপের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কারণ প্রকৃতপক্ষে হরতাল বলতে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম এবং গান্ধীবাদী অসহিংস কার্যক্রমের বিষয়বস্তুকে বোঝায়।

হরতালের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে সহিংসতার সম্পর্ক বুঝতে হলে আরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন।[৪] আসলে হরতাল একটি বহুল প্রচলিত অনেক পুরোনো ঐতিহ্য। ঐতিহাসিক সংগ্রামের দিনগুলোতে হরতালের সময় গণমানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের ঐতিহ্য আছে, যা বর্তমান সময়েও হরতালের বৈধতা দিয়ে থাকে। তারা ৭০ থেকে ৮০ বছরের পুরোনো হরতালের ধরনকে রাজনৈতিক কার্যক্রমের মডেল হিসেবে দেখাতে চায়। ব্রিটিশবিরোধী গান্ধীবাদী আন্দোলন, পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং এরশাদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের সংগ্রাম সমসাময়িক হরতালকে বৈধতা দান করে, যদিও গান্ধীর[৫] অহিংস ধাঁচের আন্দোলন, গণমানুষভিত্তিক স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনের ধারে-কাছেও এখনকার হরতালগুলোর কার্যক্রম নেই। অনেক উত্তরদাতা অভিযোগ করেন, হরতাল শুধু নামেই হরতাল এবং আগের অসহিংস ও গণমানুষ-সমর্থিত হরতালের সঙ্গে এখনকার হরতালের কোনো সাদৃশ্য নেই। অনেকেই, বিশেষ করে যারা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, তারা মনে করে হরতাল দক্ষিণ এশীয় ধাঁচের একটি প্রতিবাদের ধরন।[৬] তারা মনে করে এটি আগে সফল হয়েছে এবং সব সময়ই একটি বৈধ রাজনৈতিক হাতিয়ার।

হরতালের প্রথম ধাপে লক্ষ্যবস্তু একেবারেই পরিষ্কার—প্রথমত, এর মাধ্যমে বিরোধী দল ক্ষমতাসীন দলকে তাদের চলমান শক্তি ও উপস্থিতি প্রদর্শন করে। দ্বিতীয়ত, হরতালে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, যেমন নির্বাচনসম্পর্কিত অথবা পরিবর্তনের অঙ্গীকার তুলে ধরার মাধ্যমে বিরোধী দল বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের ভূমিকা এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি[৭] মঞ্চস্থ করে। সবশেষে, যদিও বহুলাংশেই সম্ভব হয় না, তবুও হরতালের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দেখানো হয় যে ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলের মতকে উপেক্ষা করে চলেছে। এ ক্ষেত্রে হরতাল সফল হয়েছে ধরে নেওয়া যায় যদি ক্ষমতাসীন দল ক্রমাগত হরতালে চাপের মুখে তাদের কিছু নীতি বিরোধী দলের দাবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় অথবা যদি বহুল জনগোষ্ঠী বিরোধী দলের পক্ষে অবস্থান নেয় (এবং নির্বাচনে জয়ী হয়) অথবা যদি হরতালকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ক্ষমতাসীন দলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

সবশেষে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য হলো দলগুলোর মধ্যে হরতাল সম্পর্কে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন। অনেক বিশ্লেষক এবং নাগরিক সমাজের সদস্যরা হরতালের নিন্দা করেছে, এবং আওয়ামী লীগ বা বিএনপি যে দলই হোক না কেন, যখন ক্ষমতায় থাকে তখন সর্বজনীনভাবে হরতালের নিন্দা করেছে এবং হরতালবিরোধী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছে, কিন্তু বিরোধী দলে গিয়ে সর্বজনীনভাবে ঘোষণা করেছে যে হরতালেই তাদের বক্তব্য প্রকাশের জন্য একমাত্র পথ। এই অবস্থায় বলা যায়, হরতাল সরকারি দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে একটি যোগাযোগ স্থাপনকারী উপাদান, যার মাধ্যমে যথাক্রমে হরতাল সফল ও ব্যর্থ উভয়ই হতে পারে। এটি স্থানীয় পর্যায়েও ঘটে। এই গবেষণায় দেখা যায়, কীভাবে স্থানীয় পর্যায়ে সরকার-সমর্থিত রাজনৈতিক কর্মীরা হরতাল বানচাল প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্ষমতার ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থানকে আরও সুসংহত করে।

৪. হরতাল একটি জটিল রাজনৈতিক কর্মক্ষমতা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে অনেক বিশ্লেষকের হরতাল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মক্ষমতার বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার পরও, হরতালের শুধু এই প্রথম ধাপকে ধরে নিলে রাজনৈতিক উপস্থাপনার বহুমুখী ধরনকে অগ্রাহ্য করা হবে। হরতাল কর্মকাণ্ডে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে পুরো হরতাল কর্মক্ষমতার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক বোঝা যায়, যার মাধ্যমে মূলত রাজনৈতিক কর্মক্ষমতা, বিশেষ করে হরতালের প্রকৃত কার্যক্রম ভালোভাবে বোঝা যাবে। অনেক লেখকের মতে, এখানে ব্যক্তির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়ই দেখা যায়, আলোচনা মূলত উচ্চপর্যায়ের নেতাদের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন সভাপতির বক্তব্য এবং প্রচারণা (অ্যাবেলস ১৯৮৮, ম্যাকলয়েড ১৯৯৯) অথবা উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক মামলা, বিচার ইত্যাদি (কাভিরাজ ২০০৭, ট্রিপ ২০০৭)।

হরতালের মতো রাজনৈতিক কর্মে সাধারণ অংশগ্রহণকারীদের ওপর খুব কমই মনোযোগ দেওয়া হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: কেন জনগণ হরতালে অংশগ্রহণ করে? হরতালের মতো বৃহৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীরা প্রকৃতপক্ষে কতগুলো নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমে কী প্রদর্শন করতে চায়, কেন করতে চায় এবং কাদের কাছে পৌঁছাতে চায় তা স্পষ্টত বোঝা যায়নি। এসব গণরাজনৈতিক কর্মসম্পাদনকে বিশ্লেষণ করে বহুমুখী ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে হরতাল একটি জটিল রাজনৈতিক কর্ম, যা মূলত বিভিন্ন ধরনের মিটিং-সমাবেশ, পিকেটিং, বন্ধ ঘোষণা এবং বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার একটি সমষ্টি। হরতালের সময় সম্পাদিত এসব জটিল কর্মকাণ্ডের ভূমিকা বহুগুণীয় এবং যৌথ কর্মের একধরনের মঞ্চায়ন। এ ক্ষেত্রে, হরতালের মতো বিবদমান কর্মক্ষমতার

বিষয়বস্তু তৈরি হয় আরেক ধরনের বিবদমান কর্মক্ষমতার মাধ্যমে, যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহ সম্পাদন করতে পারে (টিলি ২০০৮)। এটা অবশ্যই যে যাদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালিত তাদের ভূমিকাও এখানে মুখ্য। স্ট্রস এবং ক্রুইজ ও'ব্রেন (২০০৭৬ :৩-৪) যথার্থই বলেছেন যে কর্মক্ষমতার একটি মূল লক্ষ্য হলো জনগণের কাছ থেকে একটি ইতিবাচক সাড়া পাওয়া, কিন্তু জনগণকে ভুলভাবে নিলে কার্যকারিতা সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা তৈরি হতে পারে। বাংলাদেশের অনেক হরতাল জনগণের কাছে দলীয় আন্তরিকতার দিকটি নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়। আগেই বলা হয়েছে যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় হরতাল জনগণের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার সম্পূর্ণ ভুল একটি মাধ্যম। তথাপি, হরতালের রাজনীতি স্থানীয় বা মাইক্রো লেভেল থেকে দেখলে এবং স্থানীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করলে প্রথম দেখায় হরতাল ব্যর্থ মনে হলেও এটি সফল হতে পারে। ব্যর্থ মনে হয় কারণ অনেক ক্ষেত্রে হরতাল গণমাধ্যম এবং বেশির ভাগ জনগণের সমর্থন পায় না। হরতালকারীরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের কাছে পৌঁছাতে না পারলেও তাদের কাছে লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এ ক্ষেত্রে বলা যায় হরতালকারীরা খুব সহজেই স্থানীয় দলীয় নেতা, নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধি বা স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছে নিজেদের পারফরম্যান্স তুলে ধরতে পারে। এই নেতৃত্ব পর্যায়ের লোকগুলো তারাই যারা স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোয় হরতালে অংশগ্রহণকারীদের আনুগত্য পেতে চায় বা হরতাল পালনকারীকে দলের বিশ্বাসযোগ্য কর্মী হিসেবে দেখতে চায়। এই রকম একটি পারফরম্যান্স যখন সামগ্রিকভাবে, প্রথম ধাপে এবং অধিক জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে নেওয়া হয়, তখন এটিকে ব্যর্থ মনে হতে পারে, কিন্তু যখন খুবই ছোট পরিসরে এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে করা হয়, তখন সফল বলেই মনে হয়। একই সঙ্গে, বৃহত্তর পরিসরে হরতালের সফলতা, যেমন কোনো আইন পরিবর্তন বা সরকার পতন স্থানীয় পর্যায়ে ব্যর্থ মনে হতে পারে, কারণ হরতাল পালনকারীরা তাদের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারে না।

৫. হরতালের বিশেষ কর্মক্ষমতা এবং স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামো

প্রবন্ধের এই অংশে ক্ষমতা সংগঠনে হরতালের ভূমিকা এবং নির্দিষ্ট চালক/কর্তা কর্তৃক হরতাল পারফরম্যান্স কীভাবে স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোয় সম্পৃক্ত, তা ভালোভাবে বোঝা যাবে। এসব নির্দিষ্ট কর্মক্ষমতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা মানে এই নয় যে আমরা হরতালের প্রাথমিক পর্যায়টি বাদ দিয়ে দিচ্ছি। এ জন্যও নয় যে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়টি দেখছি এমনভাবে, যেখানে মানুষ হরতালে অংশগ্রহণ করে শুধুই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনে; বরং আমরা মনে করি, এই ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স যেভাবে স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামো এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা হরতালের প্রথম

ধাপের গণকর্মক্ষমতার সঙ্গে জড়িত। হরতাল-প্রক্রিয়ার এই ব্যক্তিপর্যায়ের এবং গণ-পারফরম্যান্সের আদান-প্রদানের সঙ্গে বর্তমান সময়ে হরতালের বিকল্প খোঁজার যুক্তি সমর্থনযোগ্য—যেমন হরতালের বিকল্প হিসেবে মানববন্ধন।

শুধু নির্দিষ্ট ভূমিকা বা বিষয়বস্তুই স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত নয়, বরং হরতাল চলাকালে বিভিন্ন কর্মযজ্ঞও কারও পারফরম্যান্স স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোতে তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করে। হরতাল স্থানীয় পর্যায়ে এবং ক্ষমতার একেবারে ওপরের পর্যায়েও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং আনুগত্য পরিমাপের বাহন হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে হরতালের মতো গণকর্মক্ষমতা শুধু ক্ষমতাকাঠামোরই বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এটা পুরো ক্ষমতাকাঠামোকেই সুগঠিত করে অথবা খ্যাতি অর্জনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাকাঠামোয় নিজের একটা জায়গা করে নেয়।

৫.১ ঝুঁকি এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা

সাংগঠনিক সামর্থ্য ও ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোকে বিশেষ কর্মক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করে। শেষোক্তটি স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোর নিম্নপর্যায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেখানে প্রথমটি উচ্চপর্যায়ের জন্যই বেশি জরুরি। তথাপি, প্রতিটি পর্যায়েই এই দুটি উপাদানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সংঘটিত হয়।

হরতালের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত, এটি তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বটে, কিন্তু একই সঙ্গে এই ঝুঁকিই তাদেরকে নির্দিষ্ট কর্মক্ষমতার মূল্যায়নে সাহায্য করে। আগেই বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিরোধী দলের অনুসারীদের বহুলাংশেই ক্ষমতার বাইরে রাখে। এ ক্ষেত্রে বিরোধী দলের জন্য হরতালে অংশগ্রহণ করাটা ঝুঁকিপূর্ণ। আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে ক্ষমতায় আসার প্রত্যাশা পৃষ্ঠপোষকতারও প্রত্যাশা জোগায়। যদি কেউ দল এবং দলীয় স্থানীয় প্রতিনিধির প্রতি সত্যিকারের আনুগত্য প্রদর্শন করে, তাহলে ক্ষমতাকাঠামোয় তার অবস্থান তৈরি হয়। প্রথম পর্যায়ে, ছাত্রনেতারা ব্যাপকভাবে হরতাল এবং হরতাল-পূর্ব সহিংসতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। এটি সবারই জানা যে বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতি সংঘাতময় এবং সহিংস ছাত্রনেতাদের এই সহিংস কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার মতো অনুসারী খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয় না। আমরা কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলেছি, যাঁরা কিছুটা এখন বয়স্ক, তাঁরা বলেছেন যে তাঁরা নিয়মিত হরতাল সহিংসতায় অংশগ্রহণ করতেন। কারণ, এটা মজার এবং দুঃসাহসিক একটা ব্যাপার ছিল (দেখুন ভেরাকাইক ২০০৪)। বাস পোড়ানো, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ অথবা ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বা পিকেটিংয়ে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে ছাত্রনেতারা নিজেদের দলের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেন। বস্তিবাসী যারা নিয়মিত হরতালে অংশগ্রহণ করে তাদের মন্তব্য :

> তাদের নিজস্ব ক্ষমতা দেখানোর জন্য সহিংসতা করা হয়। এর মাধ্যমে দলীয় নেতাদের সঙ্গে মিশতে সহজ হয়। যদি স্থানীয় নেতারা কোনো ধরনের সহিংসতা সৃষ্টি করেন, দলীয় নেতারা পরবর্তীকালে তাঁদের ওপর নির্ভর করেন। এইভাবে এটি মহল্লা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।[৮]

সহিংসতা এবং বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে মূলত উচ্চপর্যায়ের নেতাদের নজরে পড়া যায়, যাঁরা হয়তো স্থানীয় পর্যায়ে সে রকম লোক খুঁজছেন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যুবলীগের মধ্যম সারির নেতারা সরাসরি হরতালের সহিংসতায় সম্পৃক্ত না হলেও সহিংসতা সংঘটনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন এবং হরতালের সমর্থনে আয়োজিত র‍্যালিতে বস্তিবাসীদের নিয়ে যেতে সরাসরি ভূমিকা রাখেন। মানুষকে সংগঠিত করার সামর্থ্য ক্ষমতাকাঠামোয় তাদের অবস্থান বজায় রাখতে এবং বৃদ্ধি করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়ই এসব মধ্যম সারির নেতাই গ্রেপ্তার হন, যেহেতু তাঁরা হরতাল সংগঠনের জন্য সুপরিচিত এবং এখনো রাজনৈতিকভাবে এতটা উচ্চপর্যায়ের নন, যাতে করে গ্রেপ্তারকারীদের জন্য বড় কোনো সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তাঁরা প্রায়ই মিছিল বা র‍্যালি থেকে জনতার নেতা হিসেবে গ্রেপ্তার হন। কিন্তু গ্রেপ্তার হওয়াটা তেমন বড় কোনো সমস্যা হিসেবে মনে করা হয় না, বরং এটি তাঁর দল ও সমর্থনকারীদের মধ্যে আনুগত্য প্রদর্শনের একটি পথ হিসেবে দেখা হয়। একজন নারী নেতা বলেন :

> আমরা সারা দিন রাস্তায় আন্দোলন করলাম। যখন বেশির ভাগ সমর্থক বাড়ি চলে গেল এবং আমিও বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, তখনই পুলিশ এসে আমাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেল। আমি তোয়াক্কা করিনি। আমি জনগণের জন্য কাজ করি। যখন মানুষ দেখবে, তখন তারা আমাকে মুক্ত করতে চলে আসবে। ছয়-সাত ঘণ্টা পরে সাংবাদিক এবং জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে কিছু ফোন এল থানায়। গরিব নারীরাই আমার বেশির ভাগ ভক্ত-সমর্থক; তারা থানায় জড়ো হতে লাগল। পুলিশ বুঝতে পারল যে অনেক গরিব নারী আসছে এবং তারা একটি আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে মুক্ত করবে। কিছুক্ষণ পরেই আমাকে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো।[৯]

উচ্চপর্যায়ের নেতাদের জন্য সরাসরি শারীরিক কোনো ঝুঁকি নেই; তাঁরা সহিংসতায় নিজেরা যুক্ত হন না। আওয়ামী লীগের একজন উচ্চপর্যায়ের নেতা, যিনি সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার ছিলেন, তাঁর উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। তিনি যেহেতু একটি বাস কোম্পানির মালিক ছিলেন, তাই হরতাল চলাকালীন তিনি মানুষজনকে র‍্যালিতে যোগ দেওয়ার জন্য পরিবহন-সুবিধা দিতেন। তবে সামান্য ঝুঁকির সম্ভাবনা ছিল। কেননা তিনি আওয়ামী লীগের একজন নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আবার যখন বিএনপি হরতাল ডাকত, তখন তিনি হরতাল অমান্য

করার জন্য বাস চলাচল অব্যাহত রাখতেন। অবশ্যই বাসের সংখ্যা ছিল কম এবং নিম্নমানের বাসই চলত, যেন পুড়িয়ে দিলেও কম ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি বাস পুড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে যে ইচ্ছুক, তা দেখিয়েছেন। আবার র‍্যালিতে আওয়ামী লীগ-সমর্থকদের যোগদানে সহায়তা করে তিনি তাঁর সাংগঠনিক সামর্থ্যও দেখিয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা। স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোর সব পর্যায়ই চায় র‍্যালি এবং মিছিলের জন্য সংখ্যাগত দিক দিয়ে মানুষ সরবরাহ করতে। এটাকে বলা যায় সংগ্রহ করার একটি ফাঁদ, যেখানে প্রতিটি পর্যায়ই তার পৃষ্ঠপোষকতার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মানুষ সমাবেশ করতে চায়। অংশত, এটি একটি পৃষ্ঠপোষকতার নেটওয়ার্ক তৈরিতে সাহায্য করে। যেমন আওয়ামী লীগের নেতারা যুবলীগের নেতার ওপর, আবার যুবলীগ ছাত্রলীগের ওপর। আওয়ামী লীগের একজন ব্যবসায়ী নেতা হরতাল ও অন্যান্য রকমের মিছিলের সংগঠনে তাঁর জড়িত থাকায় বিষয়টি এভাবে সংযুক্ত করেছেন :

> মন্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটা ধাপে ধাপে কাজ করে। যদি মন্ত্রী বলেন যে তাঁর কিছু লোক দরকার, আমি এখানে আট-দশজন বন্ধুর ওপর নির্ভর করি এবং তাদের প্রত্যেকের আবার বিশজন করে বন্ধু রয়েছে। এটি একটি ব্যক্তিগত যোগাযোগ। কিন্তু সেখানে আরও কিছু পেশাগত গোষ্ঠী রয়েছে। যেমন আভাষ স্থানীয় একজন যুবলীগের নেতা। যদি আমি তাঁকে ডাকি, তিনি আরও কিছু লোক জোগাড় করতে পারবেন। যেমন—এখানে রিকশাওয়ালা ও দোকানদারদের একটি সংগঠন রয়েছে। যদি আপনার লোক দরকার হয়, আপনি ওদেরকে ডাকলেই ওরা ব্যবস্থা করে দেবে। এ রকম প্রায় বিশটি কমিটি রয়েছে। এবং প্রতিটি কমিটি আরও বিশজন করে লোক আনতে পারে। তার মানে বিশকে বিশ দিয়ে গুণ করলে চার শ লোক হতে পারে।[১০]

একটি নিবিড় দলগত আলোচনায় নিচের সারির কর্মীরাও একই প্রক্রিয়ার কথা বলেছে :

> যখন উচ্চপর্যায়ের নেতা শাহ আমান, যাঁর এখানে নিজস্ব বাড়ি রয়েছে, একটি গ্রুপ তাঁর জন্য কাজ করে। শাহ আমানের একজন লোক আছে, তার নাম আলী আনছার। সে-ই শাহ আমানের জন্য লোকজন জোগাড় করে। আরেকজন আছে জাভেদ ভাই, তাকে লোক জোগাড় করতে বলা হয়। তখন জাভেদ ভাই এসে অন্যান্য ছোট নেতাকে ডেকে বলে ওপর থেকে 'খবর' এসেছে।[১১]

বিভিন্ন নেতার বিভিন্ন নেটওয়ার্ক এবং বিভিন্ন কমিটি সংগঠিত করার সামর্থ্য রয়েছে, যারা একে অন্যের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত। একটি নির্দিষ্ট ব্যানারে যত বেশি নেটওয়ার্ক থাকবে, তত বেশি লোক মিছিলে সমাগত হবে। এতে করে ওই

নেটওয়ার্কটি তত বেশি ওপরের সারির নেতাদের নজরে আসবে। দ্বিতীয়ত, সাংগঠনিক সামর্থ্য বলতে বোঝায় স্বাধীনভাবে লোকসমাগম করার সক্ষমতাকে। লোকসমাগম বলতে শুধু নিজের নেটওয়ার্ক দিয়ে তাদেরকে অন্তর্ভুক্তিই বোঝায় না, এ ছাড়া তাদেরকে সঠিক জায়গায় পায়ে হাঁটিয়ে বা বাসে চড়িয়ে নিয়ে আসা এবং আনতে প্রণোদনা দেওয়াকেও বোঝায় :

> বিভিন্ন ধরনের নেতার কাছ থেকে টাকা আসে, যাঁরা নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান। তাঁরা টাকা দেন স্থানীয় কোনো ছোট সংগঠককে এবং সে যেই বিশজনকে নিয়ে আসবে তাদের জন্য সে টাকা পাবে। এইভাবে ছোট সংগঠক আমাদেরকে টাকা দেয় এবং আমরা যাদেরকে নিয়ে আসি তাদেরকে টাকা বুঝিয়ে দিই।[১২]

প্রায়ই হরতালে অংশগ্রহণকারীদের[১৩] টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক সময় চা-নাশতা এবং দুপুরে খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়। নিচের সারির নেতারা এসবের জন্য টাকা পান, কিন্তু ওপরের সারির নেতারা বেশির ভাগ সময়ই ব্যক্তিগত টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করে থাকেন :

> যদি কোনো বৈঠক বা হরতালের মিছিল থাকে, ইউনিটের একজন নেতা হিসেবে নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখতে আমাকে পঞ্চাশজন লোক আনতে হবে। আমি লোক আনতে টাকা ব্যয় করি। অন্যথায় আমি আমার অবস্থান হারাব। যদি আমি লোক আনতে না পারি, তাহলে ওয়ার্ডের নেতারা আমাকে পছন্দ করবেন না। তাঁরা বলবেন : আমরা তোমাকে ইউনিট পর্যায়ে নেতা বানিয়েছি, কোনো ভিখারিকে নেতা বানাইনি।[১৪]

তখন নেতা গর্বের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদেরকে সত্যিকার অর্থেই তাঁর লোক হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাদেরকে শুধু কর্মী হিসেবেই উপস্থাপন করা হয় না, বরং তাদেরকে কাজে লাগানোর কৃতিত্বও নেওয়া হয়।

৫.২ স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামো গঠন এবং পরিবর্তন

ঝুঁকি নেওয়া এবং সাংগঠনিক সামর্থ্যের মতো বিভিন্ন ধরনের হরতাল কার্যক্রম স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোতে দুটি স্পষ্ট প্রভাব ফেলে : তারা ক্ষমতার মাধ্যমে অবস্থান প্রকাশ করে, এবং সেই অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা, সুদৃঢ় এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে চায়। এ ক্ষেত্রে তারা বহু রকমের নেতৃত্ব এবং মানুষের প্রতি মনোযোগী হয়, সেটা যেমন স্থানীয় পর্যায়ে, তেমনি দলীয় মধ্যম ও উচ্চপর্যায়ের ক্ষমতাধরদের বেলাতেও। স্থানীয় পর্যায়ে তারা ক্ষমতার তারতম্য টিকিয়ে রাখতে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে নিজেদের প্রকাশ করে, যা মূলত পরবর্তীকালে পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক ব্যবহারে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে, কোন ধরনের সাহায্যের জন্য কার কাছে যেতে হবে। দলীয় রাজনীতির উচ্চপর্যায়ে তারা দলীয়

স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠনের আপেক্ষিক গুরুত্ব তুলে ধরে এবং যখন সুবিধা বণ্টন করা হবে, তখন কাকে কী সুবিধা দেওয়া যায়, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

কখনো কখনো হরতাল-সম্পর্কিত কার্যক্রমে উপস্থিতিই যথেষ্ট। এই প্রবন্ধের মাঠপর্যায়ের গবেষণার সময় ইসলামি দলগুলো হরতাল ডেকেছিল। হরতালকালীন ওয়ার্ড পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় আমরা স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন রকমের ক্ষমতার সম্পর্ক এবং অবকাঠামো বুঝতে সক্ষম হই।

মূল যে রাস্তাটি বস্তির দিকে গেছে, সেখানে আওয়ামী লীগের মধ্য সারির নেতারা বেশির ভাগ যুবলীগের লোকজন নিয়ে একটি চায়ের দোকানে অবস্থান নেন। আগেই বলা হয়েছে যে এই বস্তিটি হরতালে লোক সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এখানে বসে নেতারা রাস্তাটি পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং প্রত্যেককেই যেতে দিচ্ছিলেন, শুধু যাদেরকে হরতালে যোগদানকারী হিসেবে সন্দেহ হচ্ছিল তাদেরকে ছাড়া। যখন দল ক্ষমতায় থাকে তখন হরতালবিরোধী কাজকে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ভাবেন। তবু এই নিয়ন্ত্রণ-পর্যবেক্ষণ কাজে ওয়ার্ড কমিশনারের উপস্থিতি ছিল অনেক বেশি আশ্চর্যজনক। এই কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এবং আক্ষরিক অর্থে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। কিন্তু এখন আওয়ামী কমিটিতে তাঁর উপস্থিতি এবং তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে। আমরা ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগের একটি অংশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার যোগসূত্র পেয়েছি, তথাপি এখানে যুবলীগের কর্মীদের সঙ্গে একত্রে হরতালবিরোধী কাজে তাঁর অংশগ্রহণ ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের দিকটি স্পষ্টত প্রকাশ পায়।

মিছিল এবং র‍্যালির জন্য লোক জোগাড় করার সাংগঠনিক সামর্থ্য অবশ্যই একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের আপেক্ষিক ক্ষমতাকেই প্রকাশ করে। কারও দু শ বা দুই হাজার সমর্থককে দলীয় কর্মসূচিতে নিয়ে আসতে পারা মানে হলো, দলের আপেক্ষিক রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য কাজ করা। হরতাল চলাকালীন এই সমর্থকদেরকেই নির্বাচনে সম্ভাব্য ভোটার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই বিবেচনায় যুবলীগের একজন নেতা বিএনপি শাসনের (২০০১-২০০৬) সময়ে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে তার গুরুত্ব বাড়াতে সক্ষম হয়েছিল। সে সময়ে একজন সাধারণ ছাত্রলীগ নেতা হয়েও সে বেশ কয়েকটি পর পর হরতালে বহুসংখ্যক তরুণকে সংগঠিত করতে পেরেছিল। সচ্ছল পরিবারের হওয়ায় সে ব্যক্তিগতভাবে হরতালে অংশগ্রহণকারী জোগাড়ে টাকা খরচ করতে পেরেছিল, যদিও তার পরিবার তার রাজনৈতিক কার্যক্রমকে সমর্থন করে না। ওয়ার্ডে একজন আওয়ামী লীগ ক্ষমতাধরের দলে থেকে সে ওই পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্কের একজন মূল ব্যক্তি হয়ে যায়। এখন সে বিবাহিত যুবলীগ নেতা হয়ে নিজেই তাঁর

পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্ক তৈরি করেছেন এবং আওয়ামী লীগের জন্য একজন মূল সংগঠক হয়ে উঠেছেন। তিনি ওই ওয়ার্ডে টেলিভিশন সংযোগ বিতরণে একটি কন্ট্রাক্ট পেয়ে যান এবং শহরের অন্যান্য জায়গায়ও তা বিতরণ করেন। তাঁর শক্ত রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকাতেই তিনি এই কন্ট্রাক্টটি পেয়ে যান।

হরতাল সংগঠন মূলত একই শ্রেণীক্রম অনুসরণ করে, যেখানে ওপরের সারির নেতারা মধ্যম সারির নেতাদেরকে হরতালের জন্য লোক জোগাড় করতে বলেন এবং তাঁরা তাঁদের নিচের সারির নেতাদের একই কাজ করতে বলেন। এক অর্থে, এক ব্যক্তি বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য সংগৃহীত হয়। যেমন যে প্রথম একজনকে সরাসরি জোগাড় করে, তাকে স্থানীয় নেতা বা জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের জন্যও কাজে লাগানো যায়। এভাবে একজন সংসদ সদস্য বা মন্ত্রীর জন্যও লোক সংগ্রহ হয়ে থাকে।

একই সঙ্গে, কেউ কেউ অনেক সময়ে একজন স্থানীয় নেতাকে এড়িয়ে তাঁর উচ্চপদস্থ নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের লোক জোগাড় করার সামর্থ্য দেখান। এইভাবে বস্তিতে থাকা ছোট নেতারা শ্রেণীবিন্যাসে থাকা ওপরের সারির নেতাদের পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে যেতে পারে। কারণ, তাঁরা রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য লোকসমাগমের মূল উৎস :

> ওয়ার্ড কমিটির সঙ্গে মন্ত্রীর ভালো যোগাযোগ আছে, কিন্তু বস্তিগুলো হলো আলাদা বিষয়। স্বাভাবিকভাবে মন্ত্রী ওয়ার্ড কমিটিকেই হরতালে লোক জোগাড় করতে বলে, কিন্তু বস্তির ক্ষেত্রে মন্ত্রী বস্তির নেতাদেরকেও জোগাড় করতে বলেন। যদি ওয়ার্ডের নেতা আমাকে বস্তির কিছু লোক নিয়ে আসতে বলে, আমি অবশ্যই করব। কিন্তু যখন মন্ত্রী সরাসরি আমাকে কাজটা করতে বলেন, আমি দ্বিগুণ উৎসাহিত হই। ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কটি অন্য রকম। এটা খুব স্বাভাবিক নয়, যেখানে মন্ত্রী ওয়ার্ডে লোক সংগ্রহের কথা বলবেন। মাঝেমধ্যে মন্ত্রী ওয়ার্ড কমিটিকে হুমকিও দেন—তোমরা কিছুই করো না; বস্তির লোকেরা অনেক কাজ করে। তোমাদেরকে আমার দরকার নেই, কারণ বস্তির লোকেরা অনেক কাজের।[১৫]

ছাত্রলীগ থেকে যুবলীগ এবং ক্রমান্বয়ে আওয়ামী লীগ হয়ে ওঠা স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোয় একটি নিত্যকার প্রক্রিয়া। কিন্তু হরতাল হলো একটি বিশেষ আই-ওপেনিং মুহূর্ত। কারণ, এই সময় স্থানীয় বা শহর বা জাতীয় পর্যায়ে নিচু সারির নেতা বা কর্মীরা ওপরের সারির নেতাদের আনুগত্য, নিজের সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়ায় বেশির ভাগ দলীয় কর্মীই ঝুঁকিপূর্ণ ছাত্রলীগের কার্যকলাপ থেকে শুরু করে অধিক সংগঠিত যুবলীগের দায়িত্ব পালন করতে পারে, আবার অল্পসংখ্যক কর্মী স্থানীয় উচ্চপর্যায়ের আওয়ামী লীগ কমান্ডে পৌঁছতে পারে। লোকজনকে উচ্চপর্যায়ের আওয়ামী লীগ নেতাদের

সম্পর্কে বলে যে এসব নেতা অতীতে সহিংস ছিল, কিন্তু এখন তাদের অবস্থান পাকাপোক্ত। স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোর সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই পাকাপোক্ত অবস্থান অনেকটা স্বাভাবিক আচরণ। কিন্তু দলীয় রাজনীতির ছাত্র বা তরুণ শাখাগুলোতে নেতৃত্বের জন্য সহিংসতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সবশেষে, হরতাল কর্মক্ষমতা শুধু দলের বিভিন্ন স্তরের ক্ষমতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রেই কার্যকর নয়। এটা স্থানীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-সমর্থকদের মধ্যেও ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করে। এটা পরিষ্কার যে ক্ষমতাসীন দলকে মোকাবিলার সামর্থ্য নির্ভর করে বিরোধী পক্ষ স্থানীয় পর্যায়ের নির্দিষ্ট লোকালয়ে কতটা সংগঠিত করার সামর্থ্য রাখে। এই স্থানীয় সামর্থ্য প্রায়শই স্থানীয় পর্যায়ে আন্তদলীয় ক্ষমতার ভারসাম্যের ফলাফল। বস্তির প্রবেশমুখে আওয়ামী লীগের পিকেটিংয়ের স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল যেকোনো হরতাল-সমর্থককে সমাবেশে যেতে বাধা দেওয়া।

আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সংগঠকদের সফলতা হলো যে তারা মহড়া ও ভীতির মাধ্যমে বিএনপি-সমর্থকদের পূর্ববর্তী হরতালগুলোতে যেতে বাধা দিতে পেরেছিল। অন্যদিকে বিএনপির সংগঠকেরা তাদের সমর্থকদের কার্যকরভাবে সংগঠিত না করতে পারায় তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে যায়। তবে নির্বাচন ঘনিয়ে এলে ক্ষমতার এই ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটবে। কারণ, তখন বিএনপির সমর্থকেরা তাদের দল ক্ষমতায় আসার প্রত্যাশায় এবং স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোয় নেতা-কর্মীদের অবস্থান দৃঢ় করতে আরও বেশি ঝুঁকি নেবে।

৬. শেষ কথা : হরতালের স্থায়িত্ব

বাংলাদেশের স্থানীয় ক্ষমতার কাঠামো নির্মাণে হরতাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হরতাল একটি জটিল রাজনৈতিক কর্মক্ষমতা, যেখানে গোষ্ঠী এবং বিশেষ কর্মক্ষমতার পারস্পরিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। হরতাল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হলো বহু পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করা। হরতাল শুধু বর্তমান ক্ষমতাকাঠামো কেমন, সেটাই প্রকাশ করে না। এ ছাড়া আরও দুটি পর্যায়ে কাজ করে। এক, হরতালের মাধ্যমে স্থানীয় কর্মীরা নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। দুই, হরতাল আঞ্চলিক ও জাতীয় নেতাদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের যথাযথ প্রতিনিধি নির্বাচনে একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে সাংগঠনিক সামর্থ্য ও ঝুঁকি নেওয়া দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে।

এভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, কেন হরতাল সব রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়, যেখানে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং আন্তর্জাতিক মহল হরতালের সহিংস ও ধ্বংসাত্মক ভূমিকাকে নিন্দার চোখে দেখে। হরতাল কার্যক্ষমতা শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে, কিংবা

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক জনগণের বিরুদ্ধেই নয়, হরতাল অনেকগুলো বিশেষ কর্মক্ষমতাকে একটি ব্যাখ্যায় দাঁড় করায়। এগুলো বহুপর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে করা হয়, যা বহুলাংশেই দলীয় স্থানীয় ও জাতীয় উভয় পর্যায়ের ক্ষমতাকাঠামোকে লক্ষ্য করে করা হয়। যদি আমরা এ ধরনের বিশেষ কর্মক্ষমতাকে আলাদা করি, তাহলে বোঝা যাবে, সাধারণ অর্থে যেসব হরতাল ব্যর্থ, যেগুলো নীতি-নির্ধারণে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না, সেগুলোও এসব বিশেষ কর্মক্ষমতায় নিয়োজিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য সফল হতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ কর্মক্ষমতা বৃহত্তর নীতি-নির্ধারণে প্রভাব ফেলতে চায় না। এখানে লক্ষ্য হলো অভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠীর (দলের ভেতরে) মনোযোগ আকর্ষণ করা, যার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান দেখানো, বজায় রাখা এবং সুদৃঢ় করা যায়।

এ ক্ষেত্রে হরতালের বিকল্প প্রস্তাবে ঝুঁকির বিষয়টি থাকছে না (আলোচনার জন্য দেখুন, ইউএনডিপি ২০০৫)। ঝুঁকি নেওয়া—সরাসরি সহিংস কাজে অংশ নেওয়া বা কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে হরতালের লোক সমাগম করা—দলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক প্রস্তাবিত অহিংস প্রতিবাদে এই প্রয়োজনীয় ঝুঁকির উপাদান থাকে না। এখানে আমরা দেখিয়েছি স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোতে নিজেদের স্থানকে দৃঢ় করতে ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছা, সাহসী হওয়া এবং ঝুঁকিপূর্ণ হরতাল মোকাবিলা করা স্থানীয় কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঝুঁকি নেওয়ার সামর্থ্য ও ইচ্ছা দলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন হিসেবে দেখা হয় এবং দলীয় পৃষ্ঠপোষকতার অংশ হিসেবে যোগ্য করে তোলে। স্থানীয় কর্মীদের কাছে এটা স্থানীয় নেতার ক্ষমতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন হিসেবে দেখা হয়। মানববন্ধন বা নীরব মিছিল হরতালের মতো একই রকম পারফরম্যান্সের শক্তি রাখে না।

১৯৯১-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি মূলত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি—এই দুই দল এবং দুটি বৈশিষ্ট্য দ্বারাই শাসিত হয়েছে। প্রথমত, আওয়ামী লীগ বা বিএনপি, যে-ই ক্ষমতায় থাকুক, নির্বাচনে বিজয়ীই সব নিয়ে নেবে—এটাই অলিখিত নিয়ম। শুধু ক্ষমতার বেলায়ই নয়, প্রশাসন, পুলিশ এবং ব্যবসার একটি বড় অংশেরও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। দ্বিতীয়ত, জাতীয় ক্ষমতা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে চক্রাকারে চলতে থাকে। এ ক্ষেত্রে বিরোধী দলই বিজয়ী হয় এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়। মাঠপর্যায়ের অনেক কর্মীই এই শেষ উপাদানটি প্রত্যাশা করে। মূলত এই প্রত্যাশা থেকেই হরতালে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। বিজয়ী-সব-পাবে ব্যবস্থায় হরতালে অংশগ্রহণ করা ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু একজন ঝুঁকি নেয়, কারণ তাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। তথাপি ক্ষমতাবদলের প্রত্যাশায় হরতাল আনুগত্য প্রদর্শনের কার্যকর উপাদান হিসেবে কাজ করে, যার সংখ্যা

নির্বাচন ঘনিয়ে এলে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিরোধী দলের সংগঠক হিসেবে সাময়িকভাবে চিহ্নিত হওয়ার ঝুঁকি নেওয়াটা পুরস্কার হিসেবে ধরা হবে, যখন এই বিরোধী দল ক্ষমতায় আসবে। আগেই বলা হয়েছে, এই গবেষণায় মূলত ২০১১ সাল এবং তার পূর্ববর্তী সময়ের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে, তবে ভবিষ্যৎ প্রবণতা হিসেবে আমরা বলতে পারি, ২০১২ ও ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত হরতালগুলোর পারফরম্যান্স এই গবেষণায় মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে খুবই সংগতিপূর্ণ। হরতাল বা রাজনৈতিক সহিংসতার প্রক্রিয়াগত দিকগুলোর ওপর যথাযথ গবেষণা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. আমরা হরতাল এবং রাজনৈতিক সক্ষমতা ধারনার ইতিহাস ও বিভিন্ন ভাগের সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ দেব না। দেখুন Negara (Geertz 1980); Turner (1969, 1988); Lukes (1975); and Tilly (1977, 1993, 2008). সূচনামূলক পর্যবেক্ষণের জন্য দেখুন, যেমন Burke (2005)and Strauss and Cruise O'Brien (2007)।

২. এটা অন্যান্য ছোট দলগুলোর জন্যও প্রযোজ্য, যদিও আরো ছোট পরিসরে কম তীব্রতা সম্পন্ন হয়।

৩. আমরা ক্ষমতাসীন দল এবং এর সমর্থকদের আরো কার্যকলাপ আলোচনা করব।

৪. দেখুন, ইউএনডিপি বাংলাদেশ (২০০৫)।

৫. গান্ধী পূর্ববর্তী হরতাল সম্পর্কে জানতে দেখুন, হেইটলার (১৯৭২) এবং ইর্শচিক (১৯৮৬)।

৬. যদিও এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে দাঁড় করানোর সঠিক জায়গা এটি নয়, তবুও বলা যায়, হরতাল এবং এই ধরনের অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় সামষ্ঠিক কর্মকান্ড, যেমন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খুবই জটিল প্রকৃতির। যখন স্থানীয় দাঙ্গা সংগঠন (Berenschot 2009, 2011) সম্পর্কে পড়ছিলাম, এই দুটি কার্যের মধ্যে স্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। দুটিই সমঝোতার নিত্য সম্পর্কে প্রোথিত এবং নির্বাচনের সময় আসলে আরো সংকটপূর্ণ হয়ে যায় (আরো দেখুন Brass 2003) । অবশ্যই দুটির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আরো বেশি ধ্বংসাত্মক ধরণকে বিবেচনায় নিলে, দলীয় এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদের মধ্যে এবং এই দুটি প্রপঞ্চের মধ্যে হরতাল এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গতিপথ এবং পরিস্কার পার্থক্য পাওয়া যায়। তাছাড়া হরতালের চেয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপরে অধিক পরিমাণে গবেষণা হয়েছে (ইতিমধ্যে উল্লেখ্যগুলো ছাড়াও যেমন, Das 1990, 2007; Hansen 2001; Kakar 1996; and Sen 2007)।

৭. বাংলাদেশে ১৯৯০ সাল থেকে সংসদীয় নির্বাচন করার লক্ষ্যে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। ধরে নেওয়া হয় যে এই সরকার হবে নির্দলীয় এবং দায়িত্ব হবে সীমিত সময়ের জন্য। কিন্তু এই সরকারের উপদেষ্টাদের বাছাই প্রক্রিয়ায় প্রচণ্ড রাজনৈতিক সংঘাত এবং অচলাবস্থার সৃষ্ঠি হয়, যেখানে বিরোধী দল হরতালকে একটি প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে।

৮. বস্তির তরুণদের সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ২২ মার্চ ২০১১, চট্টগ্রাম।

৯. চট্টগ্রাম বিএনপি-এর ওয়ার্ড পর্যায়ের নারী নেত্রী সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১১ মার্চ ২০১১, চট্টগ্রাম।

১০. একজন আওয়ামী লীগ নেতা এবং ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২৫ মার্চ ২০১১, চট্টগ্রাম।

১১. বস্তিবাসীর সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ১৭ মার্চ ২০১১, চট্টগ্রাম।

১২. বস্তির তরুণদের সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ২২ মার্চ ২০১১, চট্টগ্রাম।

১৩. প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে টাকার জন্যই মানুষ হরতালে অংশগ্রহণ করে। যদিও টাকা প্রত্যেকদিনই দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় এবং অবশ্যই একটা প্রণোদনা, তথাপি আমরা অন্য জায়গায় দেখাবো যে শুধু টাকাই এই ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ঠ নয়।

১৪. যুবলীগ নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২৪ মার্চ ২০১১, চট্টগ্রাম।

১৫. জ্যেষ্ঠ আওয়ামী লীগ ওয়ার্ড সংগঠকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২৫ মার্চ ২০১১, চট্টগ্রাম।

গ্রন্থপঞ্জি

Abeles, Marc. 'Modern Political Ritual: Ethnography of an Inauguration and a Pilgrimage by President Mitterrand.' *Current Anthropology* 29 (3): 391-404, 1988.

Ahmed, Iraz and Golam Mortoza. 'The Anatomy of Hartals: How to Stage Hartal.' In *Beyond Hartals: Towards Democratic Dialogue in Bangladesh*, UNDP, 25-30. Dhaka: UNDP Bangladesh, 2005.

Berenschot, Ward. 'Rioting as Maintaining Relations: Hindu-Muslim Violence and Political Mediation in Gujrat, India.' *Civil Wars* 11 (4): 414-33, 2009.

Berenschot, Ward. *Riot Politics: Hindu-Muslim Violence and Indian State.* London: Hurst & Company, 2011.

Brass, Paul R. *The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India.* Seattle and London: University of Washington Press, 2003.

Burke, Peter. 'Performing History: The Importance of Occasions.' *Rethinking History* 9 (1): 35-52, 2005.

Das, Veena, ed. *Mirrors of Violence: Communities, Riots and Survivors in South Asia.* Delhi: Oxford University Press, 1990.

Das, Veena, ed. *Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary*. Berkeley: University of California Press, 2007.

Esherick, Joseph W. 'Afterword: The Hiesenberg Principle of Political Performance.' In *Staging Politics: Power and Performance in Asia and Africa*, edited by J.C. Strauss and D.B. Cruise O'Brien, 243-50. London: I.B. Tauris, 2007.

Foucher, Vincent. '"Blue Marches": Public Performances and Political Turnover in Senegal.' In *Staging Politics: Power and Performance in Asia and Africa*, edited by J.C. Strauss and D.B. Cruise O'Brien 111-32. London: I.B. Tauris, 2007.

Geertz, Clifford. *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*. Princeton: Princeton University Press, 1980.

Hansen, Thomas Blom. *Wages of Violence: Naming and Identity in Postcolonial Bombay*. Princeton: Princeton University Press, 2001.
Hansen, Thomas Blom. 'Politics as Permanent Performance: The Production of Political Authority in the Locality.' In *The Politics of Cultural Mobilization in India*, edited by J. Zavos, A. Wyatt and V. Hewitt, 19-36. New Delhi: Oxford University Press, 2004.

Hasan, M, ed. *The State of Governance in Bangladesh 2006: Knowledge, Perceptions, Reality*. Dhaka: Centre for Governance Studies, 2006.

Heitler, Richard. 'The Varanasi House Tax Hartal of 1810-11.' *Indian Economic and Social History Review* 9 (3): 239-57, 1972.

Hossain, Akhtar. 'Anatomy of Hartal Politics in Bangladesh.' *Asian Survey* 40 (3): 508-29, 2000.

Irschick, Eugene F. 'Gandhian Non-Violent Protest: Rituals of Avoidance or Rituals of Confrontation?' *Economic and Political Weekly* 21 (29): 1276-85, 1986.

Jaoul, Nicolas. 'Dalit Processions: Street Politics and Democratization in India.' In *Staging Politics: Power and Performance in Asia and Africa*, edited by J.C. Strauss and D.B. Cruise O'Brien, 173-94. London: I.B. Tauris, 2007.

Kakar, Sudhir. *The Colors of Violence: Cultural Identities, Religion, and Conflict*. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

Kaviraj, Sudipta. 'The Politics of Performance: Gandhi's Trial Read as Theatre.' In *Staging Politics: Power and Performance in Asia and Africa*, edited by J.C. Strauss and D.B. Cruise O'Brien, 71-90. London: I.B. Tauris, 2007.

Kochanek, Stanley A. 'Governance, Patronage Politics, and Democratic Transition in Bangladesh.' *Asian Survey* 40 (3): 530-50, 2000.

Kong, Lily. 'The Construction of National Identity Through the Production of Ritual and Spectacle: An Analysis of National Day Parades in Singapore.' *Political Geography* 16 (3): 213-39, 1997.

Lukes, Steven. 'Political Ritual and Social Integration.' *Sociology* 9 (2): 289-308, 1975.

McLeod, James R. 'The Sociodrama of Presidential Politics: Rhetoric, Ritual, and Power in the Era of Teledemocracy.' *American Anthropologist* 101 (2): 359-73, 1999.

Moniruzzaman, Md. 'Party Politics and Political Violence in Bangladesh: Issues, Manifestation and Consequences.' *South Asian Survey* 16 (1): 81-99, 2009.

Rahman, Muhammad Mustafizur. 'Origins and Pitfalls of Confrontational Politics in Bangladesh.' *South Asian Survey* 14 (1): 101-15, 2007.

Rashiduzzaman, M. 'Political Unrest and Democracy in Bangladesh.' *Asian Survey* 37 (3):n 254-68, 1997.

Sen, Atreyee. *Shiv Sena Women: Violence and Communalism in Bombay Slum*. London: Hurst & Company, 2007.

Tilly, Charles. 'Getting it Together in Burgundy, 1675-1975.' *Theory and Society* 4 (4): 479-504, 1977.

Tilly, Charles. 'Contentious Repertoires in Great Britain, 1758-1834.' *Social Science History* 17 (2): 253-80, 1993.

Tilly, Charles. *Contentious Performances*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Tripp, Charles. '"In the Name of People": The "People's Court" and the Iraqi Revolution.' In *Staging Politics: Power and Performance in Asia and Africa*, edited by J.C. Strauss and D.B. Cruise O'Brien, 31-48. London: I.B. Tauris, 2007.

Turner, Victor W. *The Ritual Process: Structure and Anti-structure*. London: Routledge and Kegan Paul, 1969.

Turner, Victor W. *The Anthropology of Performance*. New York: PAJ Publications, 1988.

Schendel, Willem Van. *A History of Bangladesh*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Strauss, Julia C. and Donal B. Cruise O'Brien. 'Introduction.' In *Staging Politics: Power and Performance in Asia and Africa*, edited by J.C. Strauss and D.B. Cruise O'Brien, 1-14. London: I.B. Tauris, 2007.

UNDP. *Beyond Hartals: Towards Democratic Dialogue in Bangladesh*. Dhaka: UNDP Bangladesh, 2005.

Verkaaik, Oskar. *Migrants and Militants: Fun and Urban Violence in Pakistan*. Princeton: Princeton University Press, 2004.

অনুবাদ : **খলিলউল্লাহ্**

সাংস্কৃতিক পাঠ

তারেক মাসুদের চলচ্চিত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপস্থাপনা

সাজেদুল আউয়াল

সারসংক্ষেপ

অকালপ্রয়াত চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদের চলচ্চিত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপস্থাপনার ধরনটি অন্বেষণ করাই এই রচনার মূল অভিপ্রায়। তাঁর মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজ-সংস্কৃতিভিত্তিক প্রামাণ্য-স্বল্প-পূর্ণদৈর্ঘ্য কয়েকটি চলচ্চিত্র বীক্ষণ করে দেখা গেছে যে তিনি অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী তত্ত্বের স্বরূপ ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বাস্তবতায় বিগত চার দশকে এর প্রয়োগ কীভাবে ঘটেছে, তা বোঝার চেষ্টা করেছেন। তত্ত্ব, মানুষ, ধর্ম, লোকসংস্কৃতি, রাষ্ট্র, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়কে তাঁর চলচ্চিত্রে স্থান করে দিয়ে এদের কার্যকারিতা-প্রাসঙ্গিকতাকে পরীক্ষা করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে এগুলো পরস্পর প্রায়ই একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এগুলোর মধ্যে একধরনের সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। সে জন্য চরম বা পরম মনোভাব তাঁর মানসে অনুপস্থিত, আছে মরমি মনোভাব; যা কিছুটা আমাদের লোকসংস্কৃতির ভেতরকার অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক এবং কিছুটা পারস্যের সুফিবাদী দর্শনের মানব-সম্পর্কিত ধারণার আলোকে গঠিত। বীক্ষণকর্ম থেকে দেখা গেছে যে রাষ্ট্রীয় বাস্তবতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদ, আদিবাসী জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি প্রপঞ্চ অবস্থান করছে। তারেক মাসুদ এ রকম একটি সমাজবাস্তবতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুনর্ব্যাখ্যার প্রস্তাব করেছেন।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : তারেক মাসুদের চলচ্চিত্র, লোকচলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রবীক্ষণ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, আদিবাসী জাতীয়তাবাদ, ধর্ম-ভাষা-ভূখণ্ড নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় ইসলাম, রাজনৈতিক ইসলাম, লোকসংস্কৃতি, বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণার রূপান্তর-পুনর্ব্যাখ্যা (মিউটেশন)।

প্রারম্ভিক কথা

তারেক মাসুদ[১] স্বপ্রশিক্ষিত একজন চলচ্চিত্রকার ছিলেন। তিনি শুধু বাংলাদেশের শিল্প-চলচ্চিত্র সৃষ্টির ধারাকেই এগিয়ে দেননি, একে বিশ্বমুখীনও করেছিলেন। তাঁর বেশির ভাগ চলচ্চিত্র কেবল কাহিনি-কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এগুলোর মধ্যে সমকালীন সমাজব্যবস্থার নানা প্রসঙ্গ যেমন মানবজীবন, লোকসংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি, রাষ্ট্র, জগৎ প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর ভাবনাও স্থান করে নিত। এই সূত্রেই তাঁর বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' প্রসঙ্গটিও গুরুত্ব পেয়েছে।

চলচ্চিত্র প্রকৃত প্রস্তাবে একটি নির্মাণ (কনস্ট্রাকশন)। চলচ্চিত্রবীক্ষণ হচ্ছে নির্মিত চলচ্চিত্রকে বিনির্মাণ (ডিকনস্ট্রাকশন) করার উদ্যোগ। এ রকম একটা তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে তারেক মাসুদ নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজ-সংস্কৃতিভিত্তিক চলচ্চিত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপস্থাপনা অনুধাবন করাই বক্ষ্যমাণ রচনার মূল লক্ষ্য। তারেক মাসুদের বাঙালি জাতীয়তাবাদ-সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশ পেয়েছে প্রধানত তাঁর ও ক্যাথরিন মাসুদ নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ও পূর্ণদৈর্ঘ্য-স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্রগুলোতে। এগুলের মধ্যে *মুক্তির গান* (১৯৯৫), *মুক্তির কথা* (১৯৯৮), *মাটির ময়না* (২০০২), *অন্তর্যাত্রা* (২০০৬), *নরসুন্দর* (২০০৮) ও *রানওয়ে* (২০১০) অন্যতম।

চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের কর্মের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র *আদম সুরত* (১৯৮২-১৯৮৯) দিয়ে তারেক মাসুদের চলচ্চিত্রযাত্রা শুরু হয়। শুধু তারেক মাসুদ নয়, ওই সময়ের অনেককেই সুলতান তাঁর ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্ব ও অভিনব ধারায় আঁকা চিত্রকলা দিয়ে আকৃষ্ট করেছিলেন। মনীষী আহমদ ছফা ওই সময় সুলতানের চিত্রকর্ম নিয়ে লিখলেন *অভিনব উদ্ভাসন* নামে একটি চটি গ্রন্থ। তারেক মাসুদ গ্রন্থটি পড়ে থাকবেন। তাঁর ওপর সুলতান ও ছফার চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছে। *আদম সুরত* নির্মাণের পর ১৯৯০ সালে তারেক মাসুদ যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন।

মুক্তির গান

যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার পর মার্কিন নাগরিক লিয়ার লেভিনের[২] সঙ্গে ঘটনাচক্রে তারেক মাসুদের দেখা হয়। লেভিন মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৬ মিমি ক্যামেরায় প্রায় ২০ ঘণ্টার মতো ফুটেজ ধারণ করেছিলেন, যার অধিকাংশই অব্যবহৃত থেকে যায়। তাঁর কাছ থেকে তারেক যেসব অব্যবহৃত ফুটেজ পান, সেই ফুটেজ ও অন্যান্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করা ফুটেজ দিয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর পরিশ্রম করে *মুক্তির গান* নির্মাণ করেন। ক্যাথরিন মাসুদ ছিলেন সহনির্মাতা। সেই ফুটেজ যদি তিনি না পেতেন, তাহলে আমরা আজকে যে তারেক মাসুদকে পাই, তাঁকে হয়তো পেতাম না। আমাদের

সৌভাগ্য যে তিনি ফিরে এসেছিলেন এবং তাঁর কর্মসূত্রে এ দেশের চলচ্চিত্রও নতুন এক মাত্রা পায়। সেই ফুটেজগুলো পাওয়ার পর তারেক মাসুদ যখন *মুক্তির গান* নির্মাণ করতে যান, তখন তিনি নিজেও এখানে কিছু সংযোজন করেছেন। কিছু দৃশ্য তিনি চিত্রায়ণও করেছেন। মিশুক মুনীর ছিলেন ক্যামেরা-সঞ্চালক। তাতে করে যে প্রশ্নটা এখানে সামনে চলে আসে যে *মুক্তির গান*-এ যে দৃষ্টিভঙ্গি আছে, এটা কার দৃষ্টিভঙ্গি? ধারণা করি, প্রথমত এখানে লিয়ার লেভিনের একটা দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে, তারপর তারেক মাসুদ সেই ফুটেজের ভেতরে ঢুকে নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি দিতে চেষ্টা করেছেন। আর আছে সংস্কৃতিকর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি, যাঁরা ওই সময় গান দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপ্ত করা বা মুক্তিযুদ্ধকে একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মুক্তির সংগ্রামে তাঁদের কী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, সেটা এখানে এসেছে। লিয়ার লেভিনের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় তারেকের রচনায়। তারেক লিখেছেন :

> সিবিএস, এনবিসির মতো চ্যানেলগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যাপকভাবে বাংলাদেশকে কাভার করছিল। এগুলো ছিল নিউজ রিল।...লিয়ার লেভিন এসব প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পেশায় তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞাপন নির্মাতা। ব্যক্তি উদ্যোগে পুরোপুরি পেশাদার চলচ্চিত্র ইউনিট নিয়ে তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়েছেন। অক্টোবর মাসে তিনি কলকাতায় আসেন এবং মাত্র ছয় সপ্তাহ সেখানে থেকে শুটিং করতে পেরেছিলেন। সীমাহীন প্রতিকূলতায় বাধা ছিল তাঁর ওই সময়টুকু। একজন মার্কিন নাগরিক হওয়ায় তাঁকে চিহ্নিত করা হয় সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসেবে। ভারত ও বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার তাঁকে 'সিআইএর চর' মনে করে। শরণার্থী শিবিরের বাইরে তাই লিয়ারের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত ছিল। আবেগী, উদ্যোগী লিয়ার এত বিধিনিষেধ মানতে পারেননি। এ জন্য তাঁকে শাস্তিও পেতে হয়। শিবিরের বাইরে শুটিং করায় এক দিন ও এক রাত হাজতেও কাটাতে হয় তাঁকে। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ পুরোদমে শুরুর আগেই সরাসরি ভারত সরকারের নির্দেশে লিয়ারকে ভারত ছাড়তে হয়। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। দলে দলে মুক্তির ছেলেরা ঢাকায় প্রবেশ করে। কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে লিয়ারের এই বিজয়ী মিছিলে থাকার কথা ছিল অথচ থাকতে পারেননি। তাঁর স্বপ্নের ছবিটা শেষ হয় না।...সাংস্কৃতিক দলটির সঙ্গে লিয়ারের পরিচয় হয় আকস্মিকভাবে। লিয়ার এ দলের সঙ্গে থেকে ছবি তোলার কাজ করতে থাকেন। লিয়ার লেভিন ছবিটি তৈরি করতে যাচ্ছিলেন মার্কিন দর্শকদের জন্য। এর জন্য বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে সাংস্কৃতিক দলটি যে বাংলা গানগুলো পরিবেশন করেছিল, তা খুব জুতসই ছিল না। লিয়ারের জয় বাংলায় যুদ্ধের দৃশ্য নেই, রাজনীতি নেই, আছে শুধু সৃষ্টিশীল ইমেজ।...বাংলাদেশের জন্মলগ্নকে ধারণ করতে না পারা ছিল লিয়ারের জন্য বড় ব্যর্থতা।[৩]

উদ্ধৃতিদৃষ্টে বলা যায়, লিয়ার লেভিনের ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশের চলমান মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা, যার উদ্দিষ্ট দর্শক মার্কিন জনগণ কিন্তু তাঁর মতো করে তিনি দৃশ্য ধারণ করতে পারেননি। তার পরও *জয় বাংলা* শীর্ষক ৭২ মিনিট দৈর্ঘ্যের যে প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ করেন, তাতে 'যুদ্ধের দৃশ্য নেই, রাজনীতি নেই'। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, লেভিনের হাতে কোনো চিত্রনাট্য ছিল না, 'চিত্রনাট্য লেখার সাহস তিনি করে উঠতে পারেননি। অর্থের বিনিময়ে একজনকে চিত্রনাট্যের দায়িত্ব দেওয়া হয় কিন্তু রিচার্ড নামের এই চিত্রনাট্যকার একটি লাইনও লেখেননি'।[৪] সব মিলিয়ে বলা যায় যে লেভিনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একটা পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা, যার মধ্যে থাকবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি অঞ্চলের স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার কথা। কিন্তু তাঁর সেই 'স্বপ্নের ছবিটা' তিনি শেষ করতে পারেননি, শেষ করেছেন তারেক ও ক্যাথরিন। তাই বলা যায়, *মুক্তির গান*-এ তারেকের নিজস্ব যে দৃষ্টিভঙ্গিটা পাওয়া যায়, সেটা আসলে কিছুটা লেভিনের দৃষ্টিভঙ্গি, পাশাপাশি ওই সময়ের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যাঁরা গান করে বেড়িয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধকে উদ্দীপ্ত করেছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি মিলেমিশে তৈরি হয়েছে। ওই সময়ে সামগ্রিকভাবে আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, সেটা হচ্ছে দেশকে মুক্ত করা, এখানে যে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন-শোষণ চলছিল, তা থেকে বাঙালিদের মুক্ত করা। বস্তুত, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষের একটা পর্বে সংস্কৃতিকর্মীরা একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী একটা রাষ্ট্র কায়েম করা, একটা 'জাতিরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করা।

সাধারণ জনগণ বা মুক্তিযোদ্ধাদের যে যুদ্ধযজ্ঞ, সেটা *মুক্তির গান*-এ কিছু আছে, পুরো চলচ্চিত্রেই কিছু স্টক ফুটেজ আছে। হয়তো লিয়ার লেভিন সেগুলো চিত্রায়ণ করেননি, তারেক মাসুদ নিজে করেননি, কিন্তু অন্যদের ফুটেজ তিনি সারা বিশ্ব থেকে সংগ্রহ করেছেন। নানা জায়গা থেকে, নানা সূত্র থেকে ফুটেজ তিনি ক্রয় করেছেন, উদ্ধার করেছেন; তারপর সেগুলো ব্যবহার করে *মুক্তির গান* তৈরি করেছেন। এটা আসলে একটা রিকনস্ট্রাকশন। তাই তাঁর একটা স্বাধীনতা ছিল। তিনি নিজে এই প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ভেতরে ঢুকে গেছেন। তারপর তিনি তাঁর মতো করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ যাঁদের *মুক্তির গান*-এ পেয়েছি, বিশেষত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে, তাঁরা এই যুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন। তাঁদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই তাঁরা এই কাজ করেছেন। প্রত্যেক নির্মাতাই, তাঁর যে ধরনের চলচ্চিত্রই হোক, প্রামাণ্য বা পূর্ণদৈর্ঘ্য বা স্বল্পদৈর্ঘ্য, সেখানে তিনি কতগুলো এজেন্ডা নিয়ে কাজ করেন। একটা বিষয় থাকে, একটা বক্তব্য থাকে।

সেই বক্তব্যের একটা প্রবাহ তৈরি করেই তিনি চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। *মুক্তির গান* চলচ্চিত্রেও তারেক মাসুদ একটা বক্তব্যের প্রবাহ, যাকে ওয়েভ অব মিনিং বলতে পারি, সেটা তৈরি করেই কাজটি করেছেন। কাজটি তিনি করেছেন তাঁর একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই। তাঁর একটা সাংস্কৃতিক, দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির প্রকাশই এই চলচ্চিত্র।

এর নির্মাণভঙ্গিটাও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সংগীতবহুল আখ্যানধর্মী যে প্রামাণ্যচিত্রটা দেখা যায়, এটা কিছুটা যেন চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে কেচ্ছা বলার মতো। সম্ভবত এ কারণেই তিনি এটাকে প্রামাণ্যচিত্র না বলে 'প্রামাণ্যগল্প' বা 'কাহিনিচিত্র' বলতে চেয়েছিলেন। কেচ্ছা বলার যে ধরনটি আমাদের লোকসংস্কৃতির ভেতরে আছে, যেটা একটা আঙ্গিক, এই আঙ্গিকটা তিনি সচেতনভাবেই *মুক্তির গান*-এ ব্যবহার করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ছবিটি মিউজিক্যাল কাঠামোয় নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলাম। এর সঙ্গে রোড মুভি ধরনের অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাব—এভাবে ছবিটি বানাব। আর এটা এমনভাবে সম্পাদনা করব, যেন দেখে প্রামাণ্যচিত্র মনে না হয়। মনে হবে, এটা কাহিনীচিত্র।'[৫] এর যে বিষয়, তার একটা বড় জায়গাজুড়ে মুক্তিযুদ্ধ আছে। সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ তেমনভাবে নেই, এটাও সত্য। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ যে প্রাসঙ্গিক, প্রয়োজন, এটা তিনি এই *মুক্তির গান* প্রামাণ্যচিত্রে লোকগান, গণসংগীত দিয়ে বলতে চেয়েছেন। গণসংগীত, পুতুলনাচ ও লোকগান দিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের যে বিপক্ষ শক্তি, তাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই করতে হবে, এই প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছেন। তখনকার যে রাজনীতি-সচেতন সংস্কৃতিকর্মীরা ছিলেন, তাঁরা গান দিয়ে একদিকে যেমন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর মনোবল বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা জুগিয়েছেন। যেমন এখানে কয়েকটা গান আছে, 'এই না সোনার বাংলা' অথবা 'দেশে দেশে ভ্রমি তব দুঃখগান গাহিয়ে'—এই গানগুলো এসেছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করা এবং পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দেওয়ার জন্য।

মুক্তির গান-এ আমরা দেখেছি যে গান দিয়ে প্রতিপক্ষকে শনাক্ত করা, চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আমরা বাঙালি এবং আমাদের স্বাধীনভাবে বাংলাদেশে বসবাস করার একটা যৌক্তিক অধিকার আছে। মুক্তিযুদ্ধ তো শুরু হয়েছে ১৯৭১ সালে, কিন্তু যদি আমরা এর ইতিহাসটা দেখি, এর প্রেক্ষাপটটা আলোচনায় আনি, তাহলে দেখব যে ১৯৪৭ সালেই এখানে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হওয়ার ফলে আমরা ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত বিসদৃশ একটা রাষ্ট্র পেলাম : একদিকে পূর্ব পাকিস্তান, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান। যখন জন্মলাভ করে

তখনই, কিন্তু এটা যে ভাঙবে, তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রসঙ্গটা তখনই তুলেছিলেন, '৪৮ সালেই। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেটা একটা চেহারা পায়। সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলনের ব্যাপারটাই বায়ান্ন সালে প্রকট হয়ে গিয়েছিল এবং ১৯৬২ সালে শিক্ষা অধিকার আদায়ের আন্দোলন হয়েছে। প্রথমটা সাংস্কৃতিক অধিকার, দ্বিতীয়টি শিক্ষার অধিকার। তারপরই আমরা দেখি ছয় দফার আন্দোলন, সেটা অর্থনৈতিক স্বাধিকার আন্দোলনেরই একটা সংগ্রাম ছিল। সেই সূত্র ধরে ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলন হয়, ১৯৭০ সালে নির্বাচন হয় এবং আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তার পরও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারে না। ফলে যেটা হলো, ১৯৭১ সালে এখানে একটা রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হলো। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, এই নানামুখী স্বাধিকার আন্দোলনগুলো মিলেমিশে একপর্যায়ে এসে ১৯৭১ সালে একটা রাজনৈতিক চেহারা অর্জন করে এবং একটা রাজনৈতিক স্বাধিকার আন্দোলনের দিকে অঞ্চলটা এগিয়ে যায়। সেই সময়কার মুক্তিযোদ্ধা, সংস্কৃতিকর্মী বা জনগণের কী ভূমিকা ছিল—সবই এই *মুক্তির গান*-এ চলে এসেছে। এই প্রামাণ্য চলচ্চিত্রে শুধু যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত হয়েছে, তা নয়; এখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, এই ধারণারও একটা প্রকৃষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানিদের ধর্মভিত্তিক, অর্থনীতিভিত্তিক, প্রশাসনিক, সামরিক যে আধিপত্য—এই সবকিছুর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণাটি গড়ে উঠেছিল। এই ধারণা মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বাধিক গুরুত্ব পায় এবং *মুক্তির গান*-এ বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই ধারণাকে রাজনৈতিকভাবে সামনে নিয়ে আসা হয়। *মুক্তির গান*-এ তারেক মাসুদ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে প্রচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক ইসলামকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখিয়েছেন।

এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদকে কেন রাজনৈতিকভাবে সামনে আনতে হলো? বাঙালি জাতীয়তাবাদ আসলে এসেছে পশ্চিমা শাসকেরা যে ইসলাম ধর্মের নামে আমাদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছিল, তার বিপরীতে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র—এই চারটি মূল স্তম্ভ মুক্তির প্রেরণা জুগিয়েছে এবং রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক যে ভিত্তি, সেই ভিত্তিটা আমাদের এই চারটি মৌল ধারণা থেকেই আসলে বেড়ে উঠেছে। এই চারটি দিকের প্রথমটির উপস্থিতি *মুক্তির গান*-এ প্রবলভাবে দেখতে পাওয়া যায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা রাজনৈতিকভাবে সম্মুখবর্তী হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান পর্বের শেষ দিকে এসে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরপরই বাঙালি মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক পরিচয় অন্বেষণের প্রয়োজনেই সাংস্কৃতিক

জাতীয়তাবাদের আলোকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রপঞ্চটি গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে হয়। এ সূত্রে বলা যায়, *মুক্তির গান* প্রামাণ্যচিত্রেই যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপস্থাপন প্রথম ঘটেছে তা নয়, ষাটের দশকের পূর্ণদৈর্ঘ্য কয়েকটি চলচ্চিত্রেও এর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ফরহাদ মজহারের অনুধাবন উল্লেখ করার মতো। তিনি লিখেছেন :

> খান আতাউর রহমানের নবাব সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৭) সম্ভবত প্রথম ছবি, যেখানে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের চেতনার লক্ষণ প্রথম চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। এর তিন বছর পর ১৯৭০ সালে জহির রায়হানের জীবন থেকে নেয়া ছবিটি গণ-আন্দোলনের উত্তুঙ্গ মুহূর্ত সরাসরি ধারণ করে। ডকুমেন্ট্রি বা দলিলি ছবি আকারে নয়, ছবির গল্পের মধ্যেই। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের জাতীয় চেতনা ততদিনে একটা রূপ নিয়ে নিয়েছে। ছবির মধ্যে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি সংযোজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চেতনার চরিত্র নির্মাণে চলচ্চিত্র সরাসরি অংশগ্রহণ করে। সব মিলিয়ে ছবিটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রামের অংশ হয়ে যায়। এই ঘটনাগুলো ঘটেছে একাত্তরের আগে। পূর্ব পাকিস্তানে ছবি তৈরির সংকল্প, সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের মধ্যে জাতীয় চৈতন্য নির্মাণের কাজগুলো বিচিত্র ও অদৃশ্য পথে নানানভাবে সম্পাদিত হয়েছে।[৬]

১৯৭১ সালে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আওতায় যে মুক্তিযুদ্ধটা হয়েছিল, সেটা শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি শেষ পর্যন্ত, এটা জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। *মুক্তির গান*-এ তাত্ত্বিকভাবে বেশি কিছু করার ছিল না তারেকের পক্ষে। তার পরও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের অন্বেষণের এক মহান দলিল হয়ে ওঠে *মুক্তির গান*। এ প্রসঙ্গে খন্দকার সাখাওয়াত আলীর অভিমত :

> বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অহংকার যে মুক্তিযুদ্ধ, সেই মুক্তিযুদ্ধের অন্তঃসত্ত্বায় আর অন্তঃস্রোতের মাঝে লুকিয়ে থাকা আর হারিয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার খুঁজে পেতে ব্রতী হলেন ওঁরা (তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ—সম্পাদক)। সময়টা ইতিবাচক পুনরুদ্ধার আর পুনর্নির্মাণের কালপর্ব। *মুক্তির গান* দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি নতুনভাবে জেগে উঠল বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনে। *মুক্তির গান* স্মৃতির শামিয়ানার নিচে জড়ো করল বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া বাঙালি চৈতন্য। শুরু হলো *মুক্তির গান* নিয়ে দেশজুড়ে যাত্রা। *মুক্তির গান* প্রদর্শিত হলো গ্রাম-শহর-বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের নানা প্রান্তজুড়ে। মুক্তিযুদ্ধের আবেগময় আচ্ছন্নতা আর ইতিহাসের পুনঃপাঠের উত্তেজনায় দর্শক স্মৃতিকাতর আর আত্মানুসন্ধানী হয়ে ওঠে। *মুক্তির গান* প্রদর্শনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে ওঁরা নির্মাণ করেন *মুক্তির কথা*।[৭]

মুক্তির কথা

মুক্তির গান-এ ছিল সংস্কৃতিকর্মীদের নির্দিষ্ট একটা ভাবনা, যে ভাবনাগুলোকে তারেক ও ক্যাথরিন স্টক ফুটেজ ও গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন আর *মুক্তির কথায়* ওই প্রামাণ্যচিত্র দেখাতে গ্রামে-গঞ্জে যেখানেই তাঁরা গেছেন, সেখানকার নারী-পুরুষেরা যে ভাবনায় তখন তাড়িত ছিলেন, তাঁদের যে আশা ছিল, আশাভঙ্গ হয়েছিল—সেসব কথা চলে এসেছে। *মুক্তির কথায়* যাঁরা কথা বলেছেন, তাঁরা বৃহত্তর লোকসমাজের মানুষ। এখানে নারী-পুরুষ উভয়েই তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তাঁদের স্বপ্ন কী ছিল এবং সে স্বপ্ন যে কখনো কখনো ভেঙে গেছে, সে কথাও *মুক্তির কথায়* এসেছে। তারেক মাসুদও মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত হন। মুক্তিযুদ্ধ কোনো একরৈখিক ব্যাপার ছিল না, এটি বহুরৈখিক, বহুস্বরিক ও বহুস্তরিক একটা ব্যাপার ছিল। নারী-পুরুষেরা তাঁদের নিজ কণ্ঠে *মুক্তির কথায়* যে কথাগুলো বলেছেন, সেটা বহুস্বরিক (Polyphonic) এবং তা থেকে পাওয়া বহু জ্ঞান তারেক মাসুদকে ঋদ্ধ করেছে।

মুক্তির গান-এ শরণার্থী শিবির, মুক্তাঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের চলাফেরা, সংস্কৃতিকর্মীদের গান, এগুলো এসেছে। *মুক্তির গান* দেখানোর পর মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া, সেগুলো *মুক্তির কথায়* এসেছে। *মুক্তির গান*-এ যাঁরা শরণার্থী শিবির এবং মুক্তাঞ্চলে ছিলেন, তাঁদের কথা এসেছে। আর *মুক্তির কথায়* তখন দেশের ভেতরে যাঁরা অবরুদ্ধ ছিলেন, তাঁদের কথা বেশি এসেছে। তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আশাহত হওয়ার যেসব বিষয়, সেগুলো এসেছে। *মুক্তির কথায়* মানুষ অসহায় অবস্থা থেকে প্রতিরোধকারী যোদ্ধায় কীভাবে পরিণত হয়েছিল, সে কথা এসেছে। এটা মুক্তিযুদ্ধের দুটি প্রভিন্ন রূপ, যা দুই প্রান্তে ঘটেছিল। তারেক মাসুদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা *মুক্তির কথায়* সংযোজনের কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ, তিনি টোকাচ্ছিলেন মানুষের কথা, কারা কী বলছে না বলছে সেটা। তিনি যেভাবে কথাগুলো পেয়েছেন, সেভাবে সেগুলো এখানে গুছিয়েছেন দৃশ্যগুলোর মধ্যে বক্তব্যগত পরম্পরা রেখে। তখন তাঁর একটা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বরাবরই একজন চিত্রপরিচালকের থাকে, তাঁর নিজস্ব এজেন্ডা-বক্তব্য থাকে, সেগুলো গুছিয়ে-গাছিয়ে নিজের মতো করে তিনি উপস্থাপন করেন। সেটা তিনি এই *মুক্তির কথায়* করেছেন। আমরা বলতে পারি, *মুক্তির গান*, *মুক্তির কথা* তাঁর একটা রিসার্চ বা অন্বেষণ অথবা প্রস্তুতিপর্ব। পরবর্তীকালে তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাহিনিধর্মী চলচ্চিত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে উপস্থাপনা দেখি,

তার ধারণা ধীরে ধীরে তাঁর ভেতরে দানা বেঁধেছে, তাঁর কাজের সূত্রে। এই দুটি প্রামাণ্যচিত্রেই সেই অন্বেষণ বা প্রস্তুতিপর্বের অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পাই। এই দুটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করতে গিয়েই তারেক ও ক্যাথরিন মাসুদ বাঙালি জাতীয়তাবাদ-সংক্রান্ত ধারণার মুখোমুখি হন। তাঁরা অনুভব করেন যে এই ধারণা একরৈখিক এবং তা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেহারা প্রকাশ করে না। *মাটির ময়না* প্রসঙ্গে আলোচনাকালে দেখব যে এই অন্বেষণ পর্বের যে বিবেচনা বা জ্ঞানগুলো, সেই জ্ঞানগুলোরই একটা সমন্বিত-সম্প্রসারিত প্রকাশ আমরা তাঁর পূর্ণদৈর্ঘ্য ফিচার ফিল্ম *মাটির ময়না* ও *রানওয়ে*তে পাব। আর খানিকটা প্রচ্ছন্নভাবে অনুচ্চারিত স্বরে *অন্তর্যাত্রায়*। এই চলচ্চিত্রে তারেক মাসুদ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষকালের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনের খণ্ডচিত্র দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক গভীরতাকে ছুঁতে চেয়েছেন এলিট পরিবেশ-প্রতিবেশে। সব মিলিয়ে বলা যায়, তারেক বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণার বাইরে খুব একটা যাননি।

মাটির ময়না

প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তারেক নিজেকে দক্ষ নির্মাতা হিসেবে তৈরি করেছেন। উল্লিখিত দুটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র থেকে যে শিক্ষাটা তিনি পেয়েছেন, বিশেষ করে দার্শনিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে—সেসবের একটা বহিঃপ্রকাশ আমরা তাঁর পরবর্তীকালের কাজগুলোতে দেখি। *মাটির ময়নায়* অনেকগুলো প্লট আছে: তাঁর মাদ্রাসার জীবন আছে, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটা গল্প আছে, তাঁর মা-বাবার মনস্তাত্ত্বিক দিক ইত্যাদি আছে। *মাটির ময়না* যখন মুক্তি পায়, তখন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত *নতুন দিগন্ত*তে এর একটা সমালোচনা লিখি।[৮] সেখানে বলার চেষ্টা করেছি যে *মাটির ময়নায়* তাঁর নিজস্ব জীবন, তাঁর পারিবারিক জীবন, তাঁর মা-বাবার জীবন, তারপর মুক্তিযুদ্ধ—এসব প্রসঙ্গ একসঙ্গে টেনেছেন তিনি। আমার বিবেচনায়, তাঁর মাদ্রাসার জগৎটাই তিনি চলচ্চৈত্রিকভাবে অর্থাৎ ইন টার্মস অব ভিজুয়াল ইমেজ অ্যান্ড অডিও ইমেজ সবচেয়ে চমৎকারভাবে এনেছেন। কারণ, মানুষ তাঁর যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা চলচ্চিত্রাঙ্গিকে খুব ভালোভাবে আনতে পারে। আমি দেখেছি, তাঁর *মাটির ময়নায়* উপস্থাপিত তাঁর নিজের যে আত্মচরিত, তা ধীরে ধীরে একটি রাষ্ট্রের আত্মকথার সঙ্গে মিশে গেছে। বাঙালি জাতির আত্মানুসন্ধান বা জাতি গঠন-প্রক্রিয়ার একটি ক্রান্তিকালের ইতিহাস *মাটির ময়নায়* পুনর্গঠিত হয়েছে। তাঁর অন্বেষণ বা প্রস্তুতিপর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটা চেহারা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, যা তখনকার ডমিন্যান্ট ইডিওলজি ছিল। *মাটির ময়নায়* তিনি তাঁর নিজের কাহিনি

মথিত করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটা চেহারা তুলে ধরেছেন। বস্তুত, *মাটির ময়নায়* তিন জোড়া পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বমূলক ধারণা আছে: নারী-পুরুষ বা ঘর-বাহির, প্রতিষ্ঠান-প্রকৃতি এবং ভাষা-ধর্মকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব। প্রথম দ্বন্দ্বটিতে পুরুষতন্ত্র-পিতৃতন্ত্র জয়ী হয়। দ্বিতীয় দ্বন্দ্বটি তারেক মাসুদের মাদ্রাসাজীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। মাদ্রাসা একটা প্রতিষ্ঠান, এই প্রতিষ্ঠানের ভেতরে তিনি ছিলেন। এখানে থেকে তিনি প্রকৃতিকে বাইরে এসে দেখতে পেতেন না। জানালা দিয়ে দেখতেন—কাকরাইল বা লালবাগ মসজিদে বন্দী জীবন যাপন করতেন, শিকের ভেতরে ছিলেন। তিনি কেবল একজন 'অনলুকার' ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে তিনি বন্দী ছিলেন, ফলে প্রতিষ্ঠানবিরোধী একটা মনোভাব তাঁর ভেতরে জন্ম নিয়েছিল। এ জন্য মাদ্রাসার যে জীবন, সেটাকে তিনি খুব ভালোভাবে নেননি। কারণ, এখানে যে বেঁধে ফেলা, আঁকড়ে ধরা, এটা করা যাবে না, সেটা করা যাবে না—এই যে নানা রকমের বাধা, এটা তিনি পছন্দ করেননি। এটা তাঁর যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা, যা তিনি *মাটির ময়নায়* সিনেম্যাটিকভাবে নিয়ে এসেছেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ, যা ওই লেখায় তৃতীয় দ্বন্দ্বমূলক ধারণার মধ্যে ছিল, যে দ্বন্দ্ব ভাষা ও ধর্মের টানাপোড়েনে তৈরি হয়েছিল। *মাটির ময়নায়* এটা একটা বিরাট প্রসঙ্গ হয়ে এসেছে, আমরা যে রাষ্ট্রটা চাই, সেটা ভাষাভিত্তিক হবে, নাকি ধর্মভিত্তিক হবে? আমরা দেখি, *মাটির ময়নায়* দ্বন্দ্বটা প্রকট হয়ে উঠেছে। এর একটা সাময়িক অবসান দেখি ধর্মনিরপেক্ষ ও ভাষাভিত্তিক বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইঙ্গিত দিয়ে। তবে দ্বন্দ্বটার অবসান এখনো হয়নি। স্বাধীনতা অর্জনের পর অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়েছে গত চার দশকে। ১৯৭৫ সালে যে পটপরিবর্তন হয়, তার ফলে দেশটা ক্রমেই তার জন্মলগ্নের তাত্ত্বিক পটভূমি থেকে সরে গেছে। আমরা সংগ্রাম করেছিলাম প্রধানত একটা বাংলা ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ব বলে, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের বদলে; সে সংগ্রামে সফলও হয়েছিলাম, কিন্তু দেশটা আবার ধীরে ধীরে পেছনের দিকে ফিরে গেছে! তার একটা মূর্ত রূপ বর্তমানে আমরা দেখতে পাই আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে।

অন্য একটা দিক থেকেও *মাটির ময়নার* ওই সমালোচনাকর্মে তারেকের মানসিকতা বোঝার চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। অনুমিত হয়েছিল যে তারেক মাসুদের জীবনদর্শন এবং বিশ্ববীক্ষার মধ্যে একটা মরমিবাদের প্রভাব আছে। একটা সেক্যুলার ব্যাপার আছে। তিনি মাওলানা রুমির কবিতা পছন্দ করতেন। মানুষকে নিধর্মীকরণ-সংক্রান্ত (de-theolization) রুমির জীবনদর্শনটি তাঁর পছন্দ ছিল। তারেক আসলে খুব একটা এক্সট্রেমিস্ট মানুষ ছিলেন না। মনে হয়, তিনি চিন্তাচেতনার দিক থেকে মধ্যপন্থার মানুষ ছিলেন। ওই লেখায় আমি তাঁকে একটু সমালোচনাও করেছি, বলেছি, এই যে মরমিবাদ, এটা দিয়ে হার্শ-ক্রুড-স্টার্ক

রিয়েলিটিকে মোকাবিলা করা যাবে না। প্রচণ্ডভাবে একটা দিক আঁকড়ে ধরতে হবে, হয় এদিক, না-হয় সেদিক। মাঝখানে থেকে কোনো রকমের ফয়সালা করা যাবে না। ভবিষ্যতেও রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানেই আমাদের লড়াই করতে হবে, সেখানে আমাদের একটা পক্ষ নিয়ে কাজ করতে হবে। যাই হোক, *মাটির ময়নায়* তারেক বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদ, দুটোকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। জাতীয়তাবাদ-বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে তারেকের মনোভাব জানা যায় 'সত্যজিৎ ও রবীন্দ্রনাথ' নামক একটি রচনা থেকে। তিনি লিখেছেন :

> আমার কাছে সত্যজিৎ ও রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মিল তাঁদের বৃহৎ বিশ্বদৃষ্টি। তাঁদের কেউই জাতীয়তাবাদের গণ্ডিবদ্ধ অন্ধতার শিকার হননি। লক্ষণীয় বিষয়, সত্যজিতের সমসাময়িক পরিচালক ঋত্বিক ঘটক যখন মারা গেলেন, সত্যজিৎ তাঁর শোকবার্তায় বললেন, 'ঋত্বিক আমার চেয়ে বৃহত্তর বাঙালি ছিলেন।' আমার মনে হয় না সত্যজিৎ এখানে কেবল বিনয় দেখাচ্ছেন। বরং এটা এমন একটা প্রশস্তি, যা তিনি নিজের জন্য বরাদ্দ রাখতে চাননি। বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রবণতা থেকে এই মানসিক দূরত্ব রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনারও একটি মৌলিক দিক।[৯]

ধারণা করি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিতের মানসিক যে অবস্থান, তা তারেকের মানস গঠনে প্রভাব ফেলেছে। ফরহাদ মজহারের লেখায় তারেকের বাঙালি জাতীয়তাবাদ-সম্পর্কিত ধারণার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

> তারেক মাসুদ যখন ছবি করতে এসেছেন, তখন বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এবং বাঙালি পরিচয়ের প্রধান বয়ান হয়ে উঠেছে। তারেক মাসুদ খ্যাতি লাভ করলেন, যখন তাঁর *মুক্তির গান* ও *মুক্তির কথা* বাঙালি জাতীয়তাবাদের সেই প্রধান বয়ানের কাজে লেগে গেল এবং তাঁকে আরও শক্তিশালী করতে সক্ষম হলো।...তারেক সম্ভবত এই এককাট্টা জাতীয়তাবাদী বয়ানের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করতেন।...জাতীয়তাবাদী বয়ানের 'ভাবাবেগ ও একরৈখিকতা' তারেকের অপছন্দ ছিল।...তারেক তাঁর পারসেপশন বা দৃষ্টিভঙ্গীকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী বয়ানের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সাধনা করেননি।...তারেক বাঙালি জাতীয়তাবাদী বয়ান থেকে বেরিয়ে আসেননি, কিন্তু *মাটির ময়না* বাঙালি জাতীয়তাবাদী বয়ানের সংকটকে সামনে নিয়ে এসেছে।...বাঙালি জাতীয়তাবাদী বয়ানের মধ্যে ইসলাম প্রশ্নে যে উৎকণ্ঠা ও ভীতি রয়েছে, তারেক তাঁর জায়গা থেকে সেই সবের একটা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার মূলকথা ছিল, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আশ্রয় করেই বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন বয়ান খুঁজতে হবে। ইসলাম যেখানে বাইরের প্রতিপক্ষ হয়ে থাকবে না।[১০]

মাটির ময়নায় কতগুলো বাহাসের দৃশ্য আছে। এই দৃশ্যগুলোতে ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক প্রসঙ্গে তারেকের মতামত পাওয়া যায়। আমাদের বৃহত্তর লোকসমাজের ভেতর বাহাসের একটা ঐতিহ্যই আছে। ঐতিহ্যবাহী পালাগান, কবির লড়াইয়ে আমরা বাহাস করি। আমাদের নির্দিষ্ট কিছু আঙ্গিকই আছে, যেখানে আমরা বাহাস করি। আমরা খুবই বাহাসপ্রবণ মানুষ এবং সমন্বয়বাদী মনোভাব আমাদের এখানে প্রবল। আমাদের একটা আরগুমেন্টেটিভ ট্র্যাডিশন আছে। কারণ, আমাদের এই অঞ্চলে নানা রকম ধর্মের আগমন ঘটেছে, উদ্ভবও ঘটেছে। একই এলাকায় নানা ধর্মের মানুষকে বসবাস করতে হয়েছে হাজার বছর ধরে। ফলে সব ধর্মের মানুষ একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেছে। তারেক মাসুদ এই বাহাসের ভেতরে ঢুকে দেখেছেন যে সবাই সমন্বয়ের ব্যাপারটা পছন্দ করে। *মাটির ময়নায়* গানের মধ্যে, করিম মাঝির সংলাপের ভেতর বাহাসের প্রসঙ্গ আছে, সমন্বয়ের কথা আছে। এই সমন্বয়ের বিষয়টা আমাদের লোকমানসের একটা দার্শনিক অবস্থান হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা। *মাটির ময়নায়* তারেক মাসুদ একদিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-জৈন-শাক্ত-বৈষ্ণব-বাউল-মুসলমান—যাদের কথাই বলি না কেন, তারা হাজার হাজার বছর ধরে এখানে বাস করছে। তাদের তো এখানেই থাকতে হয়েছে, হচ্ছে। তাই একটা সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে, সম্প্রীতির ভেতর দিয়ে এবং নানা রকম অনৈক্যের মধ্য দিয়েও একটা ঐক্য স্থাপন করে গণতান্ত্রিক উপায়ে সহাবস্থান করতে হবে। আমাদের লোকসংস্কৃতির ভেতরে তিনটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানবতাবাদ, গণতান্ত্রিক মনোভাব ও অসাম্প্রদায়িকতা। আমাদের বৃহত্তর লোকসমাজের এগুলো মূল স্তম্ভ। আমি দীর্ঘকাল ধরে তিতাস নদীর ওপারে গিয়ে লোকগান সংগ্রহ করছি। আমি দেখেছি যে তাদের ভেতরে গণতান্ত্রিক একটা চিন্তাভাবনা, সমন্বয়বাদী একটা চেতনা আছে। পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক চেতনাটাও তাদের মধ্যে খুব বেশি। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় যে জিনিসটি আমি দেখেছি, সেটা হচ্ছে মানবতাবাদ। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে তারা মানুষকে ভালোবেসেছে, মানুষপন্থী হয়েছে। সুফিবাদ ও বৈষ্ণববাদের মধ্যে যে মানুষপন্থী হওয়ার স্পৃহা আছে এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে সহজিয়া মতবাদ আছে, সবেতেই সহাবস্থানের কথা আছে। সুফিইজম তো বাইরে থেকে এসেছে, এসে এখানে বৈষ্ণববাদের সঙ্গে সহাবস্থান করেছে। একই সঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এই তিনটি মিশেই আবার বাউলতত্ত্বের

জন্ম হয়েছে। বাউলতত্ত্বের ভেতরে, বাউলগানের ভেতরে যা পাওয়া যায়, তারেক মাসুদের চলচ্চিত্রেও তার কিছুটা পাওয়া যায়, বিশেষ করে কাহিনিধর্মী, স্বল্প ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে। আমি একটা প্রবন্ধে[১১] দেখিয়েছি যে তারেক মাসুদ আসলে একজন 'লোকচলচ্চিত্রকার'। আমি জানি না, পৃথিবীর কোথাও কেউ কোনো চলচ্চিত্রকার সম্পর্কে এ রকম অভিধা ব্যবহার করেছেন কি না।

আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি, বেড়ে উঠেছি সেই ১৯৭৫ সাল থেকে। আমি তারেককে কিছুটা চিনি এবং ওই প্রবন্ধে আমি লিখেছি যে তিনি অন্তত চারবার এই লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশনে গেছেন। প্রথম জীবনে গেছেন, যখন তিনি ছোট ছিলেন—যেগুলো উঠে এসেছে *মাটির ময়নায়*। ওই চলচ্চিত্রে আনুর কাকার সঙ্গে নৌকাবাইচ দেখতে যাওয়া, মেলায়-আড়ঙে যাওয়া, বাতাসা কেনা, মাটির তৈরি ময়না পাখি কেনা—এগুলো তাঁর লোকসংস্কৃতির সঙ্গে প্রথম জীবনের ইন্টারঅ্যাকশনের ফসল। তার যে মানস, সেটা ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক শিল্পীর ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায়। যাই হোক, প্রথম জীবনের ইন্টারঅ্যাকশন তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। ঢাকায় এসে যখন এস এম সুলতানের ওপর *আদম সুরত* শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ শুরু করেন যেটা ১৯৮২-তে শুরু হয়ে ১৯৮৯-তে শেষ হয়েছে, তখন সুলতানের সঙ্গে মিশে তিনি গ্রামে-গঞ্জে গেছেন, তখন লোকসংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়বার ইন্টারঅ্যাকশন ঘটে। *আদম সুরত* নির্মাণ প্রসঙ্গে তারেক যা লিখেছেন, তাতে তাঁর লোকসংস্কৃতির সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের ইন্টারঅ্যাকশনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তারেক লিখেছেন, 'একধরনের বাউলাঙ্গের চলচ্চিত্র নির্মাণে আমরা জড়িয়ে গিয়েছিলাম।...বিভিন্ন লোকজ উৎসব, যেমন—কুমিল্লার পাগলার মেলা থেকে শুরু করে চট্টগ্রামের মাইজভান্ডারি, তারপর কুষ্টিয়া থেকে শুরু করে ময়মনসিংহের বিভিন্ন উৎসব, ফরিদপুরের নৌকাবাইচ, ধামরাইয়ের রথযাত্রা—যেখানেই শুনতাম লোকসংস্কৃতির কোনো যজ্ঞ চলছে, সেখানেই ক্যামেরা নিয়ে হাজির হয়ে যেতাম।'[১২] অন্যত্র লিখেছেন, 'সুলতানের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে আমি একক মূলধারার জাতীয় সংস্কৃতির বদলে সংস্কৃতির শত শত ক্ষুদ্র ধারা আবিষ্কার করেছি।'[১৩]

লোকসংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর এই মিথস্ক্রিয়ার ফলেই তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির অন্দরমহলে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তিনি বহুত্ববাদী হয়ে ওঠেন। এর সত্যতা তাঁর লেখাতেই পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'শহুরে মধ্যবিত্তকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে বৃহত্তর প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্য লুকিয়ে রয়েছে আমাদের সুপ্রাচীন লৌকিক সংস্কৃতিতে।'[১৪] বস্তুত, আমরা যারা যৌবনের একটা বড় সময় সুলতান ও ছফার সঙ্গে কাটিয়েছি, তাদের সবার অনুভব একই ধরনের। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সুলতান ও ছফার প্রভাব পড়েছে। আমরা একই ভূখণ্ডে বহু মত বহু পথের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছি। তাঁর

তৃতীয় ইন্টারঅ্যাকশনটা ছিল *মুক্তির গান* নির্মাণের সময়। ওখানে লোকগান, পুতুলনাচ দিয়েই মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কথা বলছেন আমাদের সংস্কৃতিকর্মীরা। আর চতুর্থ একটা ইন্টারঅ্যাকশন হয়েছে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে, যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎসবকে ক্যামেরাবন্দী করছিলেন একটা প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করার জন্য। এটা তাঁর ফোর্থ স্টেজ অব ইন্টারঅ্যাকশন উইথ দ্য লোকাল কালচারাল রুট প্যারাডাইমস। বস্তুত তারেক মাসুদের মানসিকতায় অসাম্প্রদায়িকতা, মানবতাবাদ, গণতান্ত্রিক মনোভাব, পরমতসহিষ্ণু হওয়ার যে ব্যাপারগুলো, এগুলো সব তাঁর ভেতরে আস্তে আস্তে দানা বেঁধেছে, তাঁর মানস গঠনে সহায়ক হয়েছে এবং তারই প্রতিফলন আমরা তাঁর বিভিন্ন চলচ্চিত্রে দেখতে পাই।

বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের অনেকে ইসলামকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন, তারেক সে দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করেছিলেন। ধর্মীয় ইসলামকে তারেক প্রতিপক্ষ করে তুলতে চাননি। ধর্মীয় ইসলামকে তিনি ধর্মপ্রাণ বাঙালির নিজস্ব বিশ্বাসের বলয়-কাঠামো বলে ভাবতেন। তাই *মাটির ময়নায়* দেখি যে তিনি আমাদের বৃহত্তর লোকসমাজের অসাম্প্রদায়িক চিহ্নজ্ঞাপক নানা উপাদান ব্যবহার করছেন। লক্ষণীয়, ধর্মীয় ইসলামের নানা দিক *মাটির ময়নায়* আনলেও রাজনৈতিক ইসলাম সম্পর্কে তিনি তখন কিছুটা নীরব থেকেছেন। সরব হয়েছেন *রানওয়েতে* এসে, সময়ের প্রয়োজনে।

তারেক মাসুদ আসলে কাজ করতে করতে এগিয়ে গেছেন। কাজ করতে করতে তাঁর মানস অনেক বেশি ঋদ্ধ হয়েছে। কোনো পূর্বনির্ধারিত ধারণাকে কেন্দ্র করে কাজ করেননি। *মাটির ময়নায়* তিনি অনেকগুলো ধারণাকে একসঙ্গে টেনে এগিয়ে গেছেন। সেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কী হবে, এটা নিয়ে তিনি ভেবেছেন। এখানে তারেক মাসুদ স্পষ্টত ধর্মকে রাষ্ট্রের বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন। এ ছাড়া তো আর উপায় ছিল না। সমাজ তার নিজের শরীরের ভেতরেই দ্বন্দ্বের জন্ম দেয় এবং এই দ্বন্দ্বগুলো কীভাবে নিরসিত হবে, কীভাবে সমাধানপ্রাপ্ত হবে, সেটাও সমাজ নিজেই ঠিক করে। এখানে ব্যক্তি ওপর থেকে কিছু চাপিয়ে দেয় না। সুতরাং রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কী সম্পর্ক হবে, এটা তারেক মাসুদের এ সম্পর্কিত নিজস্ব ভাবনা কী, সেটার দ্বারা নির্ধারিত হয়নি। রাষ্ট্রটা ধর্মভিত্তিক হবে, না ভাষাভিত্তিক হবে, এটা নিয়ে যে ঝামেলাগুলো চলছিল, সেই ঝামেলাগুলো থেকে উত্তরণের উপায় আমাদের এই সমাজব্যবস্থাই বাতলে দিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে হটিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণাকে প্রতিস্থাপন করেছে। রাষ্ট্রটাকে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চায়নি। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র—এগুলো ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের সহচর।

একটা ভুল বোঝার অবকাশ থেকে যাবে যদি আমরা মনে করি যে তিনি মুসলিম

জাতীয়তাবাদ বা রাজনৈতিক ইসলামকে প্রশ্রয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেটা তিনি করেননি। তিনি বলেছেনও একসময় যে 'আমি ধার্মিক নই, কিন্তু আমি ভীষণভাবে আগ্রহী ধর্মের ব্যাপারে'।[১৫] জাকির হোসেন রাজুর মতে, তারেক মাসুদ হলেন সেই ব্যতিক্রমী পরিচালক, যিনি ইসলাম, মুসলমানিত্ব ও মাদ্রাসাকে বিষমরূপে বা হেটারোজেনাস ডিসকোর্স আকারে উপস্থাপন করেছেন।[১৬] তার মানে হচ্ছে যে তারেক বুঝতে চেয়েছেন আসলে মূল সংকট বা দ্বন্দ্বটা কী। *মাটির ময়নায়* যেই সময়টা ধরা হয়েছে সেই সময় রাষ্ট্রীয় সমাজবাস্তবতায় যে সংকট বা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল, তার উৎস সন্ধানের জন্য ইসলাম, মুসলমানিত্ব, মাদ্রাসা, মুক্তিযুদ্ধ, রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বিষয়কে তিনি বুঝতে চেয়েছেন। এগুলো তাঁর কাছে কিছু প্রপঞ্চ হিসেবে এসেছে। এগুলোর পক্ষ নিয়ে তিনি কখনো ওকালতি করার কথা ভাবেননি বলেই আমার মনে হয়েছে; বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এগুলোর কার্যকারিতাকেই পরখ করে দেখতে চেয়েছেন কেবল।

নরসুন্দর

নরসুন্দর একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র। তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ দুজন মিলে এটি নির্মাণ করেছেন। প্রত্যেক চলচ্চিত্র-নির্মাতার নিজের একটা বক্তব্য থাকে, ওয়েভ অব স্টেটমেন্ট থাকে। এই ওয়েভ অব স্টেটমেন্টগুলো একজন চলচ্চিত্রকার তাঁর কাজের ভেতর আনতে চান। এই স্টেটমেন্টগুলোর সবই যে নির্মাতার নিজের হয়, তেমন নয়। এ দেশে যাঁরা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, তাঁদের কোনো না কোনো সূত্র থেকে চলচ্চিত্রটা করার জন্য অর্থটা জোগাড় করতে হয়। অর্থটা কে দিচ্ছে, তাঁর বা তাঁদের কী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে, তাও তাঁদের দেখতে হয়। তারেক *নরসুন্দর* করেছেন রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস্ রিসার্চ তথা 'রামরু' নামক একটা সংস্থার অর্থে, যারা অভিবাসী-আটকে পড়া উদ্বাস্তু মানুষ প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে কাজ করে। সেই সূত্রে বাংলাদেশে আটকে পড়া বিহারিদের নিয়েও তারা কাজ করে। *নরসুন্দর*-এর গল্পটা শেষ পর্যন্ত বিহারিদের পক্ষেই গেছে। তারেক মাসুদের বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত একটা পলিটিক্যাল থ্রিলার *নরসুন্দর*। কিন্তু এই থ্রিলারটার ভেতরে যে ইস্যুটা আসছে কাহিনির মধ্য দিয়ে সেটা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বা সমাজে কতটা গ্রহণযোগ্য, এই প্রশ্ন কিন্তু চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে আমাকে করতেই হবে। কাহিনিটাতে আছে যে মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন মুক্তিযোদ্ধা তাঁর মা-বাবাকে দেখতে আসেন, আর্মি খবর পেয়ে যায়, তাঁকে ধরতে আসে, তিনি পালান। তাঁকে না পেয়ে তাঁর মা-বাবাকে অত্যাচার করে। তিনি পালিয়ে গিয়ে ওঠেন এক সেলুনে। সেলুনে ওঠার সময় বিহারিরা দেখে তাঁর দাড়িটাড়ি হয়ে গেছে, তিনি খুব ভীতসন্ত্রস্ত, তাড়া

খাওয়া খরগোশের মতো কাঁপছেন। ছেলেটি দাড়ি কামাতে বসে পড়ে। বিহারিরা যারা সেলুনের মালিক বা চুল কাটে, তারা কিন্তু বুঝে ফেলেছে যে ছেলেটি মুক্তিযোদ্ধাই হবে। কিন্তু তারা সেলুনে আর্মি এলেও ছেলেটিকে ধরিয়ে দেয় না। এখানেই তাদের গ্রেটনেস যে তারা তাকে ধরিয়ে দেয় না। কিন্তু যেভাবে তারা তাঁকে নিয়ে মশকারা-হাসি-ঠাট্টা-তামাশা করে, সেটা কিন্তু দর্শককে ভাবাবে যে ব্যাপারটা কী?

নরসুন্দর-এর প্রধান বক্তব্যটা তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? এটা কি এই যে এই বিহারিদের একাংশ যারা স্বাধীনতার চার দশক পরও এ দেশে রয়ে গেছে, তাদের কিছুটা মহীয়ান করে দেখাতে হবে? বলতে হবে যে একসময় তারাও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল? আমি *নরসুন্দর*-এর বক্তব্যের প্রবাহ নিয়ে প্রশ্ন তুলছি বলে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমি তারেকের খুঁত ধরার চেষ্টা করছি। আমি জানি, তারেকানুরাগীরা আমার এমন প্রশ্নে রাগ করবেন। কিন্তু যে কোনো চলচ্চিত্র পাঠ করার ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় দিক হচ্ছে, যে উৎস থেকে চলচ্চিত্রটি নির্মাণের জন্য অর্থ এসেছে, সেই উৎসটির অভিপ্রায় অনুধাবন করা। তাহলে চলচ্চিত্রকারের 'উদ্দেশ্য'টি বোঝা সহজ হয়। আমি তারেকের চলচ্চিত্রগুচ্ছের একজন মুগ্ধ দর্শক-সমালোচক। আমি কেবল বুঝতে চাইছি কেন, কী কারণে, কীভাবে নির্মিত চলচ্চিত্রের বক্তব্যের কাঠামোটি অবয়বপ্রাপ্ত হয়। বক্তব্যের পেছনে কীভাবে 'চলচ্চিত্রের অর্থনীতি' ক্রিয়াশীল থাকে। একই চলচ্চিত্রের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ থাকাটাই স্বাভাবিক। *নরসুন্দর*-এরও আছে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে একটি চলচ্চিত্রকে পাঠ করার উদ্যোগ থেকেই ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত আসে। প্রণব ভৌমিকের মতে, 'ঐতিহাসিকভাবে বিহারিরা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। চলচ্চিত্রের শুরুতে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন দৃশ্য ও সংলাপে ঐতিহাসিক এ সত্যের উপস্থাপন দেখা গেছে। সেই সঙ্গে এসেছে ব্যতিক্রমও। অর্থাৎ তারেক মাসুদ মুক্তিযুদ্ধে বিহারিদের ভূমিকা নিয়ে প্রচলিত ঐতিহাসিক ধারণার পাশাপাশি স্টেরিওটাইপিং প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে একজন বিহারির ব্যতিক্রমধর্মী ভূমিকা দেখিয়েছেন।...মূলত একই ছকে সবাইকে না ফেলে সংবেদনশীলভাবে প্রতিটি মানুষকে বিবেচনার কথা বলা হয়েছে এ চলচ্চিত্রে। ফলে *নরসুন্দর*-এ তারেক মাসুদের জাতীয়তাবাদ-সংক্রান্ত ভাবনার আরেকটি নতুন দিক পাওয়া গেল।'[১৭] প্রণব মনে হয় তারেকের বহুত্ববাদী মনোভাবের কথাই বলতে চেয়েছেন। *নরসুন্দর* মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের উপস্থাপনার দিকটি সম্পর্কে তারেকের নিজের অনুধাবন হচ্ছে :

যুদ্ধের যেমন ভিন্ন ভিন্ন ন্যারেটিভ বা আখ্যান-উপাখ্যান থাকবে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বয়ান থাকবে। যারা বিপক্ষে ছিল বা পরে পক্ষ বদল করেছে,

তাদের আখ্যান ছিল এবং আছে।... মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে যে উপাখ্যানটি তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে ভাবাবেগ বেশি এসেছে, এসেছে একরৈখিকতা—সেটাই স্বাভাবিক। মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা, দ্যোতনার দিকটা, এর ধূসর ভূমির অংশটি, মুক্তির দিকটি না এসে যুদ্ধের দিকটি এসেছে।...মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটা প্রধান অংশ হলো মানুষ মানুষকে মেরেছে। কিন্তু এটাও পরম সত্য, একাত্তরে মানুষ মানুষকে বাঁচিয়েছে। একজন বাঙালিকে একজন বিহারি বাঁচিয়েছে। একজন বিহারিকে বাঙালি বাঁচিয়েছে। একজন বাঙালি একজন নিরস্ত্র বন্দী পাকিস্তানি সেনাকে বাঁচিয়েছে। একজন পাকিস্তানি একজন বাঙালিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।...আজকের বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা। মুক্তিযুদ্ধের ছবিতে একাধিক আখ্যান থাকবে এবং পরস্পরবিরোধী বয়ান থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। মুক্তিযুদ্ধ মানেই যে ফর্মুলা, যাকে এভাবেই দেখতে হবে, অন্যভাবে বলা বা দেখার অধিকার শিল্পীর নেই, এটা ঠিক নয়। আমার মনে হয়, এখন সময় হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে অনেক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার। এটা মনে হয় দর্শকের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, মুক্তিযুদ্ধকে এই ভিন্নভাবে দেখা, যেখানে সব পক্ষকে সমালোচনা করেও ছবি বানানো যেতে পারে। তবে নির্মাতার নিজের উদ্দেশ্য কী? মুক্তিযুদ্ধে তার গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নটি থেকেই যায়।[১৮]

অন্তর্যাত্রা

নরসুন্দর দেখে মনে হয়েছে যে এর বক্তব্যের কাঠামোটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যারা চলচ্চিত্রটি নির্মাণের জন্য ফান্ড দিয়েছে, তাদের মতাদর্শের একটা ছাপ আছে। তারেকের *অন্তর্যাত্রা*তেও এই ছাপ আছে। পৃথিবীর সব ফান্ডেরই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী চিত্রনাট্য রচনা ও চলচ্চিত্র নির্মাণ কোনো দোষের বিষয় নয়, বরং প্রতিযোগিতা করে ফান্ড পাওয়াটাই কৃতিত্বের ব্যাপার। *অন্তর্যাত্রা* নির্মাণের জন্য অর্থ দিয়েছে 'রটরডাম উৎসব গ্রান্ট' ও ঢাকার 'ব্রিটিশ কাউন্সিল'। এই চলচ্চিত্রের বক্তব্যের কাঠামোটিতে এমন একটি আভাস দেওয়া আছে যে অভিবাসীজনেরা যদি তাঁদের পরবাসকেই আপন করে নেন, তবে তাঁদের মানসিক স্থিরতা বাড়বে। ধারণা করি, এই বক্তব্য ফান্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এতে করে তারেককে নিজের সঙ্গে কিছুটা আপস করতে হয়েছে বলে মনে হয়। এখানে স্বাধীনভাবে নিজের বলার বিষয়টি নির্ধারণ করতে তিনি পারেননি। যদিও তারেক মনে করেন, *অন্তর্যাত্রায়* যে বক্তব্য তিনি হাজির করেছেন, তা অত্যন্ত ভ্যালিড। তিনি লিখেছেন, '*অন্তর্যাত্রা*—যার আক্ষরিক অনুবাদ হতে পারে ইনার জার্নি—স্বদেশ নিয়ে তৈরি। ঘরে ফেরার গল্প। স্বদেশ কি কেবল ভূমি? ভূমি কি স্বদেশ? আমাদের কল্পনায় কি কেবল স্বদেশ-ভূমি? আমরা ঠিক কোথাকার? কোথা থেকে এসেছি আমরা? কবি জালালুদ্দিন রুমির পঙ্‌ক্তি আছে,

'আমি নই পুবের, নই আমি পশ্চিমের—দেশ আমার দেশহীন, ঠিকানা আমার ঠিকানাবিহীন। কান্দাহারে তাঁর জন্ম, মৃত্যু তুরস্কের কনইয়ায়। দুই জায়গাতেই কি নিজেকে তাঁর আগন্তুক মনে হতো? সম্ভবত তাঁর ঘর এ দুই জায়গার মাঝামাঝি কোথাও ছিল—তাঁর যাত্রার মধ্যে।'[১৯] তারেকের এই মত অনুধাবন থেকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক অবস্থান স্পষ্ট হয়, তাঁর মানস যে সুফিবাদের 'মরমিভাব' দ্বারা আচ্ছাদিত, এ বিষয়ে আর সংশয় থাকে না।

অন্তর্যাত্রার কাহিনি 'আত্মপরিচয়' প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এতে জাতিসত্তা, ব্যক্তি, সমাজ ও বংশপরিচয়ের সূত্রগুলো ধরার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এর কাহিনি-কাঠামোর একাংশে ষাট-সত্তর-আশির দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎকালীন তরুণ সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী একটি অংশকে ধরা হয়েছে রফিক ও শিরিনের প্রেম ও বিয়ের মধ্য দিয়ে—'তাদের নিজেদের পছন্দেই বিয়ে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তাঁরা একই সঙ্গে পড়েছে। প্রগতিশীল রাজনীতি আর সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে তাঁরা বেড়ে উঠেছে। রফিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী আর শিরিন ব্যস্ত গ্রুপ-থিয়েটার আর গান নিয়ে। রফিক গান ভালোবাসে, আর সে কারণেই ভালোবাসে শিরিনকে। সেই ভালো লাগা অবশেষে গড়ায় বিয়েতে। রফিকের অগ্রসর চিন্তা আর দৃষ্টিভঙ্গি শিরিনকে আকৃষ্ট করে তার প্রতি। ভালোবাসা সংসারে রূপ নিলে সম্পর্কের বাস্তবতা ক্রমে পাল্টাতে থাকে।'[২০] রফিক ক্রমেই সবকিছু থেকে সরে এসে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে বাঁচতে চায়। দুজনের ব্যক্তিত্বের সংঘাত পরবর্তীকালে সম্পর্কের ছেদ অবধি গড়ায়। লক্ষণীয় যে ওদের বেড়ে ওঠার কালটা বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষের একটা সন্ধিক্ষণ।[২১]

তারেক মাসুদ একেবারে নিজস্ব অর্থায়নে যখন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন, তখন তিনি বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছেন এবং তার প্রয়োগও করেছেন, কোনো বাদ-ভাবের তোয়াক্কা করেননি। এ ক্ষেত্রে *আদম সুরত*, *মুক্তির গান*, *মুক্তির কথা*, *রানওয়ে*-এর কথা বিশেষভাবে বলা যায়। *মাটির ময়না*তেও তারেক নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপন করতে পেরেছেন, নানা উৎস থেকে অর্থ পাওয়া সত্ত্বেও। ধারণা করি, *কাগজের ফুল*-এর চিত্রনাট্যেও তিনি একেবারে স্বাধীনভাবে বক্তব্যের কাঠামোটি দাঁড় করিয়েছেন। কারণ এটি তিনি নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

রানওয়ে

*মাটির ময়না*য় বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি পাঞ্জাবি মুসলমানের দ্বন্দ্বটা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই দ্বন্দ্বটা নিরসন করেই ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই দ্বন্দ্বটা নিরসন হওয়ার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়

পরিকাঠামোর মধ্যে বাঙালি ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমানের সঙ্গে বাঙালি উগ্র ধর্মান্ধ মৌলবাদী মুসলমানদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্ব এখনো চলছে এবং এই দ্বন্দ্বেরই একটা বহিঃপ্রকাশ আমরা *রানওয়েতে* পাই। বস্তুত রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কটা এখনো মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্রে। এ জন্যই বারবার এই দ্বন্দ্বটা ঘুরেফিরে আসছে—বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার এত বছর পরও আবার ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা লক্ষ করা যাচ্ছে। *মাটির ময়নার* পর *রানওয়েতে* দ্বিতীয়বার অ্যাড্রেস হয়েছে এই দ্বন্দ্বটা।

রানওয়ে ২০০৫-২০০৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে সংঘটিত জঙ্গিবাদী অপতৎপরতা নিয়ে নির্মিত। এতে দেশি-বিদেশি জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের খপ্পরে পড়ে রুহুল নামের এক সরল ছেলের জঙ্গিবাদী হয়ে ওঠা, জঙ্গিবাদী কার্যক্রমে অংশ নেওয়া প্রভৃতি দেখানো হয়েছে। রুহুলের এই জড়িয়ে পড়ার কারণে একপর্যায়ে সে নিজেই শুধু মানসিক দোলাচলে ভোগে না, তার পরিবারের সদস্যরাও আক্রান্ত হয়। সর্বোপরি সমাজ-রাষ্ট্রে অস্থিরতা দেখা দেয়। শেষাবধি রুহুল তার ভুল বুঝতে পারে এবং মায়ের কাছে ফিরে আসে। মা দুধ দিয়ে ছেলের মুখ ধুইয়ে তাকে ঘরে তুলে নেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছিল, তার সমাধানটা তারেক *মাটির ময়নায়* লোকধর্মের মধ্যে খুঁজেছেন। *রানওয়েতেও* লোকধর্মের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। এর শেষ দৃশ্যে মায়ের ছেলেকে দুধ দিয়ে মুখ ধুইয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গটি আমাদের লোকসংস্কৃতির পুরোনো একটি আচার। লোকায়ত সমাজে একটি আচার আছে, কোনো কিছুকে পরিশুদ্ধ করতে হলে নারকেলের পানি বা দুধ দিয়ে তা ধুইয়ে দিতে হবে। আসলে লোকধর্মের প্রতি তারেকের একধরনের পক্ষপাত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর যে স্মৃতিচারণামূলক অনুষ্ঠান হয়েছিল ব্রিটিশ কাউন্সিলে, তখন যাঁরা স্মৃতিচারণা করেছিলেন, তাঁদের কথা নিয়ে যে গ্রন্থটা বের হয়েছে, তার একটা সমালোচনা লিখেছিলাম।[২২] ঠিক সমালোচনা নয় ওটা, তাঁকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। পত্রপ্রবন্ধ বলা যায়। বিভিন্ন বক্তার সাহায্য নিয়ে সেই চিঠিতে উল্লেখ করেছি যে আসলে তিনি কী ধরনের মানসিকতার মানুষ ছিলেন। তাঁর মনন গড়ে উঠেছে আমাদের লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান দ্বারা। এটা ঠিকই বৃহত্তর লোকসমাজের ভেতরে যেসব ধর্ম আছে, তারা একে অন্যকে কখনো কখনো আক্রমণ করলেও সতত সমন্বয়বাদী একটা মনোভাবের মধ্য দিয়েই এগিয়ে গেছে। লোকধর্ম যেটাকে বলা হচ্ছে, সেটা আসলে লোকসংস্কৃতির পর্যায়েই পড়ে। আমাদের লোকসংস্কৃতি খুবই সমৃদ্ধ। এখানে হিন্দু-মুসলমান এবং অন্য ধর্মাবলম্বীরা সবাই মিলেমিশে অবস্থান করছে। বিভিন্ন ধারণা একটা আরেকটার গায়ে লেগেই আছে। ধানখেত যখন বাতাসে দোলে, তখন ধানের ছড়া একটা আরেকটার গায়ে হেলে পড়ে, তেমনি অনেক দিন ধরে একই জায়গায় বসবাস করার ফলে একটা ধর্মের

ধ্যানধারণা আরেকটা ধর্মে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলে। লোকসংস্কৃতি, লোকধর্ম—যাই বলি, এটাই তারেক মাসুদের পছন্দের ধর্ম ছিল। কারণ, ওই যে সমন্বয়বাদী মনোভাব, ওই যে মাঝামাঝি থাকা, একে অন্যকে আক্রমণ না করা—এই মনোভাবটাই তারেকের পছন্দের দর্শন ছিল।

সমাজ এমন কোনো সমস্যার জন্ম দেয় না, যার সমাধান তার নিজের মধ্যে নেই। দ্বন্দ্বগুলোর ভেতরে সমাধানটাও থাকে। হয়তো একটু সময় লাগে কিন্তু সমাধানটা আসেই। আমরা যদি বর্তমান বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের অবস্থা ও অবস্থানটা দেখি, তাহলে দেখব যে দুটি পক্ষ এর মধ্যে আছে। এক দলে আছেন ধর্মীয় ইসলামপন্থী, আরেক দলে আছেন রাজনৈতিক ইসলামপন্থীরা। তারেক মাসুদ ধর্মীয় ইসলামের পক্ষই নিয়েছেন। কারণ, ধর্মীয় ইসলাম এ দেশের অধিকাংশ মানুষের আচরণীয় ধর্ম। যেকোনো ধর্ম সমাজে দুটি প্রধান ভূমিকা পালন করে: ব্যক্তিগত ও দলগত উদ্বেগ লাঘব করে এবং একই সঙ্গে সমাজকে একটা রুটিন ও সিস্টেমে চলতে সাহায্য করে। এই রাষ্ট্রে সবাই একসঙ্গে থাকবে, এটাই তারেকের রাষ্ট্রদর্শন ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এই যে সমন্বয়বাদী একটা ব্যাপার, এটাই কিন্তু আমাদের লোকধর্মের একটা বিরাট রক্ষাকবচ, একটা বিরাট দার্শনিক অবস্থান। বাধ্য হয়ে আমাদের বৃহত্তর লোকসমাজ এই অবস্থান নিয়েছে। এটার এখনো দরকার আছে। পশ্চিম পাকিস্তানি পাঞ্জাবি মুসলমানদের সঙ্গে তো আমাদের দ্বন্দ্ব শেষ। তাহলে এখন দ্বন্দ্ব কার সঙ্গে, কোথায় হচ্ছে? এখন দ্বন্দ্বটা বেধেছে আমাদের নিজেদের মধ্যে: বাঙালি ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান বা উদারপন্থী, এরা এক পক্ষে আছে, আরেক পক্ষে কট্টরপন্থী মৌলবাদী রাজনৈতিক ইসলামপন্থী যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে। যে দ্বন্দ্বটা এখন দেখা দিয়েছে আমাদের সমাজে, এটা নিরসন না করে সমাজ এগোতে পারবে না। একটা সময় এবং পর্যায়ে এর সমাধানটা আসবে। এর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, কাজ করতে হবে। এবং সে জন্যই আমার মনে হয়, তারেক মাসুদ চরম এবং পরম বলে কোনো কিছুতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যেটা, সেটা হলো মাঝামাঝিতে থাকা। মাঝামাঝিতে থাকাই কিন্তু আমাদের বৃহত্তর লোকসমাজ ও লোকধর্মের একটা বড় দৃষ্টিভঙ্গি। আমার যেটা মনে হয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থাই তাঁকে বাধ্য করেছে এই পথ ধরতে। লোকধর্ম ও বাউলদের দর্শনই তারেক মাসুদকে উৎসাহ দিয়েছে এই মধ্যপন্থী হওয়ার ব্যাপারে।

শেষ কথা

সামগ্রিকভাবে তারেক ও ক্যাথরিন মাসুদ নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজ-সংস্কৃতিভিত্তিক আলোচ্য চলচ্চিত্রগুচ্ছে তারেক মাসুদের বাঙালি জাতীয়তাবাদ-সংক্রান্ত ভাবনা উপস্থাপনের বিষয়টি তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? নাতিদীর্ঘ এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা

যায়, ক্রমান্বয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার ভেতরে পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বনির্ধারিত একটা থিম বা ভাবনা নিয়ে তিনি কাজে নামেননি। কাজ করতে করতে কাজের ভেতর থেকে তারেকের মধ্যে একটা ডিসকার্সিভ অ্যাপ্রোচ তৈরি হয়েছে। তাঁর মানস গঠন ও চলচ্চিত্রের বক্তব্যের কাঠামোতে সেই অ্যাপ্রোচের অ্যাসপেক্টগুলো ক্রিয়াশীল ছিল। ১৯৭১ সালে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কেন বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দাঁড় করাতে হয়েছিল, তা *মুক্তির গান*-এ তারেক বুঝতে পেরেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশে অবস্থানরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের 'আদিবাসী জাতীয়তাবাদ'-সংক্রান্ত ধারণার মুখোমুখি হন *মুক্তির কথা* ও *অন্তর্যাত্রা* নির্মাণ করতে গিয়ে। *মাটির ময়নায়* ধর্মীয় ইসলাম ও রাজনৈতিক ইসলামের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। সেই সূত্রে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর পার্থক্য বুঝতে পারেন। *রানওয়ে*তে ধর্মভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষ উপস্থাপন করে দ্বিতীয়টির পক্ষ নেন। ধর্মকে লোকাচারের অংশ হিসেবে গণ্য করেন। ফলে তাঁর মানস ভরে ওঠে মরমি-মধ্যপন্থী-সমন্বয়বাদী মনোভাবে।

তাঁর যে মরমি-মধ্যপন্থী-সমন্বয়বাদী মনোভাব, চরম বা পরমে না যাওয়া, যা তারেকের চিন্তা-কাঠামোর মধ্যে পাওয়া যায়—এগুলো তাঁর জ্ঞানগত কাঠামোতে এসেছে কাজ করতে করতে, কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে। এবং একটু স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যে আখ্যান বা ন্যারেটিভগুলোর ভেতরে তিনি ছিলেন, সেগুলো মিলে একটা মেটান্যারেটিভ তৈরি হয়েছিল—এগুলোর ভেতর থেকে তিনি কিছু বিশিষ্ট ধারণা পেয়েছেন এবং সেই বিশিষ্ট ধারণাগুলো তাঁর মননকে তৈরি করেছে। তিনি মাদ্রাসায় ছিলেন। সেটাও তাঁর মানস গঠনে প্রভাব ফেলেছে। তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি-চেতনাগত জ্ঞানকাঠামো—যা-ই বলি না কেন, সেটাকে তিনি ধর্মের হেটারোজেনাস এলিমেন্টগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। মাদ্রাসাজীবনটা তিনি বুঝতে চেয়েছেন, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরে যে দুই ধরনের ব্যবস্থা আছে, কওমি ও আলিয়া, এগুলোও বুঝতে চেয়েছেন। *মাটির ময়নায়* রাষ্ট্র ধর্মভিত্তিক না ভাষাভিত্তিক হবে, তাও বুঝতে চেয়েছেন। *রানওয়ে*তেও *মাটির ময়নার* দ্বন্দ্বটার দ্বিতীয় রূপটাকে অর্থাৎ বাঙালি ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান বনাম বাঙালি ধর্মান্ধ মৌলবাদী মুসলমান—এদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বটা এখন চলছে আমাদের রাষ্ট্রে, সেটা বুঝতে চেয়েছেন। দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তিনি ধর্মীয় ইসলামের পক্ষ নিয়েছিলেন বলে আমার বিশ্বাস, রাজনৈতিক ইসলাম তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। বস্তুত, বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণা বা চিন্তা-কাঠামোর বাইরে তিনি খুব একটা যাননি। এক্সট্রেমিস্ট হওয়ার জন্য রাজনৈতিক ইসলামের মধ্যে যে চিন্তাসূত্র আছে, সেটা তাঁকে প্রভাবিত করেনি বলে ধারণা করি। তিনি নিজের

দেশের সমাজবাস্তবতায় যা পেয়েছেন, সেগুলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন তাঁর চলচ্চিত্রে। তারেক মাসুদের মানসিকতায় এই যে দার্শনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলোর অবস্থান, তা একদিনে তৈরি হয়নি। তাঁর চিন্তাভাবনায় বিবর্তন হয়েছে, তবে কোনো কিছুর ভেতরে আটকে থাকেননি তিনি, কোনো কিছুতে বদ্ধ থাকেননি।

তারেক মাসুদ বাঙালি জাতীয়তাবাদ থেকে খুব একটা সরেছেন বলে মনে হয় না। আমাদের দেশে যে দুটি পক্ষ এখন দাঁড়িয়ে গেছে, বাঙালি ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান এবং বাঙালি ধর্মান্ধ উগ্রপন্থী মুসলমান—তাদের মধ্যে বাঙালি মডারেট বা উদারপন্থীদের পক্ষে যাঁরা আছেন, তাঁদের এখনো বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হচ্ছে, হবে। কারণ, অপর পক্ষটা সব সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আক্রমণ করেছে, এখনো করছে। সুতরাং বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে রুট প্যারাডাইমগুলো আছে, সেগুলোকে আঁকড়ে ধরা এখন একটা জরুরি কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, নাট্যকর্ম, সাহিত্যকর্মসহ শিল্পাঙ্গিকের সব শাখাতেই এই কাজটা করা দরকার। তবে একটা বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকতে হবে, যাতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে বাংলাদেশে বসবাসরত অন্য কোনো জাতিসত্তার ওপর অন্যায় আচরণ করা না হয়। স্মরণে রাখা দরকার, সব ধরনের জাতীয়তাবাদই একটা পর্যায়ে গিয়ে ফ্যাসিস্ট চরিত্র ধারণ করে, স্ট্রেইট ফ্যাসিজমের দিকে ধাবিত হয়। 'ফ্যাসিবাদ' সংগঠিত হয় এভাবে : জাতি -> জাতীয় -> জাতীয়তা -> জাতীয়তাবাদ -> ফ্যাসিবাদ—এই অ্যারো লাইন অনুসরণ করে। এখন আমাদের সংস্কৃতিকর্মীদের এটা একটা বড় দায়িত্ব হয়ে পড়েছে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদও যেন এই পথ অনুসরণ করে ফ্যাসিবাদের দিকে ধাবিত না হয়, সেটা খেয়াল রাখা।

প্রকৃত প্রস্তাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রূপকল্পটি ছিল ভাষাভিত্তিক, নৃতাত্ত্বিক ও অসাম্প্রদায়িক। এই রূপকল্পের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত সব ধর্মের মানুষদের একটি অখণ্ড জাতি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল এবং এই রূপকল্পের নির্মাতা ছিলেন প্রধানত তদানীন্তন আওয়ামী লীগের বাঙালি জাতীয়তাবাদী এলিটরা, তারা 'খুব সহজেই অর্থনৈতিকভাবে শোষিত এবং রাজনৈতিকভাবে নিপীড়িত প্রাকৃত জনগোষ্ঠীকে এটা বোঝাতে সমর্থ হন, তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন দেশের জন্ম দিতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন মুক্তিসংগ্রাম সংঘটিত করা।'[২৩] সেই মুক্তিসংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল এবং নতুন রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'-ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু শোষিত-নিপীড়িত মানুষের সার্বিক মুক্তির বদলে এলিট

শ্রেণীর সার্বিক স্বার্থ রক্ষাই হয়েছে কেবল! নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরই জন্ম নিয়েছে ভূখণ্ডভিত্তিক 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'-এর রূপকল্প। এরই ধারাবাহিকতায় পুনরায় সোচ্চার হয়েছে একদা পরাজিত ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। শুরু থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করা আদিবাসী বা লঘু নৃগোষ্ঠীরাও আদিবাসী জাতীয়তাবাদের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসছে। এ অবস্থায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ-সংক্রান্ত রূপকল্পটি নতুনভাবে ব্যাখ্যাত হওয়ার দরকার বলে মনে করি। সম্ভবত ধর্ম, ভাষা ও ভূখণ্ড নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের সপক্ষে নতুন রূপকল্পের কথা আমাদের ভাবতে হবে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. তারেক মাসুদের জন্ম ফরিদপুরে, ১৯৫৬ সালে। অল্প বয়স থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মাদ্রাসায় পড়ার পর ১৯৯৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেন। তারপর নটর ডেম কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। এরপর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইতিহাস বিভাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন থেকেই নানা রকম সাংস্কৃতিক যজ্ঞে জড়িয়ে পড়েন। ছড়া লেখেন, কাজ করেন লেখক শিবিরে। ১৯৭৫ সালে নিজেকে জড়িত করেন চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯৭৬ সালে চলচ্চিত্র সংসদগুলো নিয়ে গঠিত ফেডারেশনে নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। চলচ্চিত্রবিষয়ক লেখালেখিও করেন, নিজে *ক্যাটওয়া* নামে একটি চলচ্চিত্র সংসদও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামের (১৯৮৬) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (১৯৮৮) সমন্বয়কারী। চলচ্চিত্র নিয়ে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার উদ্যোগও নেন কিন্তু নানা কারণে যাওয়া হয়নি। এরই মধ্যে তিনি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিচালিত তৃতীয় ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স সম্পন্ন করেন। তখনই তাঁর মধ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণের স্পৃহা জাগে। ১৯৮২ সালের দিকে চলচ্চিত্র নির্মাণে যুক্ত হন। ওই সালে চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানকে নিয়ে *আদম সুরত* শীর্ষক একটি পার্সোনালিটি ফিল্ম নির্মাণ শুরু করেন, যা ১৯৮৯ সালে শেষ হয়। ১৯৯১ সালে এর একটি প্রদর্শনী হয় গ্যেটে ইনস্টিটিউটে এস এম সুলতান, আহমদ ছফা প্রমুখের উপস্থিতিতে। ২০১৩ সালের ৬ ডিসেম্বর, তাঁর জন্মদিনে শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় চিত্রশালার মিলনায়তনে এর দ্বিতীয় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তারেক মাসুদ ১৯৯০ সালের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে স্ত্রী ক্যাথরিনসহ চলে যান। ওখানে প্রায় পাঁচ বছর অবস্থান করেন, ওই সময়ই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর লিয়ার লেভিনের তোলা ফুটেজের সন্ধান পান এবং *মুক্তির গান* নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত এই প্রামাণ্য চলচ্চিত্রটি তাঁকে চলচ্চিত্রস্রষ্টার আসনে বসিয়ে দেয়। এরপর একে একে নির্মাণ করেন *মুক্তির কথা* (১৯৯৯), *নারীর কথা* (২০০০), *মাটির ময়না* (২০০২), *অন্তর্যাত্রা* (২০০৬), *নরসুন্দর* (২০০৯) ও *রানওয়ে* (২০১০)। *মাটির ময়না* কান চলচ্চিত্র উৎসবে ক্রিটিকস প্রাইজ অর্জন করে। ২০১১ সালের ১৩ আগস্ট নির্মাণাধীন *কাগজের ফুল*-এর লোকেশন হান্টিং শেষে ঢাকায় ফেরার সময় মানিকগঞ্জে তিনি, ক্যামেরা-সঞ্চালক আশফাক মুনীর মিশুকসহ পাঁচজন নিহত হন।

২. ১৯৭১ সালে মার্কিন নাগরিক লিয়ার লেভিন সুপার সিক্সটিন মিলিমিটার ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করার জন্য। সেই সময় তিনি বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণে খুব বেশি ভেতরে আসতে পারেননি। উদ্বাস্তু শিবির, মুক্তাঞ্চল প্রভৃতি জায়গার চিত্রই তাঁকে ধারণ করতে হয়েছিল। ফলে তিনি অনেক কিছু তুলতে পারেননি। অনেক ক্ষেত্রে অনেক দৃশ্য ধারণ করতে দেওয়াও হয়নি, কিছু রেস্ট্রিকশনও ছিল। তাঁকে মার্কিন গুপ্তচর হিসেবেও সন্দেহ করা হয়েছিল। বিএসএফ এক রাত তাঁকে হাজতেও রেখেছিল! লেভিন বাধ্য হয়ে 'বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা' বলে যে গানের দলটা ছিল, তাদের সঙ্গে মাস দেড়েক থেকে ১৮-২০ ঘণ্টার মতো ফুটেজ নিয়ে দেশে ফিরে যান। দেশে ফিরে *জয় বাংলা* নামে বাহাত্তর মিনিটের একটা ফিল্ম বানালেও তা প্রচারে আসেনি। অনেক ফুটেজ অব্যবহৃত থেকে যায়।

৩. তারেক মাসুদ, 'লিয়ার লেভিন : আমাদের মুক্তির সারথি', উদ্ধৃত হয়েছে *চলচ্চিত্রকথা* থেকে, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৪-২৫।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৫. তারেক মাসুদ, 'মুক্তির গান-এর গল্প', উদ্ধৃত হয়েছে *চলচ্চিত্রকথা* থেকে, ২০১২, পৃ. ১৯।

৬. ফরহাদ মজহার, 'শোকার্ত পূর্ণিমায় খণ্ড চিন্তা', উদ্ধৃত হয়েছে *তারেক মাসুদ*, অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম থেকে, গবেষক : রুবাইয়াৎ আহমেদ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৩৮।

৭. খন্দকার সাখাওয়াত আলী, 'অন্তরজগৎ, অভিবাসন ও অন্তর্যাত্রা,' *বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, প্রথম বর্ষ, সংখ্যা-০১, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৩।

৮. সাজেদুল আউয়াল, 'মাটির ময়না : একটি "মরমী" চলচ্চিত্রের নাম,' *নতুন দিগন্ত*, প্রথম বর্ষ-চতুর্থ সংখ্যা, সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০৩।

৯. তারেক মাসুদ, 'সত্যজিৎ ও রবীন্দ্রনাথ', উদ্ধৃত হয়েছে *চলচ্চিত্রকথা* থেকে, পৃ. ১০৩।

১০. ফরহাদ মজহার, 'শোকার্ত পূর্ণিমায় খণ্ড চিন্তা,' পৃ. ১৩৯-১৪৩।

১১. সাজেদুল আউয়াল, 'তারেক মাসুদ ও তার লোকচলচ্চিত্র', *কালি ও কলম*, আইস মিডিয়া লিমিটেড, ঢাকা, জুন ২০১২।

১২. তারেক মাসুদ, 'যেভাবে আদম সুরত', উদ্ধৃত হয়েছে *চলচ্চিত্রকথা* থেকে, পৃ. ১৩-১৪।

১৩. তারেক মাসুদ, 'অন্তর্যাত্রা, বহির্যাত্রা : সিনেমা যখন সহযাত্রী', উদ্ধৃত হয়েছে *চলচ্চিত্রকথা* থেকে, পৃ. ৪৫।

১৪. তারেক মাসুদ, 'চলচ্চিত্রের চোখ : বাংলাদেশকে নতুন করে দেখার জন্য', উদ্ধৃত হয়েছে *চলচ্চিত্রকথা* থেকে, পৃ. ১৭২।

১৫. Fahmidul Haq, 'Popular culture as a safeguard against extremism' (Interview with Fahmidul Haq), Forum (The Daily Star), Volume 5, Issue 9, উদ্ধৃত হয়েছে 'তারেক মাসুদের ভাবনা : মাটির ময়না ও রানওয়ে চলচ্চিত্রের বিশ্লেষণ' থেকে, সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, বাদল রহমান স্মারক বক্তৃতা-২০১৩ (অপ্রকাশিত), ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৪।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

১৭. প্রণব ভৌমিক, 'তারেক মাসুদের চলচ্চিত্রে জাতীয় আত্মপরিচয়ের খোঁজ', তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীর স্মারক বক্তৃতা-২০১৩, (অপ্রকাশিত রচনা), ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩/৭।

১৮. তারেক মাসুদ, 'মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র : ব্যতিক্রম ও বিতর্ক', উদ্ধৃত হয়েছে *চলচ্চিত্রকথা* থেকে, পৃ. ১৬৫-১৬৮।

১৯. তারেক মাসুদ, 'অন্তর্যাত্রা, বহির্যাত্রা : সিনেমা যখন সহযাত্রী', উদ্ধৃত হয়েছে *চলচ্চিত্রকথা* থেকে, পৃ. ৪৬

২০. খন্দকার সাখাওয়াত আলী, 'অন্তরজগৎ, অভিবাসন ও অন্তর্যাত্রা', পৃ. ৫৫।

২১. বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় বাংলাদেশ আজ আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সড়ক ধরে হাঁটছে। *অন্তর্যাত্রায়* রফিকের বাবা নাতিকে মানসিক প্রস্তুতি গড়ে দিতে চা-বাগানে কাজ করতে আসা ইউরোপীয়দের কবরখানায় নিয়ে যান। এ কবরখানার এপিটাফগুলো সোহেলের সামনে ঔপনিবেশিকতার প্রেক্ষাপটটি স্পষ্ট করে তোলে। খন্দকার সাখাওয়াত আলী লিখেছেন : 'দাদা বড় সহজভাবে সোহেলের কাছে বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে অভিবাসনের ইতিহাসগত উদাহরণগুলো তুলে ধরেন। এপিটাফ পড়ে সোহেল দেখতে পায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে অনেক ইংরেজ তরুণ এ দেশে কাজ করতে আসে। এরা কাজ করত ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে, চায়ের বাগানসহ প্রশাসনের নানা কাজে। এদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই কম বয়সে মারা গেছে। তাদের সমাধি রয়ে গেছে এ অঞ্চলে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে, তরুণ সম্প্রদায় সব সময় দেশের বাইরে গিয়ে কাজ করে এটাই স্বাভাবিক রীতি, এটাই অর্থনীতি আর সমাজের নিয়ম। চা-বাগানের আদি শ্রমিকেরা এসেছিল উড়িষ্যা থেকে। শ্রমমূল্যের সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে এদের আনা হয়েছিল। আজও শ্রমমূল্যের সুবিধাজনক অবস্থান চা-শিল্প বহন করে চলেছে। বংশপরম্পরায় চা-শ্রমিকদের এই অবস্থান শ্রম দাসত্বের আরেক রূপ। আজ একই জিনিস অন্যভাবে ঘটছে। ইউরোপ, আমেরিকাসহ উন্নত দেশসমূহে তুলনামূলকভাবে শ্রমনির্ভর ও কর্মদক্ষতাসম্পন্ন কাজ করে অভিবাসিত মানুষেরা। এদের কয়েক প্রজন্ম স্থানীয়ভাবে বসবাসের সূত্রে মূলধারার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় এদের ধাপে ধাপে আত্মীকরণ করে নেওয়া হয়েছে। যা বিশ্ব-অর্থব্যবস্থারই একটি অংশ বা অনুষঙ্গ। পরোক্ষভাবে দাদা তার নাতিকে অতীতের এ অভিজ্ঞতা দিয়ে ভবিষ্যতের বাস্তবতাকে গ্রহণের মানসিক প্রস্তুতি তৈরি করে দেন।' আত্মপরিচয় আর জাতিসত্তা নিয়ে টিকে থাকার লড়াইয়ের প্রসঙ্গটিকে তারেক মাসুদ *অন্তর্যাত্রায়* এভাবেই নানা অংশে বিভক্ত করে দক্ষতার সঙ্গে মূল বক্তব্যের কাঠামোর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন।

খন্দকার সাখাওয়াত আলী, 'অন্তরজগৎ, অভিবাসন ও অন্তর্যাত্রা,' পৃ. ৫৭।

২২. সাজেদুল আউয়াল, 'তারেক মাসুদের জীবন, কর্ম ও স্বপ্নের পাঁচালী', *বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল*, পঞ্চম বর্ষ, সংখ্যা-৫, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা, জুন ২০১২।

২৩. সাঈদ ইফতেখার আহমেদ, 'গণজাগরণ মঞ্চ : আত্মপরিচয়ের পুনঃঅনুসন্ধান,' *প্রতিচিন্তা*, অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা-২০১৩, প্রথম আলো, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৪৮।

আইন ও ভাষা

উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা : প্রয়োজনীয়তা ও সীমাবদ্ধতা

মিজানুর রহমান খান

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা রাষ্ট্রের ওপর কোনো সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেনি। সুপ্রিম কোর্টে এখনো ব্যাপক ভিত্তিতে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাষা মানুষের মৌলিক অধিকার। আর সে কারণেই এটি মানবাধিকারের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা চালু করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী এবং চালু করার পক্ষে যুক্তিগুলো কী, তা তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে কেন বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা চালু করা জরুরি। যেসব দেশে ইংরেজি ভাষার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, সেসব যুক্তি কেন বাংলাদেশের বেলায় খাটে না, তা-ও বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : সংবিধান, ভাষা, সুপ্রিম কোর্ট, মামলা, উপমহাদেশীয় দৃষ্টান্ত, আইনি বাংলার অতীত, ভাষা-বিতর্কের প্রাসঙ্গিকতা

প্রারম্ভিক কথা

বিশ্বের নানা দেশের আদালত অঙ্গনের কতিপয় উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক। ২০১০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। মালয়েশীয় সুপ্রিম কোর্টে আনোয়ার ইব্রাহিমের আইনজীবী কারপাল সিং নিবেদন করেন যে ফেডারেল কোর্ট, কোর্ট অব আপিল, হাইকোর্ট এবং অধস্তন আদালতগুলোতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় ক্ষেত্রের মামলার রায়সমূহ বাহাসা মালয়েশিয়ায় লেখা বাধ্যতামূলক। অথচ বিচারপতিরা লিখছেন ইংরেজিতে। আর সে কারণেই তা অবৈধ ও অসাংবিধানিক।[১]

মালয়েশিয়ার ফেডারেল সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদ এবং ১৯৬৩ সালের জাতীয় ভাষা আইনের ৮ ধারা বলেছে, আদালতের রায় বাহাসা মালয়েশিয়ায় লেখা হতে হবে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদের বিরুদ্ধে আনোয়ার ইব্রাহিমের আনা মানহানির মামলায় শুনানিকালে সুপ্রিম কোর্টে এই যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তার আগে ২০০৯ সালের ১০ অক্টোবর তিন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত কোর্ট অব আপিল ভাষাগত কারণে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আনোয়ারের আপিল খারিজ করে দেন। ওই প্যানেল বলেন, আনোয়ার আপিলের যে স্মারক পেশ করেছেন, তা ইংরেজিতে লেখা। আর সে কারণেই তা অবৈধ। আদালতের নথিপত্র বাহাসা মালয়েশিয়ায় হতে হবে। মাহাথির মোহাম্মদের আইনজীবী যুক্তি দেন যে আদালতের আগাম অনুমতি নিয়েই তিনি ইংরেজিতে লিখেছেন। মাহাথিরের আইনজীবী ভি. কে. লিঙ্গম অবশ্য বলেন, আদালতের রায় সর্বদাই বাহাসা মালয়েশিয়ায় হতে হবে।[২] আনোয়ারের আইনজীবীর কথা থেকে বুঝতে পারি, বিষয়টি মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার পর সুপ্রিম কোর্টে তিনিই প্রথম তুলেছিলেন।

২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার গণমাধ্যমে শীর্ষ শিরোনাম হয়েছিল আদালতের কাঠগড়ায় ভাষানীতি। এতে বলা হয়, দক্ষিণ আফ্রিকার ১১টি সরকারি ভাষার মধ্যে কেবল ইংরেজি ও আফ্রিকান আদালতের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাকি নয়টি ভাষাই আদালতের দোভাষীরা অনুবাদ করছেন।[৩]

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান অনুযায়ী, 'সরকারি ভাষা' হিসেবে স্বীকৃতির অর্থ হচ্ছে একজন ব্যক্তি সরকারের সঙ্গে যেমন, তেমনি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আদালতের সঙ্গে সেই ভাষায় যোগাযোগ করার অধিকার রাখেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানের 35(3)(K) ধারায় বলা আছে: 'Every accused person has a right to a fair trial, which includes the right to be tried in a language that the accused person understands or, if that is not practicable, to have the proceedings interpreted in that language.'

প্রকৃতপক্ষে ভাষা ব্যবহারের যে অধিকার, সেটা সরাসরি মানবাধিকারের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং ভাষার অধিকার থেকে মানবাধিকারকে আলাদা করা যাবে না। বাংলাদেশের আদালতের ভাষা বাংলা না ইংরেজি হবে, সে বিষয়টি আমরা বায়ান্নর মহান ভাষা আন্দোলনের আলোকে এতকাল বোঝা ও সে অনুযায়ী প্রতিকার লাভের ব্যর্থ চেষ্টা করেছি। কিন্তু আবেগের জায়গা থেকে না দেখে কেবল মানবাধিকারের জায়গা থেকে দেখেও একটা নির্মোহ আলোচনার সূত্রপাত করা সম্ভব।

১৯৯৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি মামলা হয়েছিল। একজন জুলুভাষী

স্কুলশিক্ষক একটি মোটরযান চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হন। তিনি দাবি করেন যে তাঁর বিচার জুলু ভাষায় হতে হবে। জুলু সংবিধানের অন্যতম তালিকাভুক্ত ভাষা। ভাষার প্রশ্নে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর আবেদন নাকচ করলে তিনি হাইকোর্টে আপিল করেন। হাইকোর্ট তাঁর দণ্ড বহাল রাখেন এই যুক্তিতে যে, যে ব্যক্তি ইংরেজি কিংবা আফ্রিকান ভাষা জানেন, তালিকাভুক্ত অন্য ভাষায় বিচার পাওয়ার অধিকার তাঁর নেই। কিন্তু হাইকোর্ট স্বীকার করেন যে বিচারপ্রার্থী যে ভাষা বোঝেন, সেই ভাষাতেই তিনি বিচার লাভের অধিকার রাখেন। কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁকে অনুবাদ করে দিতে হবে।[৪]

আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনের বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়া হয় যে ইংরেজি তুলে দিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিপদে পড়বে। বিদেশিরা বুঝবে না। শিক্ষার মান পড়ে যাবে, ইংরেজি তুলে দিয়ে এমনিতেই খেসারত দিচ্ছি ইত্যাদি। এদিকটিই মূল আপত্তি। তাই আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি যে আমাদের সীমান্তের বাইরে বিষয়টিকে কীভাবে দেখা হচ্ছে। আবার কতিপয় নিবন্ধের ইঙ্গিত হচ্ছে, ইংরেজি তুলে কেবল বাংলাই চালু করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিচারপ্রার্থী, অনুবাদ ও দোভাষীর মাধ্যমে বিচারক-আইনজীবী সব পক্ষের সন্তুষ্টিকে সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা এখন ইংরেজির পক্ষের যুক্তিগুলো দেখব।

আদালতে ইংরেজি ভাষার পক্ষে যুক্তি

১৯৯৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার হাইকোর্টে আরেকটি মামলা আসে (এস বনাম মাতোমেলা)। এবার আদালতের পুরো রায়সহ গোটা বিচারপ্রক্রিয়াই দেখা গেল ইসিঝোসা ভাষায় লেখা হয়েছে। হাইকোর্ট এই রায় সমুন্নত রাখলেন। এর যুক্তি হচ্ছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে ভাষা বোঝেন, সেই ভাষায় তাঁর বিচার হবে। এখানে লক্ষণীয় যে বিচারক বা আইনজীবী যে ভাষায় সাবলীল, সেই ভাষায় তাঁদের বিচার করার অধিকার কিন্তু স্বীকৃত নয়। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার হাইকোর্টের ওই বিচারক বুঝতে পারলেন যে ভবিষ্যতে অন্য আঞ্চলিক ভাষাভাষীরাও একই অধিকার চাইবে। তখন অনুবাদ ইত্যাদির খরচ বাড়বে। তাই তিনি প্রকারান্তরে ইংরেজির পক্ষে একটি অবিটার বা পর্যবেক্ষণ দিলেন। তিনি বললেন, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়কে আদালতব্যবস্থার জন্য একটি মাত্র ভাষা উদ্ভাবন করতে হবে। সে ভাষা যার যেমনই মাতৃভাষা থাকুক না কেন, সেই ভাষা আদালতের সব কর্মকর্তাও বুঝতে পারবেন। যদিও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবু বোঝা যায় যে এই বিচারক কার্যত ইংরেজির দিকে ইঙ্গিত করেছেন।[৫]

২০০৪ সালে আরেকটি মামলা এল কেপ প্রদেশের হাইকোর্টে। বিচারক ১৯৯৮ সালের ওই মামলার (এস বনাম মাতোমেলা) রায়ের সঙ্গে একমত হয়ে বললেন,

'আমরা যে মামলাটি নিয়ে বিচার করতে বসেছি, সেটি দীর্ঘকাল পড়ে ছিল। কারণ, ইসিঝোসা থেকে ইংরেজি করার লোক ছিল না।' বিচারক মন্তব্য করেন, 'আদালতের একটি মাত্র পরিভাষা প্রচলনের কথা উঠেছে। এটা কেবল অর্থনৈতিকভাবেই লাভজনক নয়, সেটা ন্যায়বিচারের স্বার্থের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি ইংরেজি ইতিমধ্যেই এমন একটি ভাষা, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনে ব্যবহৃত হচ্ছে।'

এখন প্রশ্ন হলো, সংবিধানে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ১১টি ভাষার দেশের বিচারকের এই মন্তব্যের সঙ্গে বাংলাদেশ একাত্ম হতে পারবে কি না। তার দরকার কতটুকু?

পিনার একজন আফ্রিকানভাষী। তিনি ইংরেজি বলতে বা বুঝতে পারেন না। মাদক অপরাধে তিনি দণ্ডিত হয়েছিলেন। সরকার পিনারের জন্য একজন আইনজীবী নিয়োগ করেছিল, যিনি শুধু ইংরেজি বলতে ও বুঝতে পারতেন। অভিযুক্ত তাই এই আইনজীবীকে প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানালেন। এটা ঘটেছিল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে। এই রায়ের রিভিউকালে বিচারক স্বীকার করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তির এমন আইনজীবী নিয়োগের অধিকার আছে, যাঁর সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের ভাষায় কথা বলতে পারবেন, সেটা সরাসরি কিংবা দোভাষীর মাধ্যমেও হতে পারে। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে তাঁর এই অধিকার পরিষ্কার করা হয়নি। সে কারণে তাঁর ন্যায্য বিচারের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট যেহেতু সঠিকভাবে বিবেচনায় নেননি, তাই তাঁকে দোষী সাব্যস্তকরণ ও তাঁর দণ্ড বাতিল করা হয়।

পিনারের মামলার বরাত দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্রি স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচ জি লুবে লিখেছেন, 'নর্দান কেপের শতকরা ৭২ ভাগ মামলা আফ্রিকান ভাষায় পরিচালিত হয়। সেৎছোয়ানা ভাষায় ১৪.৮ ভাগ, ইসিঝোসা ভাষায় ৮.৮ ভাগ এবং ইংরেজি শুধু ১.৪ ভাগ ক্ষেত্রে চলে। জনসংখ্যার বিপুল অংশ ইংরেজি বোঝেন না। তাই এই যুক্তি দেওয়া চলবে না যে আফ্রিকান ভাষায় শুনানি বাস্তবসম্মত নয়। ইংরেজিভাষী ম্যাজিস্ট্রেট ও পিপিদের নিয়োগ করার ফলে বিচার মন্ত্রণালয়ের বিচার বিভাগ এমন জায়গায় চলে গেছে যে আদালতের প্রক্রিয়া থেকে জনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।'[৬]

কানাডার সুপ্রিম কোর্টের প্রতিটি রায় ইংরেজি ও ফরাসিতে অফিশিয়াল রিপোর্টে ছাপানো বাধ্যতামূলক। কানাডীয় আদালতের দেওয়া ১৯৯৯ সালের একটি রায় (*R vs Beaulac 1999*) বিবেচনায় নেওয়া চলে। জঁ ভিক্তর বুলাক একটি হত্যা মামলার আসামি। ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার আদালতে তিনি অনুরোধ করেন যে তিনি এমন একজন বিচারক ও জুরি দেখতে চান, যাঁরা তাঁর মাতৃভাষা

ফরাসিতে কথা বলতে পারবেন। এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়। কারণ, একজন বিচারক সন্তুষ্ট ছিলেন যে অভিযুক্ত যথাযথভাবে না হলেও ইংরেজি বুঝতে পারেন। এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে যায়। সুপ্রিম কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির আপিল গ্রহণ করেন। রায় দেন যে 'ভাষা বেছে নেওয়ার অধিকার অভিযুক্ত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, এটা প্রক্রিয়াগত নয়।' এটা প্রক্রিয়াগত হলে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারতেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শুনানিতে কানাডীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, 'ভাষার অধিকার সব মামলার ক্ষেত্রে অবশ্যই "নিষ্ঠার সঙ্গে" ব্যাখ্যা করতে হবে। এটা কানাডার ভাষা কমিউনিটির উন্নয়ন ও সংরক্ষণ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ভাষা অধিকার নেতিবাচক কিংবা পরোক্ষ অধিকার নয়।' ১৯৮৬ সালে 'ম্যাকডোনাল্ড বনাম সিটি অব মন্ট্রিল' মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারক আদালতে ভাষার অধিকার একটি রাজনৈতিক আপস এবং তাই তাকে রক্ষণশীলতার সঙ্গে দেখা উচিত বলে মত দিয়েছিলেন। ১৩ বছরের ব্যবধানে তাঁরা মত পাল্টে বলেন, ভাষা একটি নিরঙ্কুশ অধিকার।[৭]

বুলাকের মামলায় বিচারপতি বাস্তারাক বলেছেন, 'ভাষা ব্যক্তির অভিব্যক্তির উপায়ের সঙ্গে এতটাই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত যে যদি কাউকে তাঁর নিজের ভাষায় কথা বলতে না দেওয়া হয়, তাহলে সত্যিকার অর্থে বাকস্বাধীনতা মিলতে পারে না।' বিচারপতি বাস্তারাক কানাডার উচ্চ আদালতে সংখ্যালঘুর মাতৃভাষা অধিকার প্রতিষ্ঠায় একজন পথিকৃৎ। তিনি ওই রায়ে বলেন, ভাষার সাহায্যে মানুষ তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ, তার পরিচিতি এবং স্বতন্ত্রবোধেরও প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে।

কানাডায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হতে হলে তাঁকে দোভাষীর সাহায্য ছাড়াই ইংরেজি ও ফরাসি জানার শর্ত পূরণ করতে হয় না। যদিও কানাডার অন্যান্য ফেডারেল বিচারকের সব পদে দুই ভাষায় সমান পারদর্শিতা থাকা পূর্বশর্ত। বাংলাদেশে ঠিক কোন ভাষার দখল যাচাই করা হয়, তা অনুমান করা এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই মুহূর্তে কানাডার সংসদে পাঁচটি বিল বিবেচনাধীন, যাতে সুপ্রিম কোর্টে বিচারক হতে দুই ভাষাতেই দোভাষী ছাড়া কাজ চালাতে যোগ্যতা অর্জনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে ইংরেজির পক্ষে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়, তা অন্য কোনো সমাজে আপাতত পাওয়া যায় না। অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতার কারণে আমরা এই তর্কটা একেবারে নাকচ করি না। তবে এর প্রবক্তাদের জবানি থেকে আমরা অন্যান্য দেশের আদালতের ভাষাসংক্রান্ত অভিজ্ঞতার বিষয়টি ভাগাভাগি করে নিতে চাই।

হংকংয়ের আইনে বলা আছে, একজন বিচারক, হাকিম কিংবা অন্য বিচারিক

কর্মকর্তা যেমনটা মনে করেন, তেমন বিবেচনায় সরকারি ভাষা নির্দিষ্ট করে নিতে পারেন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সম্প্রতি তুরস্কের পার্লামেন্ট আদালতের ভাষা হিসেবে কুর্দি মেনে নিয়েছে। তুরস্কের সংখ্যালঘু কুর্দিরা দীর্ঘদিন ধরে আদালতে কুর্দি ভাষায় বক্তব্য পেশের অধিকার চেয়ে আসছিল। এত দিন পর্যন্ত কুর্দিদের তুর্কি ভাষায় আদালতে কথা বলতে হতো।[৮]

উপমহাদেশীয় দৃষ্টান্ত

এবার উপমহাদেশের দিকে নজর দেওয়া যাক। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯। বিকেল চারটা। ভারতীয় গণপরিষদের অধিবেশনের সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন, ভাষা অনুচ্ছেদটি এক মস্ত ব্যতিক্রম। এতে ৩০০-এর বেশি সংশোধনী পড়েছে। ওই দিনের মূল বক্তা এন গোপালস্বামী আয়াঙ্গার বলেন, এই প্রশ্নে মতামত সব সময় সর্বসম্মত হয় না। আমাদের এমন একটি অভিন্ন ভাষা বেছে নিতে হবে, যা হবে সর্বভারতীয়। উচ্চ আদালতের ভাষা 'আরও বহু বছর' ইংরেজি থাকবে। হিন্দি যথামর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজি চালিয়ে নিতে হবে। হিন্দি আমরা নেব, সেটা কেবল ভারতীয় ভাষা বলে নয়, নেব এ কারণে যে তত দিনে হিন্দি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হবে, যেমন আজ হয়েছে ইংরেজি।[৯]

কিছুকাল আগে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে একজন ইন্টারভেনর শুনানিকালে হিন্দিতে বক্তব্য দিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষের আইনজীবী আপত্তি তুললেন। বললেন, হিন্দি বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয়। সুপ্রিম কোর্ট তখন ওই ইন্টারভেনরকে তিনটি বিকল্প দেন। ১. ইংরেজিতে কথা বলা ২. আইনজীবী নিয়োগ ৩. কিংবা ইংরেজিতে লিখিত বক্তব্য প্রদান। কিন্তু এর কোনোটাই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। এরপর সুপ্রিম কোর্ট আদালতের ভাষা ইংরেজি হওয়ার যুক্তিতে তাঁর ইন্টারভেনশন বাতিল করেন। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রজ বি কাছেরু ও অধ্যাপক যমুনা কাছেরু এবং নিউইয়র্কের স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এস এম শ্রীধর *ল্যাঙ্গুয়েজ ইন সাউথ এশিয়া* (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮) শীর্ষক বইয়ের ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এ ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেন, এটা একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় যে মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী এবং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহরুর জোরালো সমর্থন সত্ত্বেও হিন্দি সরকারি ভাষা হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি পায়নি।

পাকিস্তানের যে মহানায়ক (জিন্নাহ) বারুদে অগ্নিসংযোগ করে বলেছিলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, সেই দেশটির উচ্চ আদালতের ভাষা আজও কিন্তু রয়ে গেছে ইংরেজি। উর্দু সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। সামরিক শাসন থেকে শুরু করে নানা ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক ধারা আমরা পাকিস্তানের কাছ থেকে পেয়েছি। অর্থাৎ তুলনাটা বেশ ভালোভাবেই করতে পারি। অনেক মন্দ

কিছুর সঙ্গে খাপে খাপ মিলে যায়। এবার অবাক হয়ে দেখলাম, এখানেও কী অদ্ভুত মিল! আমাদের আদালতেও বাংলা ভাষায় আরজি লেখার দরখাস্ত খারিজ হয়। পাকিস্তানের আদালতেও উর্দুকে সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণার দরখাস্ত বাতিল হয়। সানাউল্লাহ নামের এক ব্যক্তি লাহোর হাইকোর্টে একটি পিটিশন দায়ের করেছিলেন। তাঁর নিবেদন ছিল : 'জাতির জনক কায়েদ-ই-আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এক ছাত্র সমাবেশে ঘোষণা করেছিলেন, উর্দু হবে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা। ৬৪ বছর কেটে গেল, সেটা করা হলো না। বরং ইংরেজিকে করা হলো সরকারি ভাষা।' ২০০১ সালের অক্টোবরে ওই মামলাটি যখন কার্যতালিকায় এল, তখন আবেদনকারী বা তাঁর আইনজীবীকে আদালত দেখতে পাননি। সে কারণে লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি খাজা মুহাম্মদ শরিফ আবেদনটি খারিজ করেন।

২০০৩ সালের ১৮ নভেম্বর সিন্ধু হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে ইংরেজির পরিবর্তে উর্দু প্রতিস্থাপনের সাংবিধানিক ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা জানানোর নির্দেশ দেন। আবেদনকারী আদালতে বলেন, উর্দু পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা। ১৯৭৩ সালের ১৪ আগস্ট থেকে ১৫ বছরের মধ্যে আদালতের ভাষা উর্দু করতে সংবিধানে ঘোষণা ছিল। ১৯৮৮ সালের ১৫ আগস্ট এই সময় উত্তীর্ণ হলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী সৈয়দ তারিক আলী আদালতে বলেন, অন্তত তিনটি প্রদেশে সরকারি ভাষা হিসেবে উর্দু ব্যবহৃত হচ্ছে। এই অঞ্চলের আদালতগুলোতেও উর্দুতে আবেদন-নিবেদন করা যাচ্ছে। জাতীয় ভাষা কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সংগঠন কাজ করছে। সরকার সম্প্রতি একটি উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে এবং উর্দুর উন্নয়নে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।[১০]

আদালত চাইলে এ রকম বিষয়ে স্বপ্রণোদিত হয়ে কোনো আদেশ দিতে পারেন। কারণ, প্রশ্নটির সঙ্গে জনস্বার্থ ও জনগণের মৌলিক অধিকারের নাড়ির সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু তাঁরা তা দেননি। যেমন বাংলাদেশে আদালত জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ে সুয়োমোটো রুল দিচ্ছেন। কিন্তু এরশাদের আমলে করা ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইনের প্রয়োগহীনতা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহারের জন্য জারি করা পরিপত্রে বলা হয়েছিল, সব সরকারি অফিসে বাংলা চলবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু আদালত ছিলেন এর বাইরে। কারণ, তাঁরা সরকারি অফিস নন। কিন্তু অন্য বহু ক্ষেত্রে দেখি, আদালত প্রশাসন 'সরকারি' শব্দের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করেন না। তথ্য অধিকার আইনে বর্ণিত 'সাংবিধানিক সংস্থা'র মধ্যে তাঁরা পড়েন কি পড়েন না, এ নিয়ে তাঁরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছেন বলেই প্রতীয়মান হয়। অবশ্য

১৯৮৭ সালের আইনে আদালত শব্দটি আছে। কিন্তু 'উচ্চ আদালত' বলা নেই।

মাননীয় বিচারপতি কাজী এবাদুল হক ও বিচারপতি কে এম ফজলুর রহমান প্রমুখ বাংলায় রায় লিখে মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। কিন্তু তাঁরা এখনো ভীষণ সংখ্যালঘু। সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক বলেছেন, ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলার রায় বাংলায় লিখতে গিয়ে তাঁর সময় একটু বেশি লেগেছিল। কিন্তু তবু তিনি সেটা করেছেন, কারণ চায়ের দোকানে, চুলার পাশে বসেও সাধারণ মানুষ যাতে এই রায়ের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। বুঝতে পারেন। তিনি বাংলায় রায় লেখার কারণ সম্পর্কে জন মার্শালকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'the judicial department comes home in its effects to every man's fireside: বাক্যটি পুরো তিনি দেননি। এরপর লেখা: passes on his property, his reputation, his life, his all.

ইংরেজিতে রায় লেখার কারণে বিচারপ্রার্থী জনগণ বুঝতেই পারেন না যে একটি রায় কীভাবে তাঁর জীবন ও পরিমণ্ডলের সবকিছুকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু আমাদের কজন ফাঁসির আসামি রায় পড়ে বা বুঝে মরতে পারছেন, এর উত্তর উচ্চ আদালতকেই দিতে হবে। আবেগের জায়গা থেকে নয়, বরং বিচারপ্রার্থী জনগণের বোধগম্য একটি ভাষা হিসেবে বিবেচনায় নিয়েও এটা করতে হবে। বিচারপতি খায়রুল হকের রায়ের আলোকে এটা বলা কি অতিরঞ্জিত হবে যে আমাদের উচ্চ আদালতের রায় বা কার্যক্রম এখনো পর্যন্ত প্রধানত বিচারক ও আইনজীবীর চেম্বারকেন্দ্রিক রয়ে গেছে? এটা এখনো ফায়ারসাইড বা চুলার পাশে পৌঁছায়নি। আমাদের ভাবতে ভালো লাগত, যদি দেখা যেত যে, কেবল আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখেই ইংরেজিতে রায় লেখা হচ্ছে। বরং মনে হচ্ছে, বাংলাকে যেন প্রবেশই করতে দেওয়া হবে না এমন একটি মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। সে কারণেই কি বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলছেন যে সংসদ না চাইলে উচ্চ আদালতে বাংলা ঢুকবে না?

ভারত ও পাকিস্তানের মতো নয় কিন্তু আমাদের সংবিধান। বাংলাদেশ সংবিধানের সাধারণ ঘোষণা: প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। ব্যস এটুকুই। পৃথিবীর বুকে আমরা নিজেদের গর্ব করে বলি: ১৯৭১ সালে আমরা রক্তস্নান করে স্বাধীনতার যে সূর্য ছিনিয়ে এনেছি, সেটার ভ্রূণ নিহিত ছিল বায়ান্নর গর্ভে। ভাষা থেকে স্বাধীনতা। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস ঘোষণাকালে ইউনেসকোর ঢাকার আবাসিক প্রতিনিধি আমাকে বলেছিলেন, 'আপনাদের এই দাবি ঠিক নয় যে মাতৃভাষার জন্য কেবল আপনারাই রক্ত দিয়েছেন। নজির আরও আছে।' কিন্তু ভাষার প্রশ্ন থেকে জাতিসত্তার বিকাশ এবং সেখান থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণের ইতিহাস এই ধরিত্রীতে আর কারও দ্বারা সাধিত হয়েছে বলে জানা নেই।

ভারতের অভিজ্ঞতা হতে পারে আমাদের মূল আকর্ষণ। কারণ, কেন্দ্রীয় ভারতের কোনো একক রাষ্ট্রভাষা নেই। সেটা না থাকা সত্ত্বেও সেখানে ভেতরে ভেতরে কী ঘটছে, সেটা আমাদের জানা দরকার।

২০১০ সালের ২৫ জানুয়ারি *টাইমস অব ইন্ডিয়ার* একটি খবর ছিল এ রকম: 'ভারতের কি কোনো জাতীয় ভাষা রয়েছে?' গুজরাট হাইকোর্ট উত্তর দিয়েছেন, না। আদালত অবশ্য বলেছেন, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হিন্দিকে তাদের ভাষা হিসেবে মেনে নিয়েছে। অনেকেই হিন্দিতে কথা বলে, দেবনাগরিতে লেখে। কিন্তু হিন্দি তাই বলে ভারতের জাতীয় ভাষা নয়।

প্রধান বিচারপতি এস জে মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ এ রকম নির্দেশনা দিতে বেঁকে বসেন যে ভারতীয় সব পণ্যের মোড়কে হিন্দি লেখা থাকতেই হবে। ২০০৯ সালে সুরেশ কাচাদিয়া জনস্বার্থে একটি মামলা করেছিলেন। তিনি নির্দেশনা চেয়েছিলেন যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার যেন এ রকম নির্দেশ দেন, যাতে রাজ্য সরকারগুলো এটা নিশ্চিত করে যে যেখানে যত পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে, তার মোড়কে দরকারি তথ্যাদি হিন্দিতে লেখা থাকতে হবে। তাঁর যুক্তি ছিল ভোক্তারা এটা জানতে অধিকারপ্রাপ্ত যে তাঁরা কী বস্তু ভোগ করছেন। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল হিন্দি যেহেতু জাতীয় ভাষা এবং অধিকাংশ মানুষ সে ভাষাটা বুঝতে পারেন, সুতরাং বিস্তারিত লেখার বাধ্যবাধকতা হিন্দিতেই আরোপ করা হোক। আদালতের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো পক্ষই অবশ্য এটা দেখাতে পারেনি যে ভারতের ইতিহাসে হিন্দিকে কখনো জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানে হিন্দিকে 'সরকারি' ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 'জাতীয়' ভাষার নয়। আদালত তাঁর উপসংহারে বলেন যে বিদ্যমান বিধিতে উৎপাদনকারীদের বলা হয়েছে যে তাঁরা পণ্য সম্পর্কে প্যাকেটে হিন্দি অথবা ইংরেজিতে লিখবেন। সুতরাং যাঁরা ইংরেজিতে লিখছেন, সেটা তাঁদের অধিকার। সে কারণে তাঁদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যায় না।[১১]

২০১০ সালের ২৫ এপ্রিল *দ্য হিন্দু* পত্রিকায় একটি খবরের শিরোনাম ছিল তামিলকে হাইকোর্টের ভাষায় পরিণত করার দাবির ব্যাপারে। চেন্নাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী এম করুণানিধি সুপ্রিম কোর্ট এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টকে আহ্বান জানান যে তামিলকে যাতে উচ্চ আদালতের ভাষায় পরিণত করা হয়। তাঁর কথায়, আমরা সুপ্রিম কোর্টেও তামিল ভাষা শুনতে চাই। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মাদ্রাজ হাইকোর্টের ভাষা হোক তামিল। এবং এই উদ্দেশ্য অর্জনে বিচারকেরা যেন উদ্যোগ নেন। ভারতের সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা বি আর আম্বেদকারের ভাস্কর্য উন্মোচন উপলক্ষে অনুষ্ঠান হয়। এ সময় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পি সত্যশিবম, মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এইচ এল গোখলে এবং বিচারপতি এফ এম

ইব্রাহিম কলিফুল্লাহ তামিল ভাষায় সেখানে বক্তব্য দেন। অবশ্য তামিলনাড়ুতে তামিল ভাষা আদালতে চালুর জন্য প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছে। আদালতে তামিল ভাষার জন্য গণ-অনশনও হয়ে গেছে। জয়ললিতাসহ সব বড় নেতাই রাষ্ট্রপতির কাছে এ জন্য ধরনা দিয়েছেন। ২০১০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর চেন্নাইয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সালমান খুরশিদ আদালতের ভাষা হিসেবে তামিল চালুর বিষয়টি সমর্থন করেন। তিনি বলেন, উচ্চ আদালতে তামিল চালুর আগে নিম্ন আদালতে প্রথমে রায়ের মূল বিষয়বস্তু তামিল ভাষায় লেখা বাধ্যতামূলক করা হোক। তিনি এ জন্য তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে অনুবাদক নিয়োগেরও পরামর্শ দেন।[১২]

আদালতে আঞ্চলিক ভাষা, মানে মাতৃভাষা চালুর দাবিতে সারা ভারতে যে মনোভাব দিন দিন প্রকাশ পাচ্ছে এবং সাফল্যও আসছে, তাতে একদিন কলকাতা হাইকোর্টেও বাংলা আসবে। সেদিনও ঢাকার হাইকোর্ট ভবিষ্যতের কলকাতাকে অনুসরণ করতে পারার সক্ষমতা অর্জন করবে কি না, সেটা হলফ করে বলা যায় না। কারণ তেমন কোনো প্রস্তুতি নেই। ভারতের আদালতে মাতৃভাষায় তৃষ্ণা মেটানোর প্রবণতা বাড়ছেই। যদিও কেন্দ্রীয় ভারত সরকার ও ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এখনো ইংরেজিতে অটল।

২০১০ সালের ২৩ জুন ভারতের সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয় যে হাইকোর্টগুলোতে আঞ্চলিক ভাষা চালু করতে হবে। এ জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্দেশনা চেয়ে ওই আবেদন করা হয়। অল ইন্ডিয়া জুনিয়র অ্যাডভোকেট অ্যাসোসিয়েশন হলো এই মামলার আবেদনকারী। সমিতি বলেছে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোতে উচ্চ আদালতে আঞ্চলিক ভাষার প্রচলন ঘটাতে হবে। আর একই সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা থেকে একযোগে ইংরেজি ভাষায় তা অনুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে।

ওই সমিতির সভাপতি এন রাজা রমন বলেছেন, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের হাইকোর্টে ইতিমধ্যেই হিন্দি ভাষার প্রচলন ঘটেছে। এখন যদি একই ধরনের সুবিধা অন্য রাজ্যগুলোর হাইকোর্টের জন্য নিশ্চিত না করা হয়, তাহলে তা হবে বৈষম্যমূলক। মৌলিক অধিকার ভোগের সমতা এবং বাকস্বাধীনতার সমতার যে নীতি, তার লঙ্ঘন ঘটবে। পিটিশনে আরও উল্লেখ করা হয়, আঞ্চলিক ভাষায় যদি আদালতে সওয়াল-জবাব ও শুনানি করতে না দেওয়া হয়, তাহলে ওই চারটি রাজ্যের তুলনায় তারা আইনের সমতার নীতি থেকেও বিচ্যুত হবে।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট ২০১১ সালে তাঁর আদালতে অনুবাদকাজের জন্য আটজন অনুবাদককে নিয়োগ দিয়েছেন। সবাই মুসলমান। তবে রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া বইলেও আমরা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এখনো ইংরেজি প্রশ্নে আপসহীন অবস্থা দেখি। ভারতের সাবেক প্রধান বিচারপতি বালাকৃষ্ণাণের যুক্তি: এখনো সময় আসেনি।

হিন্দিকে আরও সমৃদ্ধ ও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে হবে। সুপ্রিম কোর্টে একটি অভিন্ন ভাষা থাকতে হবে। একাধিক আঞ্চলিক ভাষা চালুর সুযোগ এখানে নেই।

লক্ষণীয় যে এই সাবেক প্রধান বিচারপতি কিন্তু যুক্তি দেননি যে ইংরেজি ছাড়লে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে। তিনি হিন্দি পরিভাষার ওপর জোর দিয়েছেন। আবার এটাও সত্য যে ভিন্নমত সত্ত্বেও ভারতের চারটি অঙ্গরাজ্যের উচ্চ আদালতের ভাষা হিসেবে ইংরেজির পরিবর্তে মাতৃভাষা ঠাঁই করে নিয়েছে।[১৩]

আইনি বাংলার অতীত

আইনি বাংলা গদ্যরীতির পথিকৃৎ জনাথন ডানকান। আদালতের ভাষা ও তাঁর রায় আদেশ ডিক্রি ইত্যাদির সঙ্গে সুশাসনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রায় ২৫০ বছর আগে ইংরেজরা এই সহজ জিনিসটা বুঝেছিলেন। কিন্তু বাঙালি হিসেবে আমরা আজও তা বুঝতে চাই না। সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশরা বিচারকার্যে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে শুরু করে। কিন্তু ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জন্য সরকারিভাবে মোগলদের দেওয়ানি পদ গ্রহণের পরেই কেবল তাঁরা আনুষ্ঠানিক বিচারকার্যে মনোনিবেশ করেন। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর হিসেবে দায়িত্বভার নিয়েই বিচারব্যবস্থা ও কোন আইন কীভাবে প্রয়োগ করা হবে, সে বিষয়ে মনোযোগ দেন। এখানেও দেখা যায়, আইন কোথায়, কীভাবে ব্যবহৃত হবে, তা নির্ধারণে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্যতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হেস্টিংস ও তাঁর সতীর্থদের মূলমন্ত্র ছিল, তাঁরা ব্রিটিশ কমন ল ভারতীয় জনগণের ওপর চাপিয়ে দেবেন না।[১৪]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের শিক্ষক মিনা ড্যান তাঁর এক নিবন্ধে[১৫] দেখান যে আজকের যে পরিশীলিত বাংলা গদ্যরীতি, তা ডানকান উদ্ভাবিত আইনি গদ্যরীতির কাছে ঋণী। কারণ, তিনি যখন বাংলায় আইন রচনায় হাত দেন, তখন তাঁর সামনে অনুসরণ করার মতো কিছুই ছিল না। পরে সাধারণের জন্য গদ্য রচয়িতারা তাই তাঁকেই অনুসরণ করেন।

১৭৯৫ সালে বোম্বের গভর্নর হয়েছিলেন ডানকান। ১৭৮৫ সালে তিনি প্রথম বাংলায় আইনি গ্রন্থের সূচনা করেন। একই সময়ে আইনি বাংলার আরেক দিকপাল ছিলেন প্রাচ্যবাদী হেনরি পিটস ফস্টার। ১৭৮৩ সালের ৭ আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা সার্ভিসে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তিনি চব্বিশ পরগনার দেওয়ানি আদালতের রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন ১৭৯৪ সালে। তাঁকে বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান রচয়িতার সম্মান দেওয়া হয়। তাঁর বইয়ের প্রথম অংশ 'ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি ভোকাবুলারি' ১৭৯৯ সালে কলকাতায় প্রকাশ পায়। এই বইয়ের ভূমিকায় বলা হয়েছে, এই কাজ রাজনৈতিক ও সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ ছাড়াও

নানাবিধ বাস্তব কারণে গৃহীত হয়েছে।[১৬]

সেই সময় সরকারিভাবে বাংলা একটি অপ্রচলিত ও অননুমোদিত মাতৃভাষা ছিল। তখন আদালতের ভাষা ছিল ফারসি এবং সেটা ক্রমাগতভাবে বাংলাভাষীদের জন্য ছিল দুর্বোধ্য। তখন ফস্টার তাঁর ইউরোপীয় বন্ধু কেরি, মার্শম্যান এবং শ্রীরামপুরের অন্যান্য মিশনারি এবং আইনজীবী রামমোহন রায় ও তাঁর বন্ধুদের সহযোগিতায় বাংলা প্রসারে সচেষ্ট হন। তাঁদেরই উদ্যোগে প্রেসিডেন্সির সরকারি ভাষা হয়েছিল বাংলা। ১৮০২ সালের ২৬ আগস্ট কলকাতা গেজেটে 'বেঙ্গলি ভোকাবুলারি' বিষয়ে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল।

১৮৮১ সালে *বঙ্গদর্শনে* বাংলা ভাষার ওপর প্রকাশিত এক নিবন্ধে মানবতাবাদী পণ্ডিত ও লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তিন ধরনের বাংলা গদ্যের উল্লেখ করেছিলেন। ফারসি-ঘেঁষা বাংলা, সংস্কৃতজাত বাংলা ও ইংরেজি-ঘেঁষা বাংলা। এটা দেখার বিষয় যে বাংলা যখন একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষা হিসেবেই বিকশিত হয়নি, তখন আইনি বাংলা জনগণের মনে স্থান পেয়েছে। আর এখন বলা হচ্ছে, আইনি বাংলা অধিকতর জটিল। অনুবাদক পাওয়া যায় না।

১৭৪৩ সালে পর্তুগিজ মিশনারি ম্যানুয়েল দি আসুম্পশাঁও তাঁর *বাংলা ব্যাকরণ* গ্রন্থে লিখেছিলেন, বাংলা একটি শুদ্ধ ভাষা নয়। এটি হিন্দুস্তানি ও সংস্কৃতের মিশ্রণ। ১৭৭৮ সালে নেথানিয়েল হ্যালহেড প্রথম প্রকাশ করেন তাঁর *গ্রামার অব দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ*। এর ভূমিকায় হ্যালহেড বলেন, 'বাংলা ভূখণ্ড বহু রকমের রাজনৈতিক বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেছে। এর ফলে তার ভাষার সারল্য দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'[১৭]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনা ড্যান লিখেছেন, '১৭৮৫ সাল থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত আইনের অসংখ্য বাংলা বই বেরিয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগের আগে ভারতীয় আইনের সূত্র ছিল হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, ইসলামি ধর্মগ্রন্থ এবং স্বৈরশাসকদের খেয়াল-খুশি।' বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা ফৌজদার, দারোগা, কোতোয়াল, দেওয়ান, কানুনগো, কাজি, নাজির ইত্যাদি পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন। সরকারি ভাষা ছিল ফারসি। ১৬৬১ সাল থেকে ক্রমাগতভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিরোধ ভারতের মাটিতে ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করতে থাকে। তারা দেওয়ানি আদালত, ফৌজদারি আদালত, কালেক্টর অফিস কিংবা কাছারি, মেয়রের আদালত ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৭৫ সালের জানুয়ারিতে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় সুপ্রিম কোর্ট।

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস আইন কোষ সংকলনের জন্য সংস্কৃত ভাষার ২০টি শাখায় দক্ষ ১১ জন বাঙালি পণ্ডিত নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। এতে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত হিন্দু ও মুসলিম আইনগুলো সংকলন করা হয়েছিল।

পণ্ডিতেরা বাংলা মাধ্যম থেকে ফারসিতে অনুবাদ করেন। এরপর ফারসি থেকে ১৭৭৬ সালে এই আইনকোষ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড। এটা ইতিহাসে জেন্টু (হিন্দু) কোড হিসেবে পরিচিত। এই সংস্করণে ফারসি ও বাংলা প্রতিশব্দের সারণি তৈরি করা হয়েছিল। হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মারকো ওয়েন লিখেছেন, ওই আইনকোষে ভুলত্রুটি ছিল। কিন্তু সেটা ছিল বাস্তবসম্মত একটি ডাইজেস্ট। সে কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীজুড়ে এটা চলেছে। মন্দ অনুবাদ বলে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ, তা মানুষের দরকার মিটিয়েছে।[১৮] এখানে দেখার বিষয় হলো, বাঙালির কাছে পৌঁছাতে বিদেশি শাসকেরা সংস্কৃত থেকে ফারসিতে অনুবাদ করার মাধ্যমে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, যাতে করে স্থানীয় আইনকানুন ও জনগণের স্পর্শকাতর বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পারেন। কিন্তু আড়াই শ বছর পর স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকেরা ব্রিটিশদের করে যাওয়া সেই আইনি বাংলার সমৃদ্ধির যুগেও অনুবাদ করতে নারাজ। আমাদের সুপ্রিম কোর্ট পরিভাষার ঘাটতির যুক্তি দেন। কিন্তু তাঁরা কি কখনো ব্রিটিশদের মূল বাংলা পাণ্ডুলিপি খতিয়ে দেখেছেন?

এরপরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে সবার আগে, ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয় জনাথন ডানকানের *রেগুলেশনস ফর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস ইন দ্য কোর্স অব দেওয়ানি আদালত*, এরপর ১৭৯১ সালে নেইল বেঞ্জামিন অ্যাডমান্ডস্টোন বের করেন *বেঙ্গল ট্রান্সলেশন অব রেগুলেশন ফর দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস*। এটা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ফৌজদারি আদালত পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করা হয়। ১৭৯৩ সালে হেনরি পিটস ফস্টার গভর্নর *রেগুলেশন ফর ১৭৯৩* প্রকাশ করেন। ইংরেজ কর্মকর্তারা বাংলা শিখে তাঁরা জনগণের শাসনের ভাষা বাংলায় বের করেছিলেন। মিনা ড্যানের বর্ণনায় কাজটি করতে গিয়ে জনাথন ডানকান অন্তত তিন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছিলেন। প্রথমত, ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদে তিনি কোনো সহায়তা পাননি। কারণ, তিনিই ছিলেন এর স্রষ্টা। দ্বিতীয়ত, তাঁকে বাংলা গদ্যরীতি সৃষ্টি করতে হয়েছিল। তৃতীয়ত, আইনি ভাষা এমনিতেই জটিল ছিল। ফলে এটাকে জনগণের কাছে বোধগম্য করে তোলাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রথম তিনটি গ্রন্থ অনুবাদের মধ্যে প্রথম এবং তৃতীয়টি দ্বিতীয়টির তুলনায় অনেক বেশি সাফল্য বয়ে এনেছিল। দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থ বাংলা গদ্যরীতিতে সাবলীল হতে না পারায় অনুবাদক ফারসির ওপর যথেষ্ট নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। ফারসি ছিল তখন প্রদেশের ভাষা। আর এই অনুবাদ গ্রন্থ বর্তমানেও উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। আইনের পরিভাষায় ফারসি ও আরবির ছড়াছড়ি।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভাষা-বিতর্কের প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশে আইনের পরিভাষা তৈরির সরকারি উদ্যোগ কোথায়? ১৯৯৮ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে গঠিত 'বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ' কখনো আইন আদালত প্রসঙ্গ মুখে তুলেছে বলে জানা যায় না। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সরকারি ভাষা নামে একটি বিভাগ আছে। ১৯৭৬ সালে ভারতীয় সংসদে প্রথম সরকারি ভাষাবিষয়ক সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়। ১৯৬৩ সালে পাস হয়েছিল সরকারি ভাষা আইন। ওই আইনের ৪(১) ধারার আওতায় গঠিত সংসদীয় কমিটি তার এক প্রতিবেদনে আইনের ক্ষেত্রে হিন্দি প্রচলনের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করে। এরপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে মতামত নেওয়া হয়। সংসদীয় কমিটি সংবিধানের ৩৪৮ অনুচ্ছেদ সংশোধনের সুপারিশ করে। যুক্তি দেওয়া হয় যে ওই অনুচ্ছেদ সংশোধন হলে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগ প্রতিটি আইনের মূল খসড়া হিন্দিতে করতে পারবে। এ ছাড়া ৩৪৮ অনুচ্ছেদ সংশোধনের পর সুপ্রিম কোর্টকে বলতে হবে, যাতে তাঁরা তাঁদের রায়, আদেশ, ডিক্রি ইত্যাদি হিন্দিতে দেওয়া শুরু করেন। তাহলে সরকারি বিভিন্ন বিভাগ, যাঁরা বিচারিক বা আধা বিচারিক কাজের সঙ্গে জড়িত, তাঁরা হিন্দিতে আদেশ দিতে পারবেন। বর্তমানে এসব সরকারি বিভাগ হিন্দিতে আদেশ দিতে অক্ষম। কারণ, তাঁদের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট/ সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে হলে তা ইংরেজিতে করা বাধ্যতামূলক। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি এই সুপারিশ পেয়ে এ বিষয়ে আইন কমিশনের মতামত নেন। এরপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগে পাঠান।

আইন কমিশন সংসদীয় কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে মতামত জানতে চেয়ে বিশিষ্ট আইনবিদ, বিশেষ করে কয়েকজন সাবেক বিচারপতি ও জ্যেষ্ঠ আইনজীবীর কাছে তা পাঠায়। ভারতের সাবেক প্রধান বিচারপতি ওয়াই ভি চন্দ্রচুড বলেন, 'আমি আদালতে হিন্দি প্রচলনের বিরোধী। সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের রায় হিন্দিতে চলবে না। কারণ, এসব আদালতের বিচারকেরা সারা ভারত থেকে আসেন। তাঁরা হিন্দির সঙ্গে পরিচিত নন। নতুন প্রজন্মকে ইংরেজির সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।'[১৯] বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের জন্য এ ধরনের যুক্তি গ্রহণযোগ্য বা প্রাসঙ্গিক নয়।

বিচারপতি এস নটরাজন অবশ্য বলেন, 'যতই সদিচ্ছা থাক বাস্তবতা হলো, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের মানুষ আইনের ভাষা হিন্দি হওয়া পছন্দ করবেন না। বহু আইনজীবী হিন্দিই জানেন না। তাঁদের ইংরেজি অনুবাদের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। বিশ্ব চলে ইংরেজিতে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের আদালতও ভারতের আদালতের রায় উদ্ধৃত করে। উপরন্তু ভাষাগত উগ্র স্বদেশিদের জন্য ভারতের

ঐক্য ও অখণ্ডতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য।'[২০]

বিচারপতি ডি টি টমাস যুক্তি দেন, ইংরেজি ভারতীয় বিচারব্যবস্থার জন্য এক ঐতিহাসিক অর্জন। কারণ, বিশ্বব্যাপী বিচার বিভাগের ভাষা হলো ইংরেজি। তা ছাড়া বাস্তব কারণ, দক্ষিণ ভারতের হাইকোর্টগুলোর ৯০ শতাংশ আইনজীবী হিন্দি জানেন না। হিন্দি জানা একজন স্টেনোগ্রাফারও সেখানে পাওয়া যাবে না। সব আইনি সাময়িকী ও বইপুস্তক ইংরেজিতে লেখা। অনুবাদ করতে কোটি কোটি টাকা খরচ হবে। সারা ভারতে রাজনৈতিক ও আইনি অস্থিরতা তৈরি হবে, যা এড়ানো যাবে না।[২১]

বিচারপতি কে জগন্নাথ শেঠি শুধু ইংরেজিতেই ভবিষ্যৎ দেখেন। তিনি বলেন, 'দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে প্রশাসন আঞ্চলিক ভাষায় আদেশ দেয়। আদালত চলে ইংরেজিতে। আজ ইংরেজি কোনো বিদেশি ভাষা নয়।'[২২] কিন্তু আমাদের জন্য এসব কথা এতটা জোরালোভাবে কি খাটে? আমাদের সব আইনজীবী ও বিচারক যাঁরা ইংরেজিতে অনলবর্ষী, তাঁরাও বাংলা বলতে ও বুঝতে পারেন।

২০০৮ সালে ভারতের আইন কমিশনের রিপোর্টে আমরা দেখি, অধিকাংশই ইংরেজির পক্ষে। তবে শতভাগ নন। বিচারপতি বিপি জীবন রেড্ডি কোনো মত না দিয়ে বিষয়টি সরকারের ওপর ছেড়ে দেন। বিচারপতি এম এন ভেঙ্কটাচারিয়া বলেন, 'উচ্চ আদালত ব্যতিক্রম হতে পারে না। সংসদীয় কমিটির সুপারিশের গুরুত্ব দেওয়া যথার্থ। তাড়াহুড়ো না করে শুরুটা করা উচিত।'[২৩] ভারতের সাবেক প্রধান বিচারপতি এ এম আহমেদি বলেন, 'কোনো হাইকোর্ট হিন্দি চালু করবে কি না, তা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের গভর্নরের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।'[২৪] উল্লেখ্য, ভারতের আইনে হাইকোর্টে মাতৃভাষা চালুর এখতিয়ার গভর্নরকে দেওয়া আছে।

ভারতের বিখ্যাত বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণা আয়ার মনে করেন, 'ভারতের জনগণের বিচার লাভের অধিকারের ওপর ভাষাগত, শব্দার্থতাত্ত্বিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাপ্তি রয়েছে। কারণ, ভারতে ১৬ বা তার বেশি ভাষা রয়েছে। বহু রাজ্যে হিন্দির ঠাঁই নেই, যেখানে ইংরেজিই ভরসা।' ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল শ্রী সি রাজাগোপালচারী দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে ভারতীয় জনগণের ওপর হিন্দি চাপানোর বিরোধিতা করেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'হিন্দি কখনোই নয়, ইংরেজি সর্বকালের।'[২৫]

আয়ার আরও বলেন, তামিলনাড়ু কখনো আদালতে হিন্দি মেনে নেবে না। আমাদের বিচারকেরা অন্যান্য দেশের ইংরেজি রায়ের ওপর নির্ভরশীল। আমি ব্যক্তিগতভাবে হিন্দি পছন্দ করি। কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে নয়। তবে লক্ষণীয় হলো, বিচারপতি কৃষ্ণা আয়ার তাঁর কথায় যত টাকাই লাগুক 'ত্রিভাষা সূত্র' বাস্তবায়নে জোরালো মত দেন। তিনি আরও বলেন, 'উচ্চ আদালতে সবাই যে

ভাষায় বলে বলুক, তার তাৎক্ষণিক অনুবাদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'[২৬] আমরা দেখি, তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে যেকোনো ভাষায় কথা বলার সুযোগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারেননি। অথচ আমাদের দেশটা একান্ত বাঙাল হওয়া সত্ত্বেও কয়েক বছর আগে নিম্ন আদালতে বাংলায় আরজি পেশের প্রস্তাব পর্যন্ত নাকচ করা হয়।

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানও আমাদের সকল স্তরের আদালতে বিশ্বের যেকোনো ভাষায় কথা বলার অধিকার সমর্থন করেন। কিন্তু রায়টা হতে হবে মাতৃভাষায়। যেকোনো বিদেশি ভাষায় তার অনুবাদে মানা নেই।[২৭] আমরা বলতে পারি, যাঁরা একান্তভাবে চাইবেন তাঁরা আপাতত ইংরেজিতে লিখবেন, তবে তার বাংলা তরজমা হতে হবে।

ভারতীয় বিচারপতি বি এন শ্রীকৃষ্ণ আদালতে হিন্দি প্রচলনের আগে অন্তত দুই প্রজন্ম হিন্দি পরিভাষা রপ্ত করার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, ইংরেজি তুলে নিলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।

কিন্তু আমাদের তো সেই ভয় নেই। এমনকি ইংরেজি একেবারে তুলে নিলেও। যদিও তার কোনো দরকার নেই, উচিতও নয়, তাহলেও কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু কারও মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে না। বিদেশি আদালতে বাংলাদেশের রায়ের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা নয়। এখনো বিরল ঘটনা। সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন যে ওয়েবসাইটে রায় প্রকাশে খুবই আন্তরিক, তাও বলা যাবে না। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সরকারি ওয়েবসাইটে বর্তমানে আপিল বিভাগের মাত্র ২৬টি এবং হাইকোর্টের ৩৪৮টি রায় দেখতে পাওয়া যায়।[২৮]

আমরা জানি, আমাদের আদালত ব্যাপকভাবে ভারতীয় রায়ের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের রায় পড়তে 'বিশ্ব জেগে' নেই। কোনো বিচারেই ভারতের মতো অবস্থায় আমরা নেই। ভারতের সংবিধানে হাইকোর্টের এক বিচারককে অন্য হাইকোর্টে বদলি করা যায়। তাই ভারতের আইন কমিশন বলতে পেরেছে যে বিচারকের যদি ভাষার ওপর দখল না থাকে, তাহলে তিনি রায় লিখবেন কী করে?

ভারতের আইন কমিশন যে যুক্তি দিয়েছে, সে যুক্তিতে আমরাও কি ইংরেজির বিরোধিতা না করে বলতে পারি যে 'কোনো ভাষাই বিচারকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তাঁরা যে ভাষায় সাবলীল বোধ করেন, সেটাই তাঁদের বেছে নিতে দেওয়া উচিত। সর্বোচ্চ আদালতের তৈরি করা আইনের ভাষা বোঝার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। এবং এই মুহূর্তে সে ভাষার নাম ইংরেজি?' এর আলোকে আমরা কি বলতে পারি যে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে যাঁরা যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, তাঁরা সেভাবে লিখবেন কিন্তু ইংরেজি হলে তার একটি বাংলা অনুবাদ দ্রুত সহজলভ্য করতে হবে? এ ছাড়া প্রতিটি সংক্ষিপ্ত বা অন্তর্বর্তীকালীন

আদেশেরও একটি বাংলা পাঠ থাকবে?

ভারতের প্রথিতযশা সাংবিধানিক পণ্ডিত এইচ এম সিরভাইর কথায়, 'যদি প্রতিটি হাইকোর্টের ভাষা ভিন্নতর হয়, তাহলে সারা ভারতে প্র্যাকটিস করার যে অধিকার আইনজীবীদের স্বীকৃত, সেটা বাস্তবে থাকবে না। অলীক ধারণায় পরিণত হবে।' এই বাধা কিন্তু আমাদের নেই। বাংলায় অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ লেখা হলে কারও প্র্যাকটিস নষ্ট হবে না। তদুপরি ভারতের আইন কমিশন কিন্তু বলেছে, প্রতিটি আইনের একটি অনুমোদিত হিন্দি ভাষ্যও থাকতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাহী আদেশগুলোর জন্যও সেটা চলতে পারে।'[২৯]

ভারতের সংবিধানে স্টেট ল্যাংগুয়েজ বা রাষ্ট্রভাষা কথাটি ছিল না। অফিশিয়াল ল্যাংগুয়েজ হলো সরকার তার শাসনকার্যে কোন ভাষা ব্যবহার করবে সেটি। ন্যাশনাল ল্যাংগুয়েজ হলো সেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা। যেমন ভারতের সংবিধানে হিন্দিকে বলা হয়েছে জাতীয় ভাষা। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ফলে ১৯৫৬-র নতুন সংবিধানের ২১৪(১) অনুচ্ছেদে বলা হলো, 'দ্য স্টেট ল্যাংগুয়েজেজ অব পাকিস্তান শ্যাল বি উর্দু অ্যান্ড বেঙ্গলি।' তবে এর শর্তাংশে যা বলা হলো তাতে মনে হয়, রাষ্ট্রভাষা কথাটার মানে করা হয়েছিল জাতীয় ভাষা। দেশের দুই অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষার স্বীকৃতিমাত্র, শাসনকার্যের ভাষার স্বীকৃতি নয়। কারণ, শর্তাংশে লেখা হয়েছিল, 'আগামী ২০ বছরের জন্য সব সরকারি উদ্দেশ্যে ইংরেজি অব্যাহত থাকবে। এরপর সংসদ আইন করে ঠিক করবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহার করা হবে। ১০ বছর পর রাষ্ট্রপতি ইংরেজি প্রতিস্থাপনের সুপারিশ দিতে একটি কমিশন গঠন করবেন। তবে প্রাদেশিক সরকার চাইলে এই ২০ বছরের আগে যেকোনো রাষ্ট্রভাষা দিয়ে ইংরেজি প্রতিস্থাপন করতে পারবেন।'

এরপর ১৯৬২-এর সংবিধানের ২১৫ অনুচ্ছেদে উর্দু ও বাংলা রাষ্ট্রভাষা নয়, পেল জাতীয় ভাষার মর্যাদা। তার মানে, শাসনগত ভাষার মর্যাদা তারা কেউ পেল না। অফিস-আদালতে-সংসদে ইংরেজি ব্যবহারে যাতে বিঘ্ন না হয়, সে কথা স্পষ্ট বলা হলো। ইংরেজি সরাতে রাষ্ট্রপতির কমিশন গঠনের কথাটা প্রতিশ্রুতি হিসেবে ঝুলে থাকল।

একাত্তরে আমরা স্বাধীন হলাম। সংবিধানপ্রণেতাদের সামনে তখন পাকিস্তান ও ভারতের অভিজ্ঞতা। বহুভাষী ভারতের সংবিধানে সরকারি ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা ও সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের ভাষা নিয়ে প্রায় ১০টি অনুচ্ছেদ আছে। তারা সরকারি ভাষা হিসেবে দেবনাগরি লিপিতে হিন্দিকে নির্দিষ্ট করেছে। ইংরেজি পায় কার্যত দ্বিতীয় সরকারি ভাষার মর্যাদা।[৩০] হিন্দির ব্যবহার বাড়াতে ১৫ বছর পরে রাষ্ট্রপতির কমিশনের ধারণা আমরা এখানে পাই। কিন্তু হিন্দি যাতে একচ্ছত্র

সরকারি ভাষা না হতে পারে, সে জন্য ভারতেও ভাষা আন্দোলন হলো। তাই ১৯৬৩ সালে পাস হলো সরকারি ভাষা আইন। এর লক্ষ্য ১৯৬৫-এর পরেও ইংরেজি চালিয়ে নেওয়া। সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলে তামিলনাড়ু, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশের মতো রাজ্যগুলো প্রতিবাদে সরব হয়। এর পরিণতিতে ১৯৬৭ সালে ওই আইনে সংশোধনী আনা হয়। এতে বলা হয়, অ-হিন্দি রাজ্যগুলোর বিধানসভায় প্রস্তাব পাস ছাড়া ইংরেজি বিলোপ করা যাবে না। ওপরের এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা এক জিনিস। আর সরকারি ভাষা একেবারেই অন্য।

এবার আমরা নজর দেব বাংলাদেশ সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের দিকে, যেখানে শুধু লেখা—প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এর অর্থ দাঁড়ায়, দেশটির অধিকাংশ মানুষ বাংলায় কথা বলে। এটুকুর বহিঃপ্রকাশ ছাড়া এর আর কি কোনো আইনি তাৎপর্য হতে পারে? যেমন ২ক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তার মানে হতে পারে, দেশটির অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। অবশ্যই সরকারি কার্যে সেই ধর্মের কোনো অনুশাসন মেনে চলার বিষয় বোঝানো হয় না। তাহলে কোটি টাকা দামের প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের কি কোনো সংবিধানস্বীকৃত সরকারি ভাষা আছে? বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের লেখায় আমরা রাষ্ট্রভাষা ও সরকারি ভাষার তফাত আলোচিত হতে দেখিনি। এমনকি তাঁর 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, এ কথার অর্থ কী?' শীর্ষক নিবন্ধেও তিনি তা সযত্নে কিংবা অলক্ষ্যে এড়িয়ে যান বলে প্রতীয়মান হয়। উপরন্তু তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন,

'আমাদের সংবিধানের প্রথমভাগে যে-দেশপরিচয় দেওয়া আছে, সেখানে ৩ অনুচ্ছেদে বর্তমানকালবাচক একটা বিধান আছে : প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এ বিধান কি কেবলই পোশাকি? এর অর্থ কী? এর মর্ম কী? এর বাধ্যবাধকতা কী? সে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে তেমন আলোচনা হয়নি। সিদ্ধান্তও দেওয়া হয়নি।'[৩১]

অবশ্য অন্যত্র তিনি ৩ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে আমাদের দেশে ইংরেজির প্রতি বিদ্যমান আইনের সুরক্ষাকে সুনজরে দেখেননি। আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন এই বলে যে আপিল বিভাগে যাওয়ামাত্রই ইংরেজিবান্ধব বিধিবিধান কচুকাটা হবে!

আইনজীবী না হওয়ার সুবিধা নিচ্ছি। তাই আমার প্রাথমিক মত দিচ্ছি। আর তা হলো, জেনে বা না জেনে আমরা দৃশ্যত সংবিধান, সমাজ ও কালের বিচারে ভাষার প্রশ্নে মস্ত বড় একটা ফাঁক আর সীমাবদ্ধতার মধ্যে বসবাস করছি। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা কথাটি নেহাত পোশাকি প্রতীয়মান হয়। ভাষা প্রশ্নে এত কম কথা উল্লেখ করার সংবিধান বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথায় মিলবে, তা হয়তো বলা দুরূহ। তবে সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক মনে করেন, সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা কথাটির উল্লেখ যথেষ্ট। তাঁর কথায়, এই বিধানই

বাংলায় রায় লিখতে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেছে।'[৩২]

হাশমতউল্লা বনাম আজমিরি বিবি মামলায় বিচারপতি এ আর এম আমিরুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি এ এম মাহমুদুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ ১৯৯১ সালের ২৮ নভেম্বর প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষাবিরোধী একটি রায় দিয়েছেন। এতে রাষ্ট্রভাষা থেকে 'আদালতের ভাষা'কে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়েছে। আমাদের কখনো মনে হয়, কেবল ৩ অনুচ্ছেদটি দিয়ে ইংরেজিবান্ধব আইনগুলোকে চোখ রাঙানো চলে না। বরং এটাই বলা ভালো যে ৪১ বছরে সংবিধানের অনেক কাটাছেঁড়া হলেও সংবিধান সংশোধনকারীরা ভাষার দিকে মনোযোগী হননি। বাংলাদেশের সংবিধান বাঙালি জাতিকে একটা ভাষাগত গোঁজামিলের মধ্যে রেখে দিয়েছে।

ইংরেজিতে লেখা সুপ্রিম কোর্টের মান্ধাতা আমলের বিধানগুলোকেও বাংলা করার কোনো উদ্যোগ বিচার বিভাগের তরফ থেকে নেই। বিনয়ের সঙ্গে বলি, এ ক্ষেত্রে কোনো প্রধান বিচারপতি আজ পর্যন্ত তেমন প্রশাসনিক দায় অনুভব করেছেন বলে জানা যায় না। অথচ তাঁরা জানেন, ভাষা বুঝতে পারা বা না-পারার সঙ্গে বিচারপ্রার্থীর মৌলিক মানবাধিকারের প্রশ্ন জড়িত।

আমাদের হাইকোর্ট ১৯৯১ সালের ওই মামলায় বলেন, 'আমরা তিনটি পরিভাষা দেখতে পাচ্ছি। রাষ্ট্রভাষা, সরকারি ভাষা এবং আদালতের ভাষা।' আমরা বলব, এ ধরনের বিভাজন কল্পনাপ্রসূত। আদালতের কথায়, 'রাষ্ট্রভাষার অর্থ হলো, রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম অর্থাৎ নির্বাহী, আইন বিভাগ, বিচারিক প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবহৃত ভাষা। সরকারি কার্যক্রম যে ভাষায় চলবে, তা সরকারি ভাষা। আদালতের কার্যক্রম যে ভাষায় চলবে, তা-ই "আদালতের ভাষা"।' এই তিনটি পরিভাষার মধ্যে 'আদালতের ভাষা' সংকীর্ণতম।' এমন ব্যাখ্যা থেকে আমরা মুক্তি চাই।

১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইনটি সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদের আওতায় প্রণীত হয়েছে।[৩৩] হাইকোর্ট এই পর্যায়ে সবচেয়ে অদ্ভুত যুক্তিটি দাঁড় করান এই বলে যে 'আদালতের ভাষা' যেহেতু সংকীর্ণতম, তাই 'রাষ্ট্রভাষা' বলতে 'আদালতের ভাষা' বোঝাবে না। অথচ, ১৯৮৭ সালের আইনটিতে এ ধরনের কোনো ফারাক বা পরিভাষা সৃষ্টি করা হয়নি। এমনকি উচ্চ ও নিম্ন আদালত বলেও আইনটিতে কিছু নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য, হাইকোর্ট ওই আইনের আদালত শব্দের মানে করেছেন নিম্ন আদালত। তাঁদের কথায়, অধস্তন আদালতের ভাষা কী হবে, সেই অর্থে এটি বুঝতে হবে। সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে আদালতের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এতে আদালত মানে শুধু অধস্তন আদালত বোঝায়নি। নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, এতে সুপ্রিম কোর্টও অন্তর্ভুক্ত।

হাইকোর্ট আরও গুরুতর ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। তাঁর যুক্তি, বাংলা ভাষা প্রচলন আইনটি একটি সাধারণ আইন।

কিন্তু সিপিসি বা সিভিল প্রসিডিউর কোড একটি বিশেষ আইন; যেখানে অধস্তন দেওয়ানি আদালত কীভাবে চলবে, তার বর্ণনা করা আছে। অথচ ১৯৮৭ সালের আইনকেই বিশেষ আইন বলা যায়।

এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস, আদালত, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন আদালতের সওয়াল-জবাব এবং আইনানুগ কার্যাবলি অবশ্যই বাংলায় লিখতে হবে। উল্লিখিত কোনো কর্মস্থলে 'যদি কোনো ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় আবেদন বা আপিল করেন, তাহলে তা বেআইনি ও অকার্যকর বলে গণ্য হবে।' হাইকোর্টের ওই রায় ও তাঁর পর্যবেক্ষণ বাংলা ভাষার ওপর একটি বাধা। একটি আঘাত।

বর্তমান আইন কমিশন দুটি ঘোষণার সুপারিশ করেছে। আইন কমিশন আজমিরি বিবির রায় সম্পর্কে বলেছে, 'সরকার অধস্তন দেওয়ানি আদালতের ভাষার ব্যাপারে দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭(২) ধারায় কোনো ঘোষণা দেয়নি বিধায় বাংলা ভাষা প্রচলন আইন জারি করা সত্ত্বেও অধস্তন দেওয়ানি আদালতের কার্যক্রম ইংরেজি ভাষায় চলমান রাখা যাবে। ফলে আজ অবধি বিচারকাজে বাংলা ভাষা পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয়নি।'

দেওয়ানি কার্যবিধি বলেছে,

> 137.(1) The language which, on the commencement of this Code, is the language of any Court subordinate to the High Court Division shall continue to be the language of such subordinate Court until the Government otherwise directs.
> (2) The Government may declare what shall be the language of any such Court and in what character application to and proceedings in such Courts be written.

এ বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা ৫৫৮ হচ্ছে :

> The Government may determine what, for the purposes of this Code, shall be deemed to be the language of each Court within the territories administered by it.

এমতাবস্থায় সরকার আদালতের ভাষা বাংলা মর্মে দ্য কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৯৯৮-এর সেকশন ৫৫৮-এর অধীন একটি এবং দ্য কোড অব সিভিল প্রসিডিউর, ১৯০৮-এর সেকশন ১৩৭(২)-এর অধীন একটি, অর্থাৎ মোট দুটি ঘোষণাপত্র জারি করতে পারে। প্রস্তাবিত ঘোষণাপত্র দুটি জারি করা হলে আদালতে তা অবিলম্বে কার্যকর করা সম্ভব।

কিন্তু আমাদের সন্দেহ এই দুটি ঘোষণা জারির পরও উচ্চ আদালতে বাংলা

নিশ্চিত করা যাবে কি না। বর্তমান আইন কমিশনের সঙ্গে আমরা একমত যে 'ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনসমূহ বাংলায় অনুবাদ ত্বরান্বিত করা জরুরি। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুবাদ কাজ বেগবান করা এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষকে অধিকতর শক্তিশালী, গতিশীল এবং উদ্যোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।'

প্রকৃতপক্ষে গলদ সংবিধানেই। সংবিধানই শোধরাতে হবে। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা বলে দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের কোনো স্তম্ভের ওপরই হয়তো বাংলা ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেনি। অবশ্য আমাদের সংস্কৃতি উন্নত হলে এতে আটকাত না, হয়তো এতেই চলত। তাই আমরা সংবিধানে উপযুক্ত সংশোধনী আনার প্রস্তাব করব। জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে তাদের ভাষাসমূহকে সংবিধানের তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না, তাও ভাবা যায়। গতবারের একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান *প্রথম আলো*তে তাঁর ধারাবাহিক লেখায় আমাদের জাতিসত্তার আরেকটি অনালোচিত পরিচয় উন্মোচিত করেছেন।[৩৪] আর সেটা প্রমাণ করে যে আমরা এক অর্থে সমগোত্রীয় নই, বহু ভাষাভাষী জাতি।

২০০৩ সালে চীনের কুনমিংয়ের একটি প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়েছিলাম। সেখানে একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বাস। তাদের নিজস্ব ভাষা আছে। সেখানে আদালতের ভাষা যদিও চীনা সরকারি ভাষা। কিন্তু যখন রায় হয়, তখন তার অনুবাদ স্থানীয় ভাষায়ও করা হয়। অনুপস্থিত ব্যক্তির বাড়ির দরজায় আদালতের সমন লটকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেটা তাদের মাতৃভাষায়।

সম্ভবত উচ্চ আদালতে বাংলা চালুর সবচেয়ে বড় বাধা মনস্তাত্ত্বিক। এর সঙ্গে একশ্রেণীর আদালতকেন্দ্রিক মানুষের স্বদেশি ঠকানোর মনোবৃত্তিও রয়েছে। আদালতে বিদেশি ভাষা অব্যাহত রাখার সঙ্গে আদালতকেন্দ্রিক অসাধুতার সম্পর্ক নিয়ে টিআইবি যদি একটি নতুন সমীক্ষা চালায়, তাহলে তার ফলাফল কম চমকপ্রদ হবে বলে মনে হয় না।

আদালতের ইংরেজিচর্চা সংবিধানের ৩৫(৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'প্রকাশ্য বিচারের' ধারণার পরিপন্থী। কারণ, ইংরেজি না-জানা লোকের কাছে গোপন বিচার আর প্রকাশ্য বিচারের পার্থক্য নেই। তাঁকে দুর্বোধ্যতার অন্ধকারে রাখতে বা ঠকাতে পারে যে কেউ। অথচ বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের জন্মের আগেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'আমরা ক্ষমতা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র বাংলা চালু করে দেব। সে বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে। পরে সংশোধন করে নেব।' কিন্তু ক্ষমতা পেয়ে সংবিধান লিখতে বসে সে কথা লেখাই বাকি পড়ল। বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করতে গিয়ে ১৯৯৮ সালের ১ মার্চ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'সকল স্তরের আদালতে' বাংলায় নিপুণভাবে রায়ের জন্য ইনস্টিটিউটকে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে উচ্চ আদালতে বাংলা চালুর বিষয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কিছু করার নেই।

মূলত সুপ্রিম কোর্ট, বিশেষ করে আপিল বিভাগ চাইলে নিজেরাই আদালতে বাংলাবান্ধব একটা উপযুক্ত নির্দেশনা দিতে বা ব্যবস্থা নিতে পারেন। তাঁরা এ জন্য পর্যাপ্ত অনুবাদক নিয়োগ দিতে পারেন। বরাদ্দ চেয়ে সরকারকে পত্র দিতে পারেন। এটা করার মুখ্য দায় তাঁদেরই।

আসলে পাকিস্তানের সঙ্গেই যত শাসনগত মিল। আজও আমাদের সভা-সমিতিতে শৌর্যবীর্যের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, জিন্নাহর উর্দু ঘোষণার জবাবে 'না' দ্রোহ কীভাবে ধ্বনিত হয়েছিল। তবে পাকিস্তানে ভাষা বিল ওঠে। এখানে তা-ও নয়। পাকিস্তানের বিরোধী দল উর্দুসহ আটটি ভাষাকে জাতীয় ভাষা করার চিন্তায় সংসদে একটি বিল এনেছিল। ২০১১ সালের ১৯ মে *পাকিস্তান টুডে*-এর এক রিপোর্ট বলেছে, 'আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি আঞ্চলিক ভাষাসংক্রান্ত সংবিধান সংশোধন বিল ২০০৮ নাকচ করেছে।' সিন্ধুর সাংস্কৃতিক মন্ত্রী মিজ সাসুই পালিজোর প্রতিক্রিয়া প্রণিধানযোগ্য। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, সিন্ধি যদি ভারতের সংবিধানে মর্যাদা পায়, তাহলে পাকিস্তানের সংবিধানে তা পাবে না কেন। সিন্ধি, পাঞ্জাবি, বেলুচি ও পশতুকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। যাঁরা বলেন এতে বিশৃঙ্খলা ঘটবে, তাঁদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

বাংলাদেশে ১৯৮৭ সালে জেনারেল এরশাদের আধা সামরিক আমলে বাংলা ভাষার প্রচলন আইনটি পাস হয়েছিল একটি বেসরকারি বিল হিসেবে। সরকার কিন্তু বিল আনেনি। তিন বছর পরে একটা পরিপত্র এল, তখনো এরশাদ ক্ষমতায়। বাংলাদেশের বহুল উচ্চারিত গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কেবল বাংলা ভাষা নিয়েই তেমন কোনো উচ্চবাচ্য হয় না। এই নীরবতার অবসান হওয়া উচিত।

আশু বাস্তবায়নের আশায় একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব করি। মহামান্য আপিল বিভাগ যেন আপাতত তাঁদের প্রতিটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ এবং বিশেষ করে রায় ঘোষণা দিনের সংক্ষিপ্ত আদেশ বা রায়ের অপারেটিং অংশ শুধু বাংলায় কিংবা একসঙ্গে ইংরেজি ও বাংলায় প্রকাশে উদ্যোগী হন।

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানের ৬২তম বার্ষিকীতে আমাদের স্লোগান হবে—বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে বাংলা চাই। গত ৪১ বছরে আমাদের চার-পাঁচটি রায়ও বিদেশি কোনো সুপ্রিম কোর্ট উদ্ধৃত করেছে কি না সন্দেহ। সুতরাং যাঁরা পরিভাষার ঘাটতি বা বিদেশিদের চাহিদার কথা বলেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ, আপনারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংবিধান ও আদালতগুলোর দিকে তাকান।

ভাষাদূষণ রোধে বাংলা একাডেমির সভাপতি আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে কমিটি

গঠনের আদেশ হাইকোর্ট দিয়েছিলেন। আমাদের বরং মনে হয়, উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনে একটি কমিশন গঠন করা যেতে পারে। ভাবতে পারলে খুশি হতাম যে সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ বাংলা ভাষার প্রতি নয়, আদালতের ভাষা কী হবে সেই বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালনের প্রতি সজাগ ও সচেতন রয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের ভাষা কী হবে, তা আইনে ও সংবিধানে স্পষ্ট বলা না থাকতে পারে, কিন্তু নিজস্ব প্রশাসনিক বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট এখানে একটি দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

মাতৃভাষায় আইনচর্চার অধিকারও মানবাধিকার। আইনচর্চা আর ন্যায্য বিচারের শর্তপূরণ সরাসরি এক জিনিস নয়। বিচারপ্রার্থীর অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘের 'ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস' (আইসিসিপিআর)-এ দুটি বিধান আছে। বাংলাদেশ ২০০০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এটি সই করেছে। এই সনদের যেসব বিষয়ে বাংলাদেশ তার অনিচ্ছা ব্যক্ত করেছে, তার মধ্যে এই বিধান দুটি নেই। সুতরাং বাংলাদেশের উচ্চ আদালত সংসদের পাস করা কোনো মামুলি বিধানের বিচ্যুতি করছে কি না জানি না, তবে মানবাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ সনদ হিসেবে আইসিসিপিআর-এর নিশ্চয় ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে। এর ১৪ ধারার ৩ দফার দুটি উপ-দফা বলছে,

a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him; (f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.

সুতরাং, ভাষার অধিকারের সঙ্গে মানবাধিকারের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

একটি নতুন তথ্য জেনে আমরা বেদনাহত হলাম। ১৯৬০ সাল থেকে চলে আসা হাইকোর্ট রুলস ৫২ বছর পরে হলেও বর্তমান সরকারের আমলে শেষ পর্যন্ত সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে সংসদে বা কোথাও আলোচনা হলো না। সুপ্রিম কোর্ট এত বড় একটা কাজের খসড়া ওয়েবসাইটে দিতে পারতেন। কিন্তু তা তাঁরা দেননি। রাষ্ট্রপতি নীরবে তাতে সই করেছেন। প্রজ্ঞাপনও জারি হয়ে গেছে। এই রুলসে একটি বিধান ছিল যে হাইকোর্টে দরখাস্ত করতে হবে ইংরেজিতে।[৩৫] কিন্তু অবাক ব্যাপার, এখানে একটি সংশোধনী আনা হয়েছে। ইংরেজি শব্দের পরিবর্তে বাংলা শব্দটি স্থাপন করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়াল সুপ্রিম কোর্ট স্বেচ্ছায় বাঙালিকে এতকাল পরে শুধু বাংলায় দরখাস্ত লেখার অধিকার মঞ্জুর করলেন। কিন্তু রায়সহ আর সবই চলবে ইংরেজিতে, আগের মতো। বাঙালির ইংরেজি বিধি এভাবেই সুপ্রিম কোর্ট অখণ্ডনীয় করে দিয়েছেন।

শেষ কথা

সুতরাং এটাই ঠিক যে সংসদের নির্দেশনা ছাড়া উচ্চ আদালতে বাংলা ঢুকবে না।

অবশ্য গোটা বিশ্বেই সংসদ এই দায়িত্ব পালন করছে। আমরা মনে করি, আইন কমিশনের সুপারিশ অপ্রতুল, যদিও বিরাগভাজন হতে অনিচ্ছুক সরকার সেটাই আমলে নিতে দ্বিধান্বিত। তবে এ-ও ঠিক, সাধারণ আইন করলে হবে না। উপযুক্ত সাংবিধানিক রক্ষাকবচ লাগবে। কোনো সন্দেহ নেই, সমৃদ্ধ পরিভাষা না থাকা, অনুবাদ সমস্যা, দক্ষ লোকবলের অভাব একটা বড় সীমাবদ্ধতা। কিন্তু অনতিবিলম্বে বাংলায় রায় লেখার শুরুটা অবশ্যই করতে হবে।

মাননীয় বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেছিলেন, প্রতিটি একুশে ফেব্রুয়ারিতে 'আ-মরি বাংলা ভাষা' বলে আমাদের যে দশা হয় এবং আমাদের ভাষা নিয়ে যে ঢলঢল ভাবালুতা প্রকাশ পায়, তাতে মনের খেদে বলতে ইচ্ছে করে, 'ও হরি, আমাদের কেন মরণ হয় না?'

তিনি স্বীকার করবেন যে রাষ্ট্রের অন্য দুটি স্তম্ভ অপেক্ষাকৃত ভালো। তাই আদালতের, বিশেষ করে মাতৃভাষায় উচ্চ আদালতের অনীহা দেখে কেবল আমাদের বলতে ইচ্ছে করে, 'ও হরি, আমাদের মরণ হয় না কেন?' একুশে ফেব্রুয়ারির দেশে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার দেশের উচ্চ আদালতে ভাষাগত মানবাধিকারের অব্যাহত লঙ্ঘনের অবসান হোক।

তথ্যসূত্র

১ Written judgement in English invalid - lawyer, সর্বশেষ সংশোধিত ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১০, http://www.mysinchew.com/node/45542.

২ 'Dato' Seri Anwar Ibrahim v. Tun Dr. Mahathir Mohamad ', *Current Law Journal* 2010 (1), http://www.thenutgraph.com/user_uploads /images/2010/01/ 25/001% 20Anwar%20v%20Mahathir.pdf

৩ H.J. Lubbe, *The Right to Language in Court: A Language Right or a Communication Right?*, (Bloemfontein: University of Free State, South Africa), p. 377, http://www.google.com/url?q=http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3199505.pdf&sa=U&ei=0qlvUbCfCc7IrQfXnoGYDw&ved=0CBgQFjAA&usg=AFQjCNG4_X4oKbk38mKP2CDA7f8nnlp_Zw

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০।

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১ ।

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩ ।

৭ মামলার নাম: 'R v. Beaulac 1999,' Judgement of the Supreme Court of Canada, মামলার নম্বর ২৬৪১৬, http://csc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/item/1700/index.do

৮ Daren Butler, 'Turkey to Allow Kurdish Language to be Used in Court,' November 07, 2012, *The Star Online*, http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/11/7/worldupdates/2012-11-06T160714Z_1_BRE8A50XG_RTROPTT_0_UK-TURKEY-KURDS&sec=Worldupdates

৯ Constituent Assembly Debate on 12 September, 1949, http://www.indiankanoon.org/doc/1362403/

১০ *Dawn*, 19 November, 2013.

১১ 'Hindi, not a National Language: Court,' *The Hindu*, January 25, 2010, http://www.thehindu.com/news/national/hindi-not-a-national-language-court/article94695.ece

১২ 'Khurshid Acknowledges Demand for Making Tamil a Court Language,' *The Hindu*, September 10, 2010, http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/khurshid-acknowledges-demand-for-making-tamil-a-court-language/article3878652.ece

১৩ 'Use of Hindi in Courts', Press Information Bureau, Government of India, September 3, 2012, http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=87283

১৪ Marco Wan, *Reading the Legal Case: Cross-currents between Law and the Humnities*, Routledge, 2012, p. 81.

১৫ দেখুন http://caluniv.academia.edu/MinaDan

১৬ দেখুন http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Pitts_Forster

১৭ Swapan Chakravorty and Abhijit Gupta, *Print Areas: Book History in India*, Orient Blackswan, 2004, p. 198.

১৮ Marco Wan, 2012, p. 82.

১৯ 'Non-feasibility of Introduction of Hindi as Compulsory Language in the Supreme Court of India', *Law Commission Report of India*, December 2008, Report No. 216, p. 16, http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/report216.pdf

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯।

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

২৭ লেখকের সঙ্গে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সাক্ষাৎকার।

২৮ আপিলেট ডিভিশন, http://www.supremecourt.gov.bd/scweb/judgments.php?div_id=1; হাইকোর্ট ডিভিশন http://www.supremecourt.gov.bd/scweb/judgments.php?div_id=2

২৯ *Law Commission Report of India*, December 2008.

৩০ অনুচ্ছেদ ৩৪৩, *ভারতীয় সংবিধান*, http://www.constitution.org/cons/india/const.html.

৩১ রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, এ-কথার অর্থ কী?' শীর্ষক নিবন্ধ তাঁর *নির্বাচিত প্রবন্ধ* সংকলন, অন্যপ্রকাশ : ২০০০।

৩২ লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকার, ২৭ মে, ২০১৩।

৩৩ Nahid Ferdouci, 'Bengali Language Situation in the Judicial System in

Bangladesh', *Dhaka University Journal of Linguistics*, 2009, 2 (3): 53.

৩৪ ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত *প্রথম আলোতে* সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের ভাষা নিয়ে ধারাবাহিক লেখা থেকে সংগৃহীত।

৩৫ 'অধ্যায় IV: আবেদন ও এফিডেভিটের সাধারণ নিয়মাবলী', *Court Rules: High Court Divison*, http://www.supremecourt.gov.bd/scweb/rules/ Rules% 20of% 20H. Ct.% 20Judicature~Chapter%20IV.pdf

গ্রন্থপঞ্জি

Chakravorty, Swapan and Gupta, Abhijit. 2004. *Print Areas: Book History in India*. Orient Blackswan.

Ferdouci, Nahid. February 2009. 'Bengali Language Situation in the Judicial System in Bangladesh', *Dhaka University Journal of Linguistics,* 2 (3).

Lubbe, H.J. *The Right to Language in Court: A Language Right or a Communication Right?*. Bloemfontein: University of the Free State, South Africa.

Wan, Marco. 2012. *Reading The Legal Case: Cross-Currents between Law and the Humanities*. Routledge.

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর। ২০০০। 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, এ-কথার অর্থ কী?' শীর্ষক নিবন্ধ তাঁর *নির্বাচিত প্রবন্ধ* সংকলন। অন্যপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত।

বই আলোচনা

কুলদীপ নায়ারের আত্মজীবনী বা ইতিহাসের পুনরুল্লেখ

সোহরাব হাসান

বিয়ন্ড দ্য লাইনস : অ্যান অটোবায়োগ্রাফি, কুলদীপ নায়ার
ডেইলি স্টার, বাংলাদেশ সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১২।

আত্মজীবনী কেবল ব্যক্তি নয়, সমকালীন সমাজ ও সমাজের অনেক মানুষের জীবন ধারণ করে। যে আত্মজীবনী নিজের চেয়ে সমকালীন সমাজের পিছিয়ে পড়া এবং এগিয়ে নেওয়া মানুষদের কথা বেশি বলে, সেটাই সার্থক আত্মজীবনী। যে আত্মজীবনী কালের কিংবা দেশের সীমা ছাড়িয়ে নব নব দিকের পানে পাঠককে নিয়ে যায়, সেটাই কালোত্তীর্ণ আত্মজীবনী। যে আত্মজীবনী ব্যক্তির চেয়ে তার চারপাশের চরিত্রগুলোর প্রতি অধিক মনোনিবেশ ঘটায়; পাঠককে নিয়ত আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণে ব্যস্ত রাখে, সেই আত্মজীবনীই হয়ে ওঠে সময়ের দর্পণ। রাজনীতিকদের আত্মজীবনীতে ব্যক্তি ও দলের প্রচারণা বেশি থাকে, পণ্ডিতদের আত্মজীবনী তত্ত্বের ভারে আক্রান্ত হয়, বিজ্ঞানীদের আত্মজীবনীতে নিজের কাজের বাইরের কিছু দেখা যায় না, লেখক-কবিদের আত্মজীবনীতে ভাবালুতার আধিক্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু সাংবাদিকদের আত্মজীবনী কেমন হয়ে থাকে? সাংবাদিক কি তাঁর আত্মজীবনীতে সব সময় পেশাগত বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন? তিনি কি নিজেকে অতিক্রম করে সত্যকে তুলে ধরতে পারেন?

এই প্রেক্ষাপটে আমরা ভারতীয় সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের আত্মজীবনী *বিয়ন্ড দ্য লাইনস* মূল্যায়ন করব। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের মধ্যে ফয়েজ আহমদ, এস এম আলী, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী প্রমুখ যা লিখেছেন, তা ঠিক আত্মজীবনী নয়;

পেশাগত জীবনের পুনর্লিখন। বিশেষ করে ফয়েজ আহমদের চার খণ্ডের আত্মজীবনী বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সরস ঘটনায় ভরা। কিন্তু কুলদীপ নায়ারের আত্মজীবনীতে ঘটনার চেয়ে অগ্রাধিকার পেয়েছে দেশ, মানুষ, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার।

কুলদীপ নায়ারের জন্ম ১৯২৩ সালে, অবিভক্ত পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে। তাঁর বাবা ছিলেন নামকরা চিকিৎসক। সেই সুবাদে স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম ও শিখদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কুলদীপ নায়ার আইনে স্নাতক হয়েও সাংবাদিকতায় কর্মজীবন শুরু করেছিলেন, পরবর্তীকালে নিজেকে বহুমাত্রিক পরিচয়ে বিস্তৃত করেছেন। সাংবাদিকতার বিরতিতে তিনি সরকারি চাকরি করেছেন, বিদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছেন, হয়েছেন দেশটির উচ্চপরিষদ তথা রাজ্যসভারও সদস্য।

কুলদীপ নায়ারের আত্মজীবনী *বিয়ন্ড দ্য লাইনস* বা সীমার ওপারে নামকরণটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই সীমা যেমন অবিভক্ত ভারতের ইতিহাস তুলে আনে, যখন তিনটি দেশের মধ্যে কোনো সীমা ছিল না, তেমনি ভবিষ্যতেরও ইঙ্গিত দেয়। তাঁর বর্তমান দেশ ভারত হলেও বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে অবাধ যাতায়াত আছে। তাঁর কলাম 'বিটুইন দ্য লাইন' দেশ-বিদেশের ১৭টি ভাষার ৮০টি পত্রিকায় ছাপা হয়। কুলদীপ নিজেকে অবশ্যই ভারতীয় মনে করেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশি মনে করেন উপমহাদেশীয়। তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী চান, আবার পাকিস্তানের সঙ্গেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী। তিনি উগ্র ধর্মবাদিতার মতো অপছন্দ করেন উগ্র জাতীয়তাবাদকে।

বিয়ন্ড দ্য লাইনস-এর শুরু শিয়ালকোটে, তার কৈশোরে যখন দেশ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি রাষ্ট্র হয়, সমাপ্তি টেনেছেন মনমোহন সিংয়ের শাসনামলে এসে। এই যে প্রায় ৭০ বছরের কালপর্ব; এই সময়ে উপমহাদেশে রাজনৈতিক উত্থান-পতন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মানবিক বিপর্যয়, যুদ্ধ-বৈরিতা, দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সম্পর্কের টানাপোড়েন—সবই বিবৃত হয়েছে তাঁর আত্মজীবনীতে। ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই আত্মজীবনীকে আমরা মোটাদাগে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। ১. শৈশব থেকে দেশ বিভাগ পর্যন্ত; ২. দেশ বিভাগ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে হালনাগাদ।

কুলদীপ নায়ারের আত্মজীবনীর ক্যানভাস বিশাল। চরিত্র ও ঘটনাবলি অজস্র। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করলেও অনেক বিষয় বুড়িছুঁয়ে গেছেন। ফলে ইতিহাসের একনিষ্ঠ গবেষক কিংবা রাজনীতির পণ্ডিতেরা এ বইয়ে ইতিহাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুঁজতে গেলে হতাশ হবেন। কিন্তু বিষয়-বর্ণনায় লেখকের নির্মোহ ও মানবিক দৃষ্টি আমাদের চমকিত করে; তিনি কুশলী রিপোর্টারের মতো ঘটনার সত্যনিষ্ঠ বিবরণ দিয়ে গেছেন, মাঝেমধ্যে দু-একটি

মন্তব্য করেছেন এবং নিজেকে বরাবর ঘটনার আড়ালে রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন। এটাই সম্ভবত কুলদীপের লেখনীর বড় গুণ।

কুলদীপের আত্মজীবনীর প্রথম পর্বে রয়েছে: শৈশব ও দেশ বিভাগ, নেহরুর বছরগুলো, প্রথম দিকে শাসন, ইংরেজি সাংবাদিকতায় আমার প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানবিশীকরণ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামলের চালচিত্র। দ্বিতীয় পর্বে: বাংলাদেশের যুদ্ধ, শিমলা সম্মেলন, জরুরি অবস্থা ও তারপর, জনতা পার্টির সরকার, অপারেশন ব্লু স্টার। তৃতীয় পর্বে: রাজিব গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভিপি সিং, নরসিমা রাওয়ের সরকার, সংসদে আমার সম্পৃক্ততা, বিজিপি অ্যাট দ্য হেলথ, মনমোহন সিংয়ের সরকার।

২.

আমরা দেশ বিভাগ নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের শাসকদের বিপরীতমুখী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লক্ষ করি। দেশ বিভাগের সময়ে সীমান্তের এপারে-ওপারে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, তার চেয়েও বেশিসংখ্যক নারী-পুরুষ ও শিশু অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পড়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়ে বহু মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে, বহু নারী সম্ভ্রম হারিয়েছেন। কুলদীপ নায়ার নিজেও দেশ বিভাগের কারণে জন্মভূমি শিয়ালকোট থেকে নয়াদিল্লিতে এসে উদ্বাস্তু জীবন বেছে নিতে বাধ্য হন। সেই সময়ের ভয়াল পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে কুলদীপ নায়ার লিখেছেন, When I crossed the border on 13 September 1947 I had seen so much blood and destruction in the name of religion that I vowed to myself that the new India which we were going to build would know no deaths due to differences in religion or Caste. I therefore wept when I witnessed the mass-murder of Sikhs in 1984 and saw a repetition of such inhumanity in Gujarat in 2002, viewing it as a microcosm of the communal violence I had witnessed in 1947. (পৃষ্ঠা ৪২৯-৪৩০)

কুলদীপ নায়ার শিখ ও হিন্দু উভয় পারিবারিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী; তাঁর মা নিয়মিত গুরুদুয়ারায় যেতেন, তাঁরা শিখ হলেও লম্বা চুল রাখেননি; কুলদীপ নিজের নামের সিং বাদ দিয়ে নামের শেষে নায়ার যোগ করেছেন। তাঁদের পরিবারে হিন্দু ও শিখ উভয় ধর্মের অনুষ্ঠানাদি পালন করা হতো; তাঁরা ছিলেন সংস্কারমুক্ত। এমনকি একবার লক্ষ্মীপূজার আচারাদি পালনের সময় এক মুসলিম দম্পতি এসে পড়লে তাঁর মা তাঁদেরও তাতে যোগ দিতে বলেন। কুলদীপ নায়ার জাত-অজাত বিশ্বাস করতেন না; তাঁর ভাষায় অদ্ভুত কালচার হিন্দুধর্মের

জাতপাতের বিভেদ সম্পর্কে সজাগ করে। স্কুলে সহপাঠীদের মধ্যে কেউ জুতো পরত; কেউ খালি পায়ে ছিল; কুলদীপ শিক্ষকদের প্রশ্ন করেন, কেন সবাই জুতা পরে আসবে না? যারা খালি পায়ে আসত, তারা ছিল নিম্ন ধরনের। কুলদীপ ধর্মের নামে এই অনাচার মানতে পারেননি শৈশব থেকে।

১৯৪৭ সালে যখন দেশ ভাগ হয় কুলদীপ নায়ার ২৩ বছরের যুবক; দেশ বিভাগের আগেই সীমান্তের দুই পারে হিন্দু, মুসলিম ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। বাবা-মা তাঁকে এক সেনাসদস্যের সঙ্গে দিল্লিতে পাঠান; পথে তিনি যেসব রোমহর্ষক হত্যা ও দাঙ্গার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন, কুলদীপের ভাষায়, The refugees carried with them not only bitterness and vengeful thought but also stories of atrocities in the cities and villages where they had lived peacefully with other communities for centuries. If Partition was on the basis of religion, the killing only served to carve deep furrows. (পৃষ্ঠা ৮-৯)

কুলদীপ নায়ার তাঁর আত্মজীবনীতে সাতচল্লিশের উদ্বাস্তুদের ট্র্যাজেডির বিবরণ দিলেও একাত্তরে যে পাকিস্তানিদের হাতে নিগৃহীত হয়ে বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিল; যাদের ঠাঁই হয়েছিল ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে; তাদের বেদনা ও দীর্ঘশ্বাসের কথা তাঁর লেখায় তেমন করে পাই না।

অনেক ইতিহাসবিদের মতো কুলদীপও মনে করেন, ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ মেনে নিলে দেশ ভাগ এড়ানো যেত এবং এ জন্য জওহরলাল নেহরুর অনমনীয় ভূমিকাকে দায়ী করেন। সম্প্রতি বিজেপি নেতা নটবর সিং বই লিখেও তা জানিয়েছেন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদের *ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম*-এও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু মুহম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের জন্য যে পুণ্যভূমি প্রতিষ্ঠার পণ করেছিলেন, সে কথাটি জোরালোভাবে কেউ বলেন না। আমাদের মনে রাখা দরকার ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব প্রথমে জিন্নাহ গ্রহণ করলেও পরে নাকচ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, হিন্দু ও মুসলিম দুটি জাতি। কেবল ধর্মবিশ্বাস নয়, তাদের আচার-রীতি, জীবনধারাও আলাদা। এ অবস্থায় কীভাবে দুই সম্প্রদায় এক দেশে বসবাস করে? অবাক ব্যাপার হলো, জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বে ভারতীয় মুসলমানরা এতটাই আচ্ছন্ন ছিলেন যে যেসব এলাকার মুসলমান পাকিস্তানে যেতে পারবেন না জানতেন; তাঁরাও পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। এর পেছনে কাজ করেছে সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্ব। আমার ধারণা, অধিকাংশ ভারতীয় লেখক-ইতিহাসবিদ জিন্নাহর ব্যক্তিগত জীবনাচরণকেই তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস বলে ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কুলদীপ নায়ারও এর ব্যতিক্রম নন।

মুদ্রার অপর পিঠ হলো, পাকিস্তানের লেখক-ইতিহাসবিদেরা মনে করেন না কংগ্রেসের অনমনীয়তার কারণে দেশ ভাগ হয়েছে। তাঁদের দাবি, মুসলমানদের জন্য মুহম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান নামে একটি নতুন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে এ-ও ঠিক মহাত্মা গান্ধী, আবুল কালাম আজাদ ও আবদুল গাফ্‌ফার খান পাকিস্তান ধারণাকে কখনোই মেনে নেননি। তাঁদের যুক্তি ছিল ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হতে পারে না। নেহরু-প্যাটেল মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের স্বার্থ বড় করে দেখেছেন সত্য কিন্তু তাঁরা যথার্থই দুই ধর্ম দুই দেশ চিন্তা করেননি।

জিন্নাহ যখন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করলেন তখন খণ্ডিত বাংলা, খণ্ডিত পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বাইরের মুসলমানদের কথা ভাবলেন না। পৃথিবীতে ধর্মের ভিত্তিতে যে কোনো রাষ্ট্র হয় না, 'আধুনিক ও সেক্যুলার' জিন্নাহর মনোজগতে সেটি ধরা পড়েনি। তিনি ভারতে অবস্থিত কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার বিনিময়ে তৈরি নতুন দেশের পিতা হয়েছিলেন। কিন্তু সীমান্তের ওপারে একবারও তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। কুলদীপ নায়ার নিজেই জিন্নাহর উদ্ধৃত করেছেন: Hindus and Muslims belong to two different religions, philosophies, social customs, and literatures. They neither intermarry nor inter-dine, and indeed, they belong to two different civilizations that are based mainly on conflicting ideas and conceptions. (পৃষ্ঠা ২১)

কী ভয়ংকর কথা। এই জিন্নাহ নিজেও বিয়ে করেছেন এক পার্শি নারীকে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভারতে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য ছিল। শিক্ষা, দীক্ষা, বিত্ত বেসাত এবং সংখ্যায় হিন্দুরা এগিয়ে এবং মুসলমানরা পিছিয়ে ছিল। জিন্নাহ সেই সমস্যার সমাধান খুঁজলেন দেশ ও জাতি ভাগের মাধ্যমে।

এর বিপরীতে আমরা আবুল কালাম আজাদের রাজনৈতিক দর্শন বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, তিনি শেষ দিন পর্যন্ত পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, যে কারণে জিন্নাহ তাঁকে কংগ্রেসের নেতা হিসেবে স্বীকার করেননি। তিনি মনে করতেন, মুসলমান মানেই মুসলিম লীগের সমর্থক হবেন। তবে এই মতবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। উর্দু সাময়িকী *চেতন*-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন: Today the Muslims are not walking, they are flowing. The problem is that Muslims have not learnt to walk steadily; They either run or flow with the tide. When the group of people loses their confidence and self-respect, they are surrounded by imaginary doubts and dangers and fail to make a distinction between right and wrong. The true meaning of life is realized not through numerical strength but

through firm faith and righteous action. (পৃষ্ঠা ৩৩)

বইয়ের ভূমিকায় কুলদীপ নায়ার বাংলাদেশ সম্পর্কে গভীর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশ যেদিন স্বাধীন হয়, সেদিন থেকেই এর ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করে আসছি। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে অনেকের মতোই আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ আছে এবং সেই সম্পর্কের জন্য আমি গর্বিতও। আমি বিশ্বাস করি, একদিন দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো দেশ মিলে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য পরিচয় পরিত্যাগ না করেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো অভিন্ন ইউনিয়ন গড়ে তুলবে। এবং এটি আমাদের সব দেশের দারিদ্র্য সমস্যা দূর করতে এবং ধনী ও গরিবের মধ্যে বৈষম্য কমাতে সাহায্য করবে।' (পৃষ্ঠা ১০)

তিনি আরও বলেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে একদিন দুই দেশ শান্তি, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মধ্যে বসবাস করার উদ্যোগ নেবে। বাণিজ্য ও সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে তারা একযোগে কাজ করবে।' (পৃষ্ঠা ১১)

৩.

কুলদীপ নায়ারের সাংবাদিকতা শুরু উর্দু পত্রিকা *অনজাম*-এর মাধ্যমে। এই পত্রিকার মুসলিম মালিক তাঁকে চাকরি দিয়েছিলেন, সরকারের উচ্চ মহলে যোগাযোগ রেখে যাতে তাঁর পত্রিকা ও সম্পদ রক্ষা করা যায়। যখন সম্পাদকের সম্পদ রক্ষিত হলো না তখন তাঁকে ছাঁটাই করা হয়। এরপর স্বাধীনতাসংগ্রামী মাওলানা হাসরাত মাহানীর, যিনি প্রথম ভারতের স্বাধীনতার কথা বলেন, তাঁর পরামর্শে ইংরেজি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করার চেষ্টা করেন। বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান সাংবাদিকতা পড়তে, পরে একাধিক ইংরেজি দৈনিকে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে লেখক-রাজনীতিক হুমায়ুন কবিরের সহায়তায় তাঁর ফিচার এজেন্সির মাধ্যমে ইংরেজি সাংবাদিকতা শুরু করেন। তাঁর প্রথম লেখা ছিল 'To Every Thinking Refugee'। সেই নিবন্ধ তিনটি পত্রিকায় ছাপা হয় এবং পরবর্তীকালে কুলদীপ সিন্ডিকেটেড লেখক-সাংবাদিক হিসেবে ভারতে ও বিদেশে পরিচিতি লাভ করেন।

মাঝখানে সাংবাদিকতা ছেড়ে কুলদীপ নায়ার ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোতে জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি নেন; তিনি প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লব পন্থ এবং পরে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে কাজ করেছেন। কিছুদিন জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে কাজ করারও অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। সে সময়ে কাছ থেকে কুলদীপ নায়ার এই তিন নেতাসহ কংগ্রেসের আরও অনেক নেতাকে দেখেছেন। তিনি যখন গোবিন্দ বল্লব পন্থের জনসংযোগ কর্মকর্তা, তখন ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলো পুনর্বিন্যস্ত করা হয়, প্রশাসনিক সংস্কার এবং পাকিস্তানের সঙ্গে

সিন্ধু নদের পানি বণ্টন চুক্তি হয়। মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি গুয়াহাটি ও সীমান্ত এলাকাও সফর করেছেন। তাঁর সেই সফরের অভিজ্ঞতা ছিল অম্লমধুর। এক সেনা কর্মকর্তা ট্রাংকে করে চোরাই মাল তাঁর পরিবারের কাছে পাঠান।

নেহরুর মৃত্যুর পর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হন এবং সে সময়ে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ হয়। কুলদীপ নায়ার লিখেছেন, জওহরলাল নেহরু প্রচলিত কোনো ধর্মে বিশ্বাস করতেন না। ১৯৫৪ সালে তিনি লিখে গিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর ধর্মীয়ভাবে যেন শেষকৃত্য করা না হয়। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী ধর্মীয় রীতিতে শেষকৃত্য করার ব্যাপারে অনড় অবস্থান নেন। ফলে নেহরুর অন্তিম ইচ্ছেটি অপূর্ণই থেকে যায়। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর তাসখন্দে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে শান্তি চুক্তি হয়। চুক্তি সইয়ের রাতেই হৃদ্‌রোগে মারা যান লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ললিতা শাস্ত্রী কুলদীপের কাছে অভিযোগ করেছেন, তিনি হৃদ্‌রোগে মারা যাননি। তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে মারা হয়েছে। এ অভিযোগের তদন্ত হয়নি। মোরারজি দেশাই ক্ষমতায় আসার পর কুলদীপ তদন্তের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি এড়িয়ে যান।

শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেই কুলদীপ নায়ার সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাংবাদিকতায় ফিরে যান। প্রথমে বার্তা সংস্থা ইউএনআই, এরপর *স্টেটসম্যান*, *হিন্দুস্তান টাইমস*। এখনো তিনি সাংবাদিকতাই করছেন।

৪.

কুলদীপ নায়ার তাঁর আত্মজীবনীতে 'বাংলাদেশ যুদ্ধ' নামে যে অধ্যায়টি লিখেছেন, সেটি মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান, পাকিস্তানি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ বিভিন্নজনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার এবং নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে। পটভূমি হিসেবে এসেছে ১৯৭০ সালের নির্বাচন, বাঙালিদের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর চক্রান্ত, ২৫ মার্চের সেনা অভিযান, ভারতে লাখ লাখ শরণার্থীর আশ্রয় গ্রহণ, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিরোধ যুদ্ধে ভারতের সহায়তা, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ইত্যাদি।

কুলদীপ নায়ার আরও জানাচ্ছেন, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে খুব কম বিষয়েই অংশীদারি ছিল। পূর্ব পাকিস্তানিদের ভাষা, আচার, জীবনধারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই দুইয়ের মধ্যে একমাত্র সেতুবন্ধ ছিল ইসলাম। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে যখন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলেন, তখন সেই বন্ধনও শিথিল হয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষোভের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এই ভাষা।

কুলদীপ নায়ার লিখেছেন, নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের যেভাবে পাকিস্তান সরকার সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে আসছিল, সেভাবেই ভারত সরকার বাঙালি গেরিলাদেরও সমর্থন জুগিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। বিএসএফ তৎকালীন প্রধান রুস্তমজির জবানিতেও আমরা জানতে পারি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর পুরো সবুজসংকেত দিয়ে বলেছিলেন, 'সাহায্য করো কিন্তু ধরা পোড়ো না।'

কুলদীপ নায়ারের বিশ্লেষণ হলো, বাঙালি মুসলমান বাঙালি হিন্দুদের চেয়েও বেশি অপছন্দ করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের। যেমনটি পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানরা পাঞ্জাবি হিন্দুদেরই কাছের মনে করে বাঙালি মুসলমানদের থেকে।

এ কারণে পশ্চিম পাকিস্তানিরা কাশ্মীর নিয়ে যখন আন্দোলন-সংগ্রাম করছে, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা মনে-প্রাণে তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। কেননা, তাদের কাছে কাশ্মীর অনেক দূরের। বাঙালি কূটনীতিক আজিজুল জলিল জানিয়েছেন, পঞ্চাশের দশকে তিনি যখন লন্ডনে পাকিস্তান হাইকমিশনে, শেখ মুজিবুর রহমান ওয়াশিংটন থেকে লন্ডন হয়ে দেশে ফিরছিলেন। লন্ডনে যাত্রাবিরতিকালে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। একপর্যায়ে কাশ্মীরের কথা উঠতেই মুজিব তাঁকে বললেন, 'ওটি আমাদের সমস্যা না। পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যা।'

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের বেরিয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে কুলদীপ নায়ার অর্থনৈতিক বৈষম্য, পাকিস্তানি শাসকদের জবরদস্তি, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর অপ্রতুল সাহায্যের কথা লিখেছেন। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের মনোজগতে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালিত, তাঁরাও যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার বহন করেন সে কথা উল্লেখ করেননি।

ইয়াহিয়া খান হামুদুর রহমান কমিশনের কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে স্বীকার করেছেন, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করতে ভুট্টো তাঁকে বাধ্য করেছিলেন। নায়ার মনে করেন, এই ঘটনাই পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যায়।

১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে ভুট্টো ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে খণ্ডিত পাকিস্তানের শাসনভার নেওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে এই কমিশন গঠন করলেও রিপোর্ট প্রকাশ করেননি। নব্বইয়ের দশকের শেষার্ধে পারভেজ মোশাররফ এই রিপোর্ট প্রকাশ করলে পাকিস্তানে হইচই পড়ে যায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহায়তা করলেও এর পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না, বিশেষ করে ভারতের ভয় ছিল আমেরিকা ও চীন এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তাদের ওপরই বেশি আঘাত আসবে। সে কারণেই তারা অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের

সঙ্গে চুক্তি সইয়ের আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আরেকটি চুক্তি সই করে।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রেকর্ড থেকে জানা যায়, মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিরা কলকাতায় মার্কিন কনসাল জেনারেলের সঙ্গে যে আলোচনা করেন তাতেও ভারতের কোনো কোনো মহলের সম্মতি ছিল।

কুলদীপ নায়ার আরও জানান, 'অক্টোবরেই এটি স্পষ্ট হয় যে আমরা এই বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে পড়েছি।' প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবেরা কয়েকজন সম্পাদককে একটি পরামর্শ সভায় আমন্ত্রণ জানান এবং মুজিবনগর নির্বাচনের অবস্থান প্রকাশ না করার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানান। মুজিবনগর সরকার কলকাতায় অবস্থান করলেও পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশের ভেতরে আছে বলে গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়।

সেই বৈঠকে একজন সম্পাদক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, বাংলাদেশ হবে তলাবিহীন ঝুড়ি, যাকে সহায়তা করার সামর্থ্য ভারতের নেই। এর জবাবে একজন সচিব জানান, 'তিনিও তাঁর (সম্পাদক) সঙ্গে একমত। কিন্তু সিদ্ধান্ত আগেই হয়ে গেছে।'

বাংলাদেশের প্রথম ভারতীয় হাইকমিশনার সুবিমল দত্তের বরাত দিয়ে তিনি আরও জানান, The decision was to support the uprising against West Pakistan and help the movement for the creation of Bangladesh. (পৃষ্ঠা ২০৯)

যুদ্ধ ও প্রেমে সত্য নিহত হয়। কুলদীপ নায়ার সে সময় ভারতের গণমাধ্যমের একপেশে সংবাদ পরিবেশনার কথাও উল্লেখ করেছেন। স্বভাবতই ভারতের সব গণমাধ্যমের সহানুভূতি ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। কুলদীপ নায়ারের বইয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আরেকটি নতুন তথ্য দিয়েছেন, যা আগে চোখে পড়েনি। যুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তান মনে করেছিল, ভারত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য সীমান্ত এলাকাগুলো দখল করতে চেয়েছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বিদেশ সফরে গিয়ে ৫০ মাইল এলাকামুক্ত করার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন, স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শরণার্থীদের পুনর্বাসন করা হবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের কারণে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। পাকিস্তানের ধারণা ছিল, ভারতের অভিযান হবে সীমিত পরিসরে। তারা ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ চালায়, যাতে পূর্বাঞ্চল নিয়ে ওরা বেশি ব্যস্ত থাকতে না পারে।

কুলদীপের জবানিতে আমরা আরও জানতে পারি যে যুদ্ধের সময় লে. জেনারেল হরবক্স সিং সেনা অভিযান ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলি সম্পর্কে প্রতিদিন ব্রিফ করতেন। তিনি *স্টেটসম্যান*-এ প্রতিদিনই এ মিলিটারি এক্সপার্ট ছদ্মনামে একটি কলাম লিখতেন।

যুদ্ধের শেষদিকে ভারতীয় বাহিনীর মন্থর অগ্রাভিযানে মস্কো উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। কেননা, তারা চায়নি বাংলাদেশ ভিয়েতনাম হোক। সোভিয়েত প্রথম উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যাসিলি কুজনেটভ যুদ্ধের সর্বশেষ অবস্থা জানতে জরুরি ভিত্তিতে দিল্লি আসেন এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তাদের কাঠামো ভেঙে পড়েছে এবং আত্মসমর্পণের ঘটনা তিন বা চার দিনের ব্যাপারমাত্র।

কুলদীপের জবানিতে আমরা আরও জানতে পারি, যুদ্ধের প্রহরটি সবার জন্যই ছিল উদ্বেগের। পাকিস্তান পরাজয় এড়াতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সহায়তা চায়। নয়াদিল্লি ভারত-পাকিস্তান বিরোধে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ নেবে না, এই প্রতিশ্রুতির কথা ওয়াশিংটনকে মনে করিয়ে দেয়। চীনকে ভয় দেখাতে সোভিয়েতকে প্রস্তুত থাকতে বলে। যুক্তরাষ্ট্র যখন বুঝতে পারল যে পূর্ব পাকিস্তান ইসলামাবাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখন তারা মস্কোর মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে আর অগ্রসর না হওয়ার জন্য হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে। এমনকি তারা প্রস্তাবিত ব্রেজনেভ-নিক্সন বৈঠক বাতিল করারও হুমকি দেয়।

যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ভয় দেখাতে পারমাণবিক অস্ত্রবাহী সপ্তম নৌবহর পাঠায় বঙ্গোপসাগরে। এর জবাবে মস্কো সোভিয়েত অষ্টম নৌবহর পাঠায়।

শরণ সিং জাতিসংঘ থেকে টেলিফোনে নয়াদিল্লিকে জানান দ্রুত অপারেশন শেষ করার জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁকে জানিয়েছেন, বেশি দিন অস্ত্রবিরতি প্রস্তাব ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অর্থাৎ বাংলাদেশের যুদ্ধে বৃহৎ শক্তিগুলো প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে।

মস্কো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাজনৈতিক সমাধানের যে প্রস্তাব দেয়, তা গ্রহণ করলে অস্ত্রবিরতি হয়ে যেত এবং তখন পাকিস্তানকে অপমানজনকভাবে আত্মসমর্পণ করতে হতো না। ১৫ ডিসেম্বর মার্কিন কূটনীতিকদের কাছ থেকে জেনারেল জ্যাকব টেলিফোন পান যে জেনারেল নিয়াজি ও রাও ফরমান আলি যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কুলদীপ নায়ারের মূল্যায়ন, ভারতের অবদানের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের জনগণ ও মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা বিরাট। তারা নিজেরাই যে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ভারতের সমর্থন ছাড়া বাংলাদেশিরা আরও বেশি সমস্যায় পড়ত এবং যুদ্ধ আরও দীর্ঘ হতো কিন্তু তাদের অবিচলতা এবং দুঃখ-দুর্দশা মেনে নেওয়ার সক্ষমতা খাটো করে দেখা উচিত নয়।

কুলদীপ নায়ার লিখেছেন, পাকিস্তানি শাসকেরা যখন সামরিক অভিযান চালাল, যার ফলে ভারতে শরণার্থীদের ক্ষোভ বইতে থাকে, তখন ভারত সীমান্ত বন্ধ করে

দেওয়ারও চিন্তা করেছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বারবার প্রস্তাব সংসদে আনেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় এই যুক্তি দেখিয়ে যে এটি হবে ভারতের নীতির বিরোধী। এমনকি নেহরুর অবস্থান ছিল দুর্বিসহ ও বিপজ্জনক অবস্থায় যাঁরা আছেন, তাঁদের সহায়তার পক্ষে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'আমি বুঝতে পারি না পাকিস্তান কেন এসব নৃশংসতার জন্য ক্ষমা চাইছে না। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা ফেলার জন্য যদি যুক্তরাষ্ট্র জাপানের কাছে ক্ষমা চাইতে পারে, তাহলে পাকিস্তান নয় কেন?' (পৃষ্ঠা ২১৭)

হামুদুর রহমান রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে কুলদীপ নায়ার লিখেছেন, মদ ও নারীর প্রতি অদম্য বাসনা এবং জমি ও বাড়ির প্রতি লোভের কারণেই জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তারা যুদ্ধে তাদের পেশাগত সক্ষমতা হারিয়েছে, যা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পতন ত্বরান্বিত করেছে।

কুলদীপ নায়ার ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের আগে ও পরের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে এমন কিছু তথ্য দিয়েছেন, যা এর আগে কোনো বই বা দলিলে পাওয়া যায়নি। তাঁর সুবিধা হচ্ছে উভয় পক্ষের প্রধান কুশীলবের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করে তথ্যগুলো যাচাই-বাছাই করে নিয়েছেন। বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী লুটপাট করেছে বলে বেশ গুজব চলছিল। বলা হয়েছিল, সেনারা ঢাকায় বেশ কিছু বাড়িঘর লুটপাট করেছে।

ইন্দিরা গান্ধী ক্ষুব্ধ হলেও তাঁর ভয় ছিল বাংলাদেশ যুদ্ধের পর জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে সেনাপ্রধান ম্যাম মানেক শ সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটাতে পারেন। ইন্দিরা গান্ধী সেনাপ্রধানকে টেলিফোন করে ভারতীয় সেনাদের লুটপাট সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান। তাঁর ভাষায়, 'আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলি, এ রকম কিছু ঘটেনি; তিনি যেন তাঁর কাজ করেন এবং আমাকে আমার কাজ করতে দেন।' (পৃষ্ঠা ২১৪)

কুলদীপ নায়ার বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর মুজিব ও ভুট্টো দুই নেতার সঙ্গেই দেখা করেন এবং পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পান। ভুট্টো বলেছেন, মুজিব তাঁকে প্রথমে পাকিস্তানের সঙ্গে একটি যোগসূত্র রাখার কথা বললে তিনি কথা দেননি। কিন্তু মুজিবের ভাষ্য হলো, 'আমি ধর্মভীরু জেলারের কাছ থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা জানতে পারি। আমাকে জেলখানা থেকে নেওয়ার সময়ে আমি বুঝতে পারি যে ভুট্টো আলোচনার জন্য এটি করেছেন। কিন্তু আমি তাঁকে বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু জানি, সেই ইঙ্গিত দিইনি। আমি তাঁকে এ-ও বলি যে আমি মুক্ত মানুষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো কথা বলব না।' তখন তিনি বললেন, "তুমি মুক্ত।" আমি এ-ও জানি যে ইয়াহিয়া খান যা করেছেন তার পেছনে ভুট্টো

ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগের বিষয়টি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান একসঙ্গে পরিচালনা করতে পারে কি না? আমি তাকে বলি, এটি এখন আর সম্ভব নয়। কিন্তু যখন তিনি এ ব্যাপারে চাপ দিচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁকে বলি যে আমার জনগণের সঙ্গে কথা না বলে আমি তোমাকে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারি না।' (পৃষ্ঠা ২১৯)

কিন্তু ভুট্টো দাবি করেছেন, দুই দেশের মধ্যে যোগসূত্র রাখার ব্যাপারে মুজিব কোরআন শরিফ হাতে নিয়ে শপথ করেছিলেন। এ ব্যাপারে লেখক প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে মুজিব বলেন, 'ভুট্টো একজন মিথ্যাবাদী। তিনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন, এ জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি মিথ্যা প্রচারের অধিকার পেয়েছেন।' (পৃষ্ঠা ২১৯)

এরপর কুলদীপের মন্তব্য হলো, মুজিবকে ছেড়ে দিয়ে ভুট্টো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি কিছুটা উজ্জ্বল করতে চেয়েছিলেন। (তাঁর ভাষায়, '...আমি নাইট অ্যাঙ্গেলকে ছেড়ে দিয়েছি।' কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার পর জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে তিনি ইয়াহিয়ার কথারই পুনরুক্তি করেন, 'আমরা পাকিস্তানের মর্যাদা ও অখণ্ডতার জন্য লড়াই চালিয়ে যাব। পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।' (পৃষ্ঠা ২২০)

কুলদীপ জানাচ্ছেন, সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যুদ্ধের ময়দানে হেরে যাওয়ার পরও পাকিস্তানিরা প্রচারণা যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিল। রেডিও পাকিস্তানের ঘোষণায় পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সময়ও বলা হতো। পাকিস্তানি সংবাদপত্রগুলোয় ঢাকা সংস্করণ উল্লেখ থাকত, যদিও বাস্তবে তা ছিল না।

কুলদীপ নায়ারের বইয়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতিও সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের প্রায় সব রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ১৯৭৫ সালে বিপথগামী সেনাসদস্যদের হাতে যখন মুজিব নিহত হন, তখন ভারতে চলছিল জরুরি অবস্থা, কুলদীপ জেলে। তিনি লিখেছেন, ভারতের গোয়েন্দারা মুজিবকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল। জবাবে অতি আত্মবিশ্বাসী মুজিব বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে আমাকে কে হত্যা করবে?'

কুলদীপের দেওয়া তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশে সেনা অভ্যুত্থান সম্পর্কে আগে থেকেই ভারতের আশঙ্কা ছিল। ১৯৭২ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাংলাদেশ ত্যাগের সময়ই বাংলাদেশে যাতে কোনো ট্যাংক না রাখা হয় সে ব্যাপারে চাপ দিয়েছিলেন ডিপি ধর, ইন্দিরা গান্ধীর পরিকল্পনামন্ত্রী। তাঁর আশঙ্কা ছিল, বাংলাদেশে ট্যাংক রাখা হলে সেনাবাহিনী অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে। (পৃষ্ঠা ২২৩) ১৯৭৫ সালে সেই অভ্যুত্থান তারা ঘটিয়েছে মুজিবকে আনোয়ার সাদাতের উপহার দেওয়া ট্যাংকের সহায়তায়।

কুলদীপ নায়ার শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার শাসনকে মোটামুটি কাছ থেকে দেখেছেন। এরশাদের শাসনামলে তিনি বহুবার বাংলাদেশে এসেছেন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দুই নেত্রীকে একযোগে আন্দোলন করার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, আপনারা এক হলেই কেবল সামরিক শাসনের অবসান ঘটতে পারে। নব্বইয়ে সামরিক শাসনের অবসান ঘটলেও গণতন্ত্র যে টেকসই হয়নি তার প্রমাণ বর্তমান বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বিষয়ে কুলদীপ মনে করেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক টেকসই করার বিষয়টি বাংলাদেশের চেয়ে ভারতের ওপরই বেশি নির্ভর করে। যদি দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ হয়ে থাকে সেটি হয়েছে দুই দেশের আমলাতন্ত্রের মানসিকতার কারণে। কিন্তু গত সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে এ ব্যাপারে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব সুজাতা সিংয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, 'ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত চুক্তি তো আমরা আটকে রাখিনি।' (লেখকের সঙ্গে দিল্লিতে সাক্ষাৎকার) তাঁর এ মন্তব্যও বেঠিক নয়। তা ছাড়া কুলদীপ যে মানসিক সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন, তার দায় কেবল আমলা নয়, রাজনীতিকদেরও রয়েছে। বাংলাদেশ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তুলে লিখেছেন, CPM leader Jyoti Basu had come around to sharing the water at the Farakka Barrage even at the expense of accumulation of silt in the Hoogly making it impossible for large ships berthing at Kolkata. Mamata may one day come around to sharing the Teesta waters with Bangladesh. Till that happens this issue will be a major irritant between Dhaka and New Delhi. (পৃষ্ঠা ২২৮)

৫.

কুলদীপ নায়ার যেসব নেতা ও রাষ্ট্রনায়কের সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জয় প্রকাশ নারায়ণ, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, গুজরাল লাল নন্দ, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, কৃষ্ণ মেনন, আবদুল গাফ্ফার খান, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজি দেশাই, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, চন্দ্র শেখর, আই কে গুজরাল, সোমনাথ চ্যাটার্জি, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, পাকিস্তানে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, আইয়ুব খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো, নওয়াজ শরিফ, বেনজির ভুট্টো, শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া প্রমুখ। বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনির মধ্য দিয়ে নেতা-নেত্রীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি নিজেকে অনেকটা

আড়ালে রেখে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। সরকারি কর্মকর্তা ও সাংবাদিক হিসেবে কুলদীপ নায়ার উপমহাদেশের অনেক ঘটনার সাক্ষী। কুলদীপের ভাষায়, 'অধিকাংশের কাজকর্ম আমাকে হতাশ করেছে এবং আমার অভিজ্ঞতা হলো যারা উচ্চপদে আসীন তাদের বেশির ভাগই তাদের মর্যাদা বাড়ায়নি, তারা কর্তৃত্বপরায়ণ কিন্তু অন্তঃসারহীন। তাঁর সাক্ষ্যদান সব ক্ষেত্রে শতভাগ নিরপেক্ষ হয়েছে বলা যাবে না। তবে দুটি বিষয়ে তিনি সব সময়ই আপসহীন—গণতন্ত্র ও মানবাধিকার। এ কারণেই কুলদীপকে আমরা ভারতে পাকিস্তানি বন্দীদের এবং পাকিস্তানে ভারতীয় বন্দীদের মুক্ত করার ব্যাপারে সোচ্চার হতে দেখি।'

কুলদীপ নায়ার এপিলগ নামে যে অধ্যায়টি লিখেছেন, তা মানবিক চেতনা ও হার্দিক অনুভূতিতে উজ্জ্বল। দেশে-বিদেশে যেকোনো অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্য তাকে আহত করে। মানবাধিকারকর্মী হিসেবে তিনি কাশ্মীরে কাজ করছেন, যাঁরা তাঁদের নিজেদের সত্তা খুঁজে ফিরছেন। বিহারে কাজ করেছেন ভূমিদস্যু ও প্রতারণাকারীদের বিরুদ্ধে, বৃহৎ বাঁধের মাধ্যমে যেসব কৃষক ও আদিবাসীকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি স্মরণ করছেন, ১৯৯৬-এ রেলস্টেশনে এক মুসলিম যুবক তাঁর মাকে দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করছেন। কুলদীপ নায়ার কেবল তাঁর লেখার মাধ্যমে উপমহাদেশে শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে প্রচারণা চালাননি, মানবাধিকারকর্মী হিসেবে তিনি এসব আন্দোলনেও সক্রিয় আছেন।

কুলদীপ নায়ার কৈশোরে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও পরবর্তীকালে যথাসম্ভব বাম পন্থাকে এড়িয়ে চলেছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মুক্ত অর্থনীতির প্রতিই তাঁর ঝোঁক। তার পরও ভারতের মাওবাদী আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি লক্ষ করা যায়। তিনি লিখেছেন, 'মাওবাদী সহিংসতার বিষয়টি আইনশৃঙ্খলাজাত সমস্যার চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে হবে এবং এর সমাধানে আর্থসামাজিক বৈষম্য দূর করতে হবে। যদিও রাষ্ট্র কর্তৃত্ববাদী কায়দায় এই সমস্যার সমাধান করতে চাইছে।' (পৃষ্ঠা ৪৪৬)

কুলদীপ নায়ার পর্যায়ক্রমে জনতা পার্টি, রাজিব গান্ধী, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, নরসিমা রাও, অটল বিহারি বাজপেয়ি, আই কে গুজরাল ও মনমোহন সিং সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলো খুব কাছ থেকে দেখেছেন। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ছাড়া অন্যদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল চমৎকার। কিন্তু তিনি যখন কোনো নেতার প্রশংসা বা সমালোচনা করেছেন, সেটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে থেকেই।

তাঁর মতে, নরসিমা রাওয়ের সাফল্য ভারতে তিনিই প্রথম অর্থনৈতিক সংস্কারে হাত দেন, নেহরুর মিশ্র অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে এসে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে গ্রহণ করেন। অর্থমন্ত্রী হিসেবে যিনি এই গুরুদায়িত্ব

পালন করেন তিনি ড. মনমোহন সিং, বর্তমানে দেশটির প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তী সব কটি সরকারই অর্থনৈতিক সংস্কারের সেই ধারা এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

নরসিমা রাওয়ের আমলে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর কর সেবার নামে উগ্রপন্থী হিন্দুরা বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়। তখন উত্তর প্রদেশে ক্ষমতায় ছিল বিজেপি। তাদের সহযোগী আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। কুলদীপ নায়ার লিখেছেন, এসব কট্টরপন্থী সংগঠন যখন বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিল কেন্দ্রীয় সরকার তাদের মোকাবিলায় কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

এ ব্যাপারে কুলদীপের কঠোর মন্তব্য, 'দিনদুপুরে ধর্মনিরপেক্ষতাকে হত্যা করা হলো। বিজেপি নেতারা একে নিছক একটি স্থাপনা হিসেবে দেখলেও এটি ভারতের অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো ছিল।' সে সময়ে একটি পত্রিকা লিখেছিল, 'মহাত্মা গান্ধী গুলিবিদ্ধ হন ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি, কিন্তু তিনি নিহত হন ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর।' (পৃষ্ঠা ৩৮১)

নায়ার সাক্ষ্য দিচ্ছেন : 'আমি এও জেনেছি যে নরসিমা রাও বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার ঘটনাটি জানতেন। কর সেবকেরা যখন মসজিদ ভাঙতে শুরু করে তখন তিনি পুজো দিতে শুরু করেন এবং যখন শেষ পাথরটি সরানো হয় তখন পুজো থেকে ওঠেন। যখন একজন রাওয়ের কানে কানে বললেন, "মসজিদ ভাঙার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এক সেকেন্ডের মধ্যে রাওয়ের পূজা-অর্চনাও শেষ হলো"।'

যদিও নরসিমা রাও তাঁর আত্মজীবনীতে বাবরি মসজিদ রক্ষায় তাঁর সরকার যথাসাধ্য সবকিছু করেছে বলে দাবি করেছেন। রাও তাঁর বইয়ে একটি খাঁটি কথা লিখেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এমনই কলুষিত যে এর বিরোধিতা করতেও সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিতে হয়।'

তবে এও সত্য বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীসহ অনেক জাঁদরেল নেতাকেই তদন্ত কমিশনের সামনে জবানবন্দি দিতে হয়েছে।

কমিশন নরসিমা রাওকে জিজ্ঞেস করছিল, কংগ্রেস সরকার ভোটের সুবিধা আদায়ে ১৯৮৯ সালের ১০ নভেম্বর মসজিদের কাছে প্রতিমা স্থাপন করেছিল কি না। উত্তরে রাও বলেছেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে কিছু জানতাম না। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিংকে জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে, তিনিই এ বিষয়টি দেখতেন।'

প্রশ্ন : আপনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ও ধর্ম সংসদকে কীভাবে দেখছেন?

উত্তর : আমি এদের সংগঠন হিসেবেই স্বীকার করি না।

প্রশ্ন : সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

উত্তর : ভারতের সংস্কৃতি ভারত ছাড়িয়ে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং আরও বহু দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে। তাই আজ ভৌগোলিকভাবে যাকে ভারত বলা হয়,

ভারতীয় সংস্কৃতির তুলনায় তা খুবই ছোট। (পৃষ্ঠা ৩৮২)

শিবারহান কমিশন রাওকে দায়মুক্তি দিলেও হালে রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের তাৎপর্যটুকু উল্লেখ করেছেন কুলদীপ নায়ার, 'গান্ধী পরিবারের কেউ থাকলে (দায়িত্বে) মসজিদ ধ্বংস হতো না।'

তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রাজেশ পাইলট বলেছেন, তিনি রাতারাতি মন্দির সরিয়ে ফেলতে পারতেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অনুমতি দেননি। কুলদীপ আরও জানাচ্ছেন, 'সংস্কারমুক্ত ও সেক্যুলার' রাজিব গান্ধীও এই দায় থেকে মুক্ত হতে পারেন না, কেননা ১৯৮৯ সালে বাবরি মসজিদের কাছাকাছি শিলান্যাসের মাধ্যমেই তিনি নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছিলেন।

কুলদীপ আদভানির কঠোর সমালোচনা করে লিখেছেন, কল্যাণ সিং ও এল কে আদভানির হাত মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত, যাঁরা সমাজ ও ধ্বংসের কারণে নিহত হয়েছেন। (পৃষ্ঠা ৩৮৩)

কমিশন এই রিপোর্ট তৈরিতে ১৭ বছর সময় লাগিয়েছিল, তবে তারা যে রিপোর্টটি দিয়েছে তা যথার্থ। তারা বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য এল কে আদভানি, মরলী মনোহর যোশী, কল্যাণ সিংকে দায়ী করেছেন। কুলদীপ লিখেছেন, 'বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার ঘটনা আমাকে যে ব্যথিত করেছে তা অপরিসীম। মসজিদ আমার কাছে একটি স্থাপনা মাত্র নয়। এটি আমাদের বহুমাত্রিক চেতনা এবং সমন্বিত সংস্কৃতি প্রতিনিধিত্ব করে, যা শত শত বছর ধরে একখানা ইটের পর আরেকখানা ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছে।'

২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগ দাবি করে কুলদীপ নায়ার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি মনে করেন এই দাঙ্গার পেছনে নরেন্দ্রর ইন্ধন ছিল। এ রকম প্রতিবাদ তিনি আরও বহুবার করেছেন। অন্যান্য সাংসদ বিষয়টি সহজভাবে নিলেও নায়ার রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি লিখে জানান, 'আমি যেহেতু অধিবেশনে যাইনি এ সময়ে ভাতা নেওয়া যুক্তিসংগত হবে না।' তিনি যখন কাশ্মীরি জনগণের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ান তখন নয়াদিল্লির শাসকেরা সন্দেহের চোখে দেখেন, আবার পাকিস্তানে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বললে ইসলামাবাদ অযাচিত হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন।

কুলদীপ নায়ারের কর্মজীবন বৈচিত্র্যময়। তাঁর অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারও সমসাময়িকদের চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। *বিয়ন্ড দ্য লাইনসে* তিনি সমাজের সেই সব মানুষের কথাই বেশি বলতে চেয়েছেন, যারা আছে সবার পিছে, সবার নিচে।

শত বিপত্তি এবং চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যেও তিনি গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে অবিচল থাকেন। সেই বিবেচনায় *বিয়ন্ড দ্য লাইনস* গণতন্ত্র ও মানবাধিকারেরই দলিল।

বই আলোচনা

বাঙালি এক ইতিহাসবিদের আত্মকথনে সমসাময়িক সমাজ-রাজনীতি

মোশারফ হোসেন

(*বাঙালনামা*, তপন রায় চৌধুরী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, মে ২০০৭।)

বাঙালনামা তপন রায় চৌধুরীর সমগ্র জীবনের স্মৃতিকথা। এ গ্রন্থে লেখক নিজেকে যতটা আলোচনা করেছেন, তার চেয়ে বেশি তিনি তাঁর চারপাশের মানুষগুলোকে তুলে ধরতেই যেন বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। যা তাঁর স্মৃতিকথায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। লেখক এ গ্রন্থের কোথাও রাজনীতি, অর্থনীতি—এমনকি সমাজের ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। তিনি কেবল নিজের জীবনের সঙ্গে যেসব আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা জড়িত, সেগুলো প্রসঙ্গক্রমে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাই বিশ শতকের প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে একুশ শতকের আগ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ, ভারত, ইংল্যান্ড, আমেরিকাসহ পাশ্চাত্য বিশ্বের নানা স্থানের সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতির বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে বিচরণ করে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন, তাঁর এ উপলব্ধিগত বর্ণনায় আমরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সে সময়টাতে বিচরণ করব। এ গ্রন্থে লেখক মূলত তাঁর অবস্থানকালীন স্থান ও সময় এবং চারপাশের বিভিন্নমুখী চরিত্রগুলো সম্পর্কে অত্যন্ত চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তাঁর বয়সের সঙ্গে বহমান সমাজের নিয়ামকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনাগুলো এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত যে সহজেই পাঠকের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হয়। এটি একটি স্মৃতিকথা হলেও লেখক একজন ঐতিহাসিকের দৃষ্টি ও অনুভূতি নিয়েই রচনাটি করেছেন। ভাবালুতার আতিশয্যে তিনি হারিয়ে যাননি। লেখক তাঁর বর্ণনার পরতে পরতে পাঠকদের উদ্দীপনা ও কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন, যা রচনাটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। তা ছাড়া লেখক একজন ইতিহাসবিদ

হিসেবে ইতিহাসের অনুদ্‌ঘাটিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, যা ভবিষ্যৎ গবেষকদের অনুপ্রেরণার উৎস।

তপন রায়ের ভাষায়, 'ত্রিশ বা চল্লিশের দশকের বাঙালি সমাজের সঙ্গে আমার দৃষ্টিতে আজকের যুগের সমাজের সব চেয়ে বড় তফাত প্রধানত এক বিষয়ে। সে সময় জীবনের নানা ক্ষেত্রে কিছু মানুষ দেখেছি—যাঁরা আদর্শনিষ্ঠায় চরিত্রগুণে অনন্যসাধারণ। তাঁরা নানা পথের পথিক—কেউ দেশের বা সমাজের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ, কেউ জ্ঞানসাধক, কেউ সাহিত্য বা শিল্পপ্রেমিক, কেউ বা ধর্মপ্রাণ মানুষ। একটি ব্যাপারে এইসব বিভিন্নধর্মী মানুষ কিন্তু একই পথের পথিক ছিলেন। এঁরা সকলেই ব্যক্তিস্বার্থ আর দৈনন্দিনতার বাইরে এমন কিছু জিনিসকে জীবনের প্রধান অবলম্বন বলে আঁকড়ে ধরেছিলেন, সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ যাকে মূল্যবান মনে করেছে। এঁদের বেশির ভাগই আমাদের রাজনৈতিক, সংস্কৃতিগত বা ধর্মীয় ইতিহাসে পরিচিত নাম নন। কিন্তু এঁদের জীবনচর্যা বহু মানুষকে বেঁচে থাকা ব্যাপারটাকে একটু উঁচু তারে বাঁধতে উদ্বুদ্ধ করত। তখন জীবনে সুযোগ-সুবিধা, বৈষয়িক উন্নতির সম্ভাবনা নিতান্তই সীমিত ছিল। বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত মানুষ ফলে একটা অভাব বা ব্যর্থতাবোধে ভুগত। আমি যাঁদের কথা বলছি, তাঁরা শ্বাসরোধকারী পরিবেশের প্রভাব উপেক্ষা করে এক মহত্তর জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।' (পৃ. ৭১-৭২)

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'বর্তমান রচনাটি অনেকাংশেই বিস্মৃত বা লুপ্ত জগতের কাহিনি। লুপ্ত কী অর্থে? যে-ধরনের মানুষ একসময়ে দেখেছি, সেই ধরনের মানুষ তাঁদের বিশিষ্ট জীবনচর্যা, মনোভঙ্গি আর বিশ্বচেতনা নিয়ে পৃথিবী থেকে সরে গেছেন। তাঁদের পরে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে পূর্বগামীদের সাদৃশ্য কম। এটা ভালমন্দ বিচার বা উন্নতি/অবক্ষয়ের কথা না। গভীর অথচ প্রায় অদৃশ্য সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস।...সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে মানুষের মূল্যবোধে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। যাঁদের কথা বলব, তাঁরা দোষে-গুণে ভরা রক্তমাংসের মানুষই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মূল্যবোধ আজকের জীবনে বিশেষ দেখতে পাই না। ফলে তাঁদের জীবনচর্যার ধারাও লুপ্ত হয়ে গেছে মনে হয়।' (পৃ. ১২৩) অর্থাৎ লেখকের জীবনস্মৃতি কোনো গল্প-উপন্যাস নয়, আবার সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনো ঘটনার ধারাবর্ণনাও নয়। মানবজীবনের অতিবাহিত বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রার বর্ণনা। তাই দৃশ্যপট কখনো খুব দ্রুত, কখনো আকস্মিকভাবেই পরিবর্তিত হয়েছে। স্মৃতি কখনো পরতে পরতে সাজানো থাকে না। স্মৃতির ডালায় পরিপূর্ণ ঘটনাবলি থেকে বেছে বেছে তৈরি করা এ গ্রন্থে প্রসঙ্গান্তর তাই স্বাভাবিক জীবন-প্রক্রিয়ার মতোই। কেবল নিজের জীবনগাথা নয়, লেখক তাঁর জীবনের বাল্য থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত যথাসম্ভব ব্যক্তিত্বকে গেঁথে

দিয়েছেন। তাই তপন রায় চৌধুরীর এ জীবনস্মৃতি খুঁজলে পাঠক শতাধিক ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাবেন, যা গ্রন্থটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থটির প্রসঙ্গান্তরের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এর ৯৬ থেকে ৯৮ পৃষ্ঠা। প্রথম পৃষ্ঠাটিতে লেখক স্কটিশ চার্চ কলেজের বিচিত্র চরিত্রগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তার ধারাবাহিকতায় ইংরেজি সাহিত্যের আগ্রহ থেকে তিনি কীভাবে ইতিহাসে আগ্রহী হলেন, তার বর্ণনা দেন। এর পরই লেখক চলে যান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর কী দৃশ্য দেখেছিলেন, তার বর্ণনায়। পরের প্যারাতেই লেখক চলে যান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এবং সেখান থেকে কংগ্রেসের রাজনীতি তথা ভারতীয় রাজনীতিতে। প্রসঙ্গের এই পরিবর্তনের অর্থ এটা নয় যে লেখক এলোমেলোভাবে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন, বরং তাঁর সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার বৈচিত্র্যকে লেখক চমৎকারভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন এবং পরস্পরবিচ্ছিন্ন এ ঘটনাকে তিনি নিজের প্রত্যক্ষ দর্শনের সূত্রে আবদ্ধ করে অসাধারণ পরম্পরা তৈরি করে গেছেন।

মোট ২৩ পরিচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে লেখক তাঁর জীবনের চালচিত্র তুলে ধরেছেন। তিন ধরনের জীবনপ্রণালি লেখকের জীবনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে—তাঁর জন্মস্থান পূর্ব বাংলা তথা বরিশালের জীবন, কলকাতা ও দিল্লিতে বসবাস এবং ইংল্যান্ড ও আমেরিকার প্রবাস। দেশ বিভাগ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও বিশ্বযুদ্ধের মতো উত্তাল সময় পেরিয়ে লেখক এক সর্বজনীন সভ্যতাকে গ্রহণ করেছেন, তা হলো মানবিকতা। মূলত মানুষের জীবনের সব নিষ্ঠুরতার আড়ালে থাকা প্রবল মানবিক চেতনাকেই লেখক সন্ধান করেছেন।

আর ভারত উপমহাদেশের জনমানুষের মনোবৈকল্য বিশ্লেষণে তিনি বারবার ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটকে দায়ী করেছেন। আবার একই প্রেক্ষাপটে একদল ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ মানুষের জীবনদর্শনও লেখকের বর্ণনায় উপজীব্য হয়েছে। তাই লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতার মতোই তাঁর এই গ্রন্থও বিষয়বস্তু ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সমগ্র গ্রন্থেই অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এবং লেখক নিজের দৃষ্টিতে বিচার-বিবেচনা করে তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরেছেন। আর মাঝেমধ্যেই সামাজিক সমস্যার এবং সমঝোতার ছোটখাটো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেছেন। গ্রন্থের মোটামুটি একটা বৃহৎ অংশজুড়ে আছে তাঁর সময়ে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক পালাবদলের চিত্র এবং জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা যেমন : ভারত ছাড় আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশ বিভাগ এবং পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাঁর স্মৃতিগুলো।

লেখক তপন রায় চৌধুরী বরিশালের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের সন্তান। জন্ম ১৯২৬ সালে নানাবাড়ি কুমিল্লাতে। তারপর বেড়ে ওঠা বরিশালে। বাবার অসুস্থতার কারণে সপরিবারে কলকাতায় গমন করেন। সেখানকার জগদ্বন্ধু স্কুলে

লেখাপড়ার প্রথম পাঠ শুরু। এরপর বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তী সময়ে প্যারাটাইফয়েড ও নিজেদের জমিদারির অব্যবস্থাপনার কারণে তাঁর পরিবার বরিশালে ফিরে আসে। সেখানে তিনি বরিশাল জিলা স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪১ সালে মেট্রিক পাস করেন। তারপর ভর্তি হন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে। থাকতেন ডাফ হোস্টেলে। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় ভারত ছাড় আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার হন এবং কারাগারে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। জেল থেকে বের হয়ে পরীক্ষা দেন। ১৯৪৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসে ভর্তি হন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা। কলকাতার হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। এর পাশাপাশি প্রেসিডেন্সি কলেজে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেন। এরপর মৌলানা আজাদ কলেজে শিক্ষকতা করেন। একই সময়ে লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ডি ফিল ডিগ্রির পর স্কলারশিপ নিয়ে অক্সফোর্ডে যান। উচ্চতর ডিগ্রি শেষে দেশে ফিরে দিল্লি আর্কাইভে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীকালে দিল্লি স্কুল অব ইকোনমিকসে অর্থনৈতিক ইতিহাসের রিডার হিসেবে যোগ দেন। এরপর দিল্লি স্কুলে অধ্যাপক ও ডিরেক্টর হন। তৎকালীন ভারতে দিল্লি স্কুল ছিল মহারথীদের মিলনমেলা। কিন্তু লেখক সেখানে পেশাগত সন্তুষ্টি খুঁজে পাননি। কারণ, দিল্লি স্কুল হলো অর্থনৈতিক আলোচনার কেন্দ্র। তাই স্বাভাবিকভাবেই একজন ঐতিহাসিকের তৃপ্তি সেখানে মিটবে কেন? ফলে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগ দেন। ষাটের দশকে গবেষক বা শিক্ষক হিসেবে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখকের যাতায়াত শুরু হয়। ১৯৬১-৬২ সালে লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে এক বছর রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট ছিলেন। ১৯৬৯-৭০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে পড়ানোর জন্য আমেরিকায় যান। ১৯৯৩ সালে লেখকের অবসর জীবন শুরু হয়। কিন্তু অক্সফোর্ডের সঙ্গে লেখকের একটি যোগসূত্র রয়ে যায় সেন্ট অ্যান্টনিস কলেজে ইমেরিটাস ফেলো হিসেবে।

লেখকের জীবনের প্রথম পর্ব বরিশালে কাটলেও তিনি শুরু করেন তাঁর জন্ম সাল ১৯২৬ এবং মাতুলালয় কুমিল্লা শহরের স্মৃতি দিয়ে। যদিও এ দুটি বিষয়ের স্মৃতি অনেকাংশেই তাঁর পরবর্তীকালে সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা অলংকৃত, বর্ণনা দুটি রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক উপাদানসমৃদ্ধ। ১৯২৬, তাঁর জন্ম সালে ভারতে এসেছিল সাইমন কমিশন।[১] সাইমন কমিশন কী, তা জানার আগেই লেখক কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের ওপর ইংরেজ অত্যাচারের ক্ষতচিহ্নের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

রায় চৌধুরী শৈশবের বর্ণনায় বরিশালের তথা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বহু উপকরণের সন্ধান দিয়েছেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক, বর্ণ বিভেদ, নারীদের অবস্থান এবং এ প্রসঙ্গে লেখক তাঁর খেলার সাথি ১০ বছর বয়সী 'সন্না'র কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র বাবা অর্থের বিনিময়ে চল্লিশোর্ধ্ব ব্যক্তির কাছে মেয়েকে বিক্রি করে দেয়। এ ধরনের সামাজিক বিপর্যয়ের ঘটনা শিশুর মনে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে ও লেখকের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল, তা বর্ণনা করেছেন।

লেখক তাঁর পরিবারের কয়েকজন ভৃত্যস্থানীয় মানুষের বর্ণনা করেন, যা নিম্নবর্গের ইতিহাসের উপাদান জোগায়। 'যতি' নামের এক নারী চরিত্রের বর্ণনা দেন, যিনি কোনো সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ না হয়েও লেখকের পরিবারের সদস্য ছিলেন। তার জীবনের করুণ কাহিনি এবং পরিণতি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেন। এর মধ্য দিয়ে সমাজের নারীদের অবস্থার পাশাপাশি ঘৃণ্য একটি প্রথার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। যতি ছাড়া আরও দুটি চরিত্র 'ধর্ম' এবং 'নগা'—এদের বর্ণনা রয়েছে। ভৃত্য শ্রেণীর প্রায় নিরক্ষর এ মানুষগুলো ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির এমনকি সমসাময়িক রাজনীতি সম্পর্কে মোটেই নিরক্ষর ছিল না। মহাভারত ও রামায়ণের কাহিনি এবং নীতিবোধ ছিল তাদের চেতনাগত। লেখকের পরিবারের শিশুরা সাক্ষর হওয়ার আগেই পারিবারিক আবহে নিম্নশ্রেণীর এসব লোকের কাছ থেকে সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করত।

ভারতবর্ষের বৃহত্তর রাজনৈতিক চেতনায় নিম্নবর্গের সম্পৃক্ততার উৎকৃষ্টতর উদাহরণ লেখকের পারিবারিক ভৃত্য 'নগা' বা নগেন্দ্র পরিডা। সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করতে গিয়ে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয় নগেন্দ্র পরিডা। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন তার কাছে মুক্তির দেবতা। ইংরেজ নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে গান্ধীজি একদিন ঘোড়ায় চড়ে যোদ্ধার বেশে মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। আর সে যুদ্ধে শামিল হওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ নগেন্দ্র পরিডা। (পৃ. ৩৪)

এ সময়ে বাংলা তথা ভারতীয় মানসজগতে ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা এক বিচিত্র রূপ লাভ করেছিল। জাতিভেদ, ধর্মীয় মতভেদ, ছোট-বড়, উঁচু-নিচু জাতভেদ সবকিছু মানুষের আধ্যাত্মিক জগতে এসে মিলেমিশে এক হয়ে যেত। তাই নানা ধর্মবৈচিত্র্যের এ দেশে যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় ছিল। কিন্তু ইংরেজ উপনিবেশের অস্থিরতা এ সামাজিক ঐক্যে ভাঙন ধরায়। দেশ বিভাগ সমাজের সামাজিক সম্প্রীতির মূলে আঘাত হানে। যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, উপমহাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা আজও সেই অস্থিরতার হাত থেকে মুক্ত হয়নি।

বরিশালের গ্রামগুলোতে তখন প্রায় প্রতিটি সম্পন্ন শিক্ষিত পরিবারে বইয়ের

বিশাল সংগ্রহ ছিল। এসব পরিবার এবং গ্রামের স্কুলগুলোকে কেন্দ্র করে একটি সাংস্কৃতিক আবহ গড়ে উঠেছিল। তাই লেখক বরিশালকে অভিধা দিয়েছেন 'ভদ্রজনের বাসা'। 'উনিশ শতকে যে পশ্চিমি শিক্ষার শুরু হয়—বাঙালিজীবনে তার একটি মহৎ দান বিশ্ব সংস্কৃতি সম্বন্ধে অন্তহীন কৌতূহল। ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন যে, শিক্ষিত বাঙালি যুবক শুধু নিজের দেশে কি হচ্ছে জেনে তুষ্ট না, লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্কে জ্ঞানের জগতে কি হচ্ছে সে খবর জানার জন্য দুরন্ত আগ্রহী। বরিশালের শিক্ষিত মহলে এই প্রবণতা স্পষ্টতই নজরে আসত।' (পৃ. ৭৪) বরিশালের স্থানীয় দোকানগুলোতেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসসহ বিদেশি ভাষার বই পাওয়া যেত। ফরাসি ভাষার বই এবং ফরাসি জানা লোকও বরিশালে দুর্লভ ছিল না। বহু বিদ্যাব্রতী ব্যক্তি জাগতিক সব দুঃখ-কষ্ট মেনে নিয়ে কেবল জ্ঞানচর্চাকেই তাঁদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছিলেন। সমাজকাঠামোর মূলে এ ধরনের মানুষের অস্তিত্ব সমাজের ভিতকে মজবুত করেছিল, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। উর্বর ভূমি বরিশালের মানুষের হাতে অবসর ছিল আর সে অবসর কেবল গল্প-আড্ডায় কাটত না। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি—সবই ছিল আড্ডার আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু চল্লিশের দশকে এসে রাজনৈতিক হাওয়া বদল হতে থাকে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক ব্যর্থতা এবং মুসলিম লীগের উত্থান বরিশালসহ সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিল। লেখক বলেন, 'ইস্কুলের জীবনে এই পরিবর্তনের ছায়া পড়েছিল। সরকারি ইস্কুল, কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য আলাদা দুটি লোহার ট্যাঙ্কে জলের ব্যবস্থা ছিল। কোনও কোনও মুসলিম সহপাঠী আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন যে, তাঁরা হিন্দুদের ছোঁয়া খান না। সত্যিতে মুসলমানরা ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে মাথা ঘামাত না। কিন্তু নতুন রাজনৈতিক তথা সাম্প্রদায়িক চেতনার যুগে হিন্দুদের ছুৎমার্গের পাল্টা জবাব হিসাবেই ওঁদের মধ্যে এ জাতীয় ব্যবহারের সূচনা হয় বলে আমার বিশ্বাস।' (পৃ. ৭৭) এরূপ আরও কিছু ঘটনা ঘটে, যা সাম্প্রদায়িকতার ভাব-তাপের জানান দেয়।

১৯৪২ সালে লেখক বরিশালে ভারত ছাড় আন্দোলনে[২] যোগ দেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় সারির নেতারা গ্রেপ্তার হওয়ায় কিশোর-তরুণেরা আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে অন্য অনেক কিশোরের সঙ্গে লেখকও গ্রেপ্তার হন এবং ব্রিটিশ ভারতের জেলজীবনের নারকীয় অবস্থার বর্ণনা তাঁর লেখায় উঠে আসে। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন, 'যেসব অনাচার অত্যাচারের কথা বললাম, ইংরেজদের জেল ব্যবস্থাসংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজে তার কোথাও কোনও উল্লেখ কেউ পাবে না। বোধ হয় এই জাতীয় কারণেই সরকারি দলিলপত্রের ভিত্তিতে লেখা ইংরেজ শাসনের ইতিহাস পড়লে শাসকশ্রেণিকে অনেক সময়ই এত শিশুর মতো নিষ্পাপ মনে হয়।'

(পৃ ১০৭) জেলে বসেই লেখক আইএ পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন এবং জেল থেকে বেরিয়ে বরিশালে বসে পরীক্ষা দেন। পরীক্ষা শেষে কলকাতায় চলে যান এবং এখানেই লেখকের বরিশাল জীবনের বর্ণনার সমাপ্তি।

কলকাতার সঙ্গে লেখকের প্রথম পরিচয় ঘটে শৈশবে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আগমনের সময়। তখন কলকাতার প্রতি লেখকের একধরনের ভয় মেশানো কৌতূহল ছিল। দ্বিতীয়বার আসেন লেখকের বাবার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। তাই দীর্ঘ সময় থাকতে হয়েছিল। তাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাও শুরু কলকাতায়, কিন্তু তখন কলকাতা লেখকের ভালো লাগেনি। স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়ে লেখক কলকাতার জীবনের সঙ্গে মিশে যান। কলকাতার জীবনেই লেখক প্রথম প্রত্যক্ষ করেন বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা বাংলার ইতিহাসে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।[৩] '৪৩ সালের নভেম্বর মাস নাগাদ কলকাতার ফুটপাতে গ্রাম থেকে আসা মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। প্রথম দিকে শহরের মানুষ এদের সাহায্য করলেও চালের দাম অসম্ভব রকম বেড়ে যাওয়ায় তা আর সম্ভব ছিল না। রাস্তার দুধারে মৃত মানুষ পড়ে থাকা নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। কিছু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান লঙ্গরখানা খুললেও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের তুলনায় তা ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। ক্রমেই মানুষ চাল ভিক্ষার বদলে ফ্যান ভিক্ষা চাইতে শুরু করল। দুর্ভিক্ষকালীন কলকাতার সামাজিক চিত্রের বর্ণনায় লেখক বলেন, '...কলকাতার ফুর্তি-আমোদে দুর্ভিক্ষের জন্য একটুও ভাটা পড়েনি, বরং ফুর্তির জোয়ার ফেঁপে ফুলেই উঠেছিল। চাল এবং আর সব ভোগ্যবস্তুর দাম বাড়ায় কালোবাজারের কৃপায় অনেকের পকেটেই প্রচুর কাঁচা পয়সা। সে পয়সা নানা বিলাসব্যসনে খরচ করার উপায় শহর কলকাতায় অজস্র। রেস্তোরাঁয় কথাই ধরুন না কেন। কোনও রহস্যজনক কারণে চালের দাম হু-হু করে বাড়া সত্ত্বেও রেস্তোরাঁয় খাবারের দাম প্রায় একই ছিল।' (পৃ. ১২৭)

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে ভারতীয় রাজনীতি নতুন মোড় নেয়। '৪৩-এর দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার আগেই কলকাতা শহর নিমজ্জিত হলো আরেক বিভীষিকায়। '৪৬-এর দাঙ্গা। দেশ বিভাগ নিয়ে দর-কষাকষির একপর্যায়ে মুসলিম লীগ দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। সংগ্রামের প্রথম স্থান ছিল কলকাতা। ১৬ আগস্টের দিনই ঘটে নারকীয় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। দাঙ্গা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতামত থাকলেও একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে লেখক বলেন, 'দাঙ্গা বাধার আগে কলকাতাবাসী হিন্দু-মুসলমান কেউই নিজের বাসস্থান ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি। সকলেই জানেন শহর কলকাতার আবাসনে একটা বিশেষ ছক আছে। মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলিতে অল্প কিছু হিন্দু এবং হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে সামান্য

সংখ্যায় মুসলমানের বাস। যে কলকাতাবাসীরা জাপানি বোমার আশঙ্কায় প্রায় মুক্তকচ্ছ হয়ে মফস্বলে পালিয়েছিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কা করলে তারা যে নিশ্চিন্তে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।' (পৃ. ১৫০-১৫১) যাই হোক, তিন দিনের নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের পর কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হয়, যদিও তার রেশ আরও কিছুদিন চলে।[৪] এর কিছুদিন পর কংগ্রেস পাকিস্তান দাবি মেনে নেয়। নানা দেনদরবার আর কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে দেশ ভাগ হয়। বিভক্ত দেশে লেখকের পরিবার বরিশালে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে এবং তিনি রয়ে যান ভারতে। আটচল্লিশের জুলাই মাসে এ দূরত্ব ঘুচে যায়। লেখকের পরিবার কলকাতায় চলে আসেন।

পরিবার প্রতিপালনের জন্য এমএ পাসের পর লেখকের কর্মজীবন শুরু হয়। সদ্য স্বাধীন দেশে চাকরি পাওয়া মোটেই সহজ বিষয় ছিল না। তার ওপর লেখক শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ফলে চাকরিজীবনে তাঁর অভিজ্ঞতার পাল্লাটা একটু বেশিই ভারী হয়েছিল। নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর জীবনের সাফল্যগুলো অর্জন করেন। মাঝেমধ্যেই সেখানে তিক্ততার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তেমনি একটি উদাহরণ দিল্লিতে জাতীয় অভিলেখাগার। এখানে লেখক আবিষ্কার করেন সদ্য স্বাধীন একটি দেশে আমলা-মন্ত্রীরা পরস্পরের সহযোগী হয়ে 'দেশের স্বার্থ'-এর নামে কীভাবে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করেন। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি হয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগ ছিল লেখকের কাঙ্ক্ষিত স্থান। দিল্লির স্কুল অব ইকোনমিকসে যে কারণে তিনি সুখী হতে পারেননি। ইতিহাসবিদ হিসেবে ইতিহাস বিভাগেই তাঁর মেধার প্রকৃত বিকাশ হতে পারে। কিন্তু সে অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে লেখক জানান, 'বর্তমান লেখাটি ব্যক্তিগত কাহিনীর চেয়ে সামাজিক ইতিহাসের অন্যতর দলিল হিসেবেই পাঠকদের কাছে আমি উপস্থিত করছি। সে ইতিহাসের কৃষ্ণবর্ণ দিক সর্বব্যাপী দুর্নীতি এবং ক্ষমতাশালী মানুষদের নিরঙ্কুশ দলবাজি।' (পৃ. ৩২০) স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এ সমস্যা কেবল ভারতে নয়, সমগ্র ভারত উপমহাদেশে সংক্রমিত হয়েছিল, তা উপমহাদেশের অধিবাসীমাত্রই জানেন। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এ বিবরণ সমাজের মূলের অবক্ষয়ের এক প্রামাণ্য গাথা।

পেশাগত জীবনের এসব অভিজ্ঞতার মধ্যেই লেখকের জীবনের আরেকটি পরিণতি আসে এবং লেখক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বাভাবিকভাবে এ স্মৃতি সুখের হলেও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তৎকালীন সমাজের অপসংস্কারের কিছু দলিল। ১৮৫৬ সালে বহুবিধ আন্দোলন ও যুক্তিতর্কের পর হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। লেখকের বর্ণিত ঘটনা তার ১০৪ বছর পর। শত বছর পর এ অঞ্চলের

সামাজিক চিন্তাচেতনার কতটা পরিবর্তন ঘটেছিল, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতায়। লেখক যাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিধবা পুত্রবধূ। পুত্রবধূর শ্বশুরবাড়ি এবং তাঁদের আত্মীয়-পরিজনেরা এ বিবাহ বন্ধ করতে সম্ভাব্য সব উপায়ই অবলম্বন করেছিলেন। এ সম্পর্কে লেখক বলেন, 'বিদ্যাসাগর মশায়কে ঘিরে উনিশ শতকীয় সংস্কার আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়ার পর এমন চিন্তা বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের মস্তিষ্কে এসেছে এ ধরনের নজির নেই। ব্যতিক্রম যা দেখা যায় তা ব্যতিক্রমই। সুতরাং বিধবা বিবাহ করছি দেখে পরিচিত-অপরিচিত সবাই আমাকে মাথায় তুলে নাচবে, এমন চিন্তা আমার মাথায় আসেনি। কিন্তু বস্তুত যা ঘটল, তাও আমার কল্পনার বাইরে ছিল।' (পৃ. ৩১০) সেসব অকল্পনীয় ঘটনায় লেখক এবং তাঁর হবু পত্নীকে বহু লাঞ্ছনা ও অপবাদের শিকার হতে হয়েছিল; যা লেখক এ গ্রন্থে অকপটে বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে লেখক বলেন, 'নিন্দাটা হয়েছিল প্রধানত হাসির (লেখকের স্ত্রী)। আমাদের সমাজে পুরুষ কখনও বিশেষ দোষী হয় না।' (পৃ. ৩২০)

শিক্ষা এবং পেশাগত কারণে লেখক জীবনে বেশ কয়েকবার প্রবাসী হয়েছিলেন। আত্মীয়-পরিজন এবং শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা অক্সফোর্ড-কেমব্রিজে ডিগ্রি লাভ করেছিলেন, তাঁদের কাছে গল্প শুনে লেখকের মনে শৈশবেই তেমন স্বপ্ন বাসা বাঁধে। ১৯৫৩ সালে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে লেখক ইংল্যান্ডে যান। পরবর্তী জীবনে তিনি একাধিকবার পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, গবেষক হিসেবে গবেষণা ও শিক্ষক হিসেবে পাঠদান করেছেন। ১৯৭৩ সালে শিক্ষকতার উদ্দেশ্যে তিনি ভারত ত্যাগ করেন। প্রবাসজীবনের দীর্ঘ বর্ণনায় লেখক ইউরোপ-আমেরিকার সমাজ-সংস্কৃতির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ করে তিনি ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সামাজিক সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'ইউরোপে অনেক সময় শুনি যে মার্কিনদের বন্ধুত্বে কোনও গভীরতা নেই, চোখের আড়াল হলেই সৌহার্দ্যের সমাপ্তি।...মানুষে মানুষে যে সহজ সম্পর্ক শুধু ইংল্যান্ডে না, ইউরোপের সংস্কৃতিগর্বী অনেক দেশেই দুর্লভ, আমেরিকায় তা বারেবারেই অপর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছি।' (পৃ. ২৯৮)

স্মৃতিকথা শেষে লেখক নিজেই নিজের সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন করেছেন, 'অনেক আশা, কিছু শিখবার ইচ্ছে নিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম। তার শতকরা দশ ভাগ পূর্ণ হয়েছে। আশাতীত সৌভাগ্যও হয়েছে। আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে অফুরন্ত ভালবাসা যা পেয়েছি তার কোনও পরিমাপ হয় না।' (পৃ. ৪০১)

বাঙালনামা/ স্মৃতিকথার সময়কাল প্রায় এক শতাব্দী। বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে প্রায় বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। এ শতকটি ভারত উপমহাদেশ ও বিশ্বের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় সময়। ব্রিটিশ শাসনামলে এবং পরবর্তীকাল

থেকে বর্তমান পর্যন্ত এ সময়কে নিয়ে বহু স্মৃতিকথা, প্রামাণ্য গ্রন্থ ইত্যাদি রচিত হয়েছে। কিন্তু *বাঙালনামা* এ অগণিত রচনা থেকে ভিন্নধর্মী। এর লেখক তপন রায় চৌধুরী একজন খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ। তাই এ বিস্তৃত সময়কাল সম্পর্কে জানতে তপন রায়ের সুবিস্তৃত গ্রন্থটি এক অমূল্য সংযোজন। পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন, একটি বিস্তৃত সময়কালকে লেখক এ গ্রন্থে কী চমৎকারভাবে ধরে রেখেছেন।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. সাইমন কমিশন গঠিত হয় ১৯২৭ সালে। ভারতবর্ষ দায়িত্বশীল সরকার গঠনে কতটা প্রস্তুত হয়েছে, ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ কতটা সৃষ্টি হয়েছে এবং কোন ধরনের শাসনতন্ত্র ভারতের সব ধরনের জনমতকে সন্তুষ্ট করতে পারবে ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনার জন্য ইংরেজ সরকার সাইমনের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠন করে তাই সাইমন কমিশন নামে পরিচিত। বিস্তারিত দেখুন- শেখর বন্দোপাধ্যায়, *পলাশি থেকে পার্টিশন আধুনিক ভারতের ইতিহাস*, ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লি., কলকাতা, ২০০৬।

২. ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গান্ধী যে তিনটি সর্বভারতীয় গণ-আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, তার মধ্যে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলন ছিল অন্যতম। ভারত ছাড় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ভারত থেকে ইংরেজদের বিতাড়ন। গান্ধী বলেছিলেন, এ আন্দোলন হবে খোলাখুলি বিদ্রোহ, সংক্ষিপ্ত ও বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন, যেনতেন প্রকারে দেশ থেকে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। হয় কর, নয় মর। বিস্তারিত দেখুন— সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯৯৩।

৩. বিস্তারিত দেখুন— M Mufakharul Islam, *An Economic History of Bengal 1757-1947*, Adorn Publication, Dhaka, 2012.

৪. বিস্তারিত দেখুন— Suranjan Das, *Communal Riots in Bengal 1905-1947*, Oxford University Press, Delhi, 1991.
Harun-or Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1947*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987.
এ ছাড়া লেখক তাঁর *রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা* (আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৩) গ্রন্থে পৃ. ৯৫-৯৭ তে দাঙ্গার বর্ণনা দিয়েছেন।

লে খ ক প রি চি তি

বদরুল আলম খান

বদরুল আলম খান দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতার পর বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনিতে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাংলাদেশ সমাজ, শ্রেণী, ধর্ম ও বিশ্বায়ন। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে *পুঁজিবাদের সমাজতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব : সংকট ও সম্ভাবনার দেড় শ বছর, দর্শনের সংকট* এবং *তৃতীয় বিশ্ব, ধর্ম ও সমাজ বিপ্লব* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *সংঘাতময় বাংলাদেশ : অতীত থেকে বর্তমান* নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। বর্তমানে তিনি *বাংলাদেশ : একটি ইসলামি প্যারাডাইমের সন্ধানে* নামক গ্রন্থের ওপর কাজ করছেন।

সিরাজুল ইসলাম

ইতিহাসবিদ ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। বাংলাপিডিয়ার সম্পাদনা পর্ষদের সভাপতি। *জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ*-এর সম্পাদক। ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের সিনিয়র কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো ও ব্রিটিশ একাডেমির অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা-[সম্পা] *হিস্টোরি অব বাংলাদেশ* (১৯৯০); *পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট ইন বেঙ্গল* (১৯৭৮); [সম্পা] *রুরাল হিস্টোরি অব বাংলাদেশ : আ সোর্স স্টাডিজ* (বাংলাদেশ হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ, ১৯৭৭)।

অধ্যাপক ড. বার্ট সুইকেন্স

বেলজিয়ামের গেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘর্ষ এবং উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক এবং গবেষক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ এশিয়ায় মাওবাদী আন্দোলনের ওপর গবেষণা করেছেন। বর্তমানে তাঁর গবেষণার বিষয় বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি ও উন্নয়ন।

আইনুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং বেলজিয়ামের গেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘর্ষ এবং উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের গবেষণা ফেলো। তিনি বেলজিয়ামের এনটর্প বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গভর্ন্যান্সের ওপর উচ্চতর মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতা, হরতাল, পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক Microgovernance Research Initiative-এর পরিচালক।

মিজানুর রহমান খান

সাংবাদিক, আইন বিশেষজ্ঞ। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা *তত্ত্বাবধায়ক সরকার : এর অশনি সংকেত* (আগামী, ২০০৯); *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক* (সিটি প্রকাশনী, ১৯৯৫); *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড* (প্রথমা, ২০১৩)।

সাজেদুল আউয়াল

কবি, কাব্যনাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, প্রাবন্ধিক, চলচ্চিত্রবিদ্যার শিক্ষক, সম্পাদক। চলচ্চিত্রকলা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা *বাংলা নাটকে নারী-পুরুষ ও সমাজ* (অনন্ত প্রকাশন, ১৯৯৯); *ঋত্বিকমঙ্গল* (বাংলা একাডেমি, ২০০১); *চলচ্চিত্রকলা* (বাংলা একাডেমি, ২০১০); *চলচ্চিত্রকলার রূপ-রূপান্তর* (দিব্য প্রকাশ, ২০১১); *সত্যজিতের স্রষ্টাবৃত্তি* (নান্দনিক, ২০১৩); *বাঙালির চলচ্চিত্রচিন্তা* (১০ খণ্ড, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, প্রকাশিতব্য); *মৃণালমানস* (রোদেলা, প্রকাশিতব্য), *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের ইতিবৃত্ত* (কাশবন, প্রকাশিতব্য)।

সোহরাব হাসান

কবি, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ ও যুদ্ধাপরাধ* (ঢাকা প্রকাশন, ২০০০); *মুজিব, ভুট্টো, মুক্তিযুদ্ধ* (মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০); *সুন্দর তোমার সর্বনাশ* (সৃজন, ১৯৮৮); *বাতিল রাজদণ্ড* (উত্তরা, ১৯৮৪)।

মোশারফ হোসেন

লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে বিএ (অনার্স) ও এমএ করেছেন। বর্তমানে ওই বিভাগে এমফিল গবেষণার দ্বিতীয় পর্বের কাজ করছেন। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা *বঙ্গবন্ধু কোষ* (অন্যতম একজন ভুক্তি লেখক)।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি গ্রাহক কার্ড দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১





নতুন বই

লেখক : মতিউর রহমান
একাত্তরের বীরযোদ্ধা ২য় খণ্ড ৳ ৫৫০

হাসান ফেরদৌস
মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত বন্ধুরা ৳ ৪০০

আনোয়ার উল আলম
রক্তাক্ত বুড়িগঙ্গা ২য় মুদ্রণ ৳ ৩৫০

মিজানুর রহমান খান
মার্কিন ফাইলে মুজিব হত্যাকাণ্ড
৩য় মুদ্রণ ৳ ৬০০

মুহাম্মদ নুরুল হক
দৈনিক মফস্বল ৳ ২২০

ফারুক চৌধুরী
জীবনের বালুকাবেলায় ৳ ৭৫০

আবদুল মান্নান সৈয়দ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় :
অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা ৳ ৪০০

কুদরাতুল-আইন-তাহমিনা
চর্চা করুন খবর লিখুন ৳ ২৫০

মুনতাসীর মামুন
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১ ৳ ৪৫০

আরেক মাসুদ
চলচ্চিত্রলেখা : চিত্রনাট্য ও গান ৳ ৫০০

শামসুর রাহমান, মতিউর রহমান
শহীদ নূর হোসেন ৳ ১৫০

প্রাপ্তিস্থান : প্রথমা বইয়ের দুনিয়া—ঢাকা বাংলাবাজার ৮১৯০০৭৮ বাংলাবাজার ০১৭২৮-৮৮৪৪২০; শাহবাগ ৯৬৬৪৮২৫; **চট্টগ্রাম** ৬১৬১৬৫, **রাজশাহী** ০১৭৪৯-৮৪৫৮৪৫
ফোনে অর্ডার/ বই অনুসন্ধান : ০১৭১১-৬৪৯৪৯২ (সকাল ১০টা-রাত ৮টা)

ENGLISH VERSION

SARA International School

জাতীয় শিক্ষা | ইংরেজি মাধ্যম

২০১৪ শিক্ষাবর্ষে প্লে-গ্রুপ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত



এসো সফল জীবন গড়ি...
ন্যাশনাল কারিকুলাম ইংরেজিতে পড়ি

Let Your Child be Educated
Under Highly Qualified Foreign Teacher

১৫ জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত বিশেষ ছাড়

প্রতিদিন রাত ১০টা পর্যন্ত ভর্তি কার্যক্রম চলছে



সারা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল-এর বৈশিষ্ট্যঃ

- শিশুদের জন্য খেলাচ্ছলে পড়া-আনন্দময় শেখা পদ্ধতি অবলম্বন
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সমস্যা উদঘাটন ও নিরাময়
- ছড়াগান ও Rhymes-এর মাধ্যমে শিশুদের ইংরেজিতে অভ্যস্ত করে তোলা
- সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণে বার্ষিক শিক্ষা সফর
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১০০% পাশ
- ঢাকার যে কোন প্রান্ত থেকে পরিবহন সুবিধা

সভাপতি
লায়ন আলহাজ্ব মোঃ নজরুল ইসলাম সিকদার

অধ্যক্ষ: মুহাম্মদ সাইদুর রহমান
বি.এড (অনার্স), এম.এড (স্পেসিস, প্রথম শ্রেণী), এম.ফিল (শিক্ষা গবেষণা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬০, পশ্চিম আগারগাঁও (বিজ্ঞান জাদুঘরের পাশে), শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। ফোন: ৯১৩৫৯৭৬
০১৯১৩১২২০০১, ০১৭১৫০২৩৭৩৩, ০১৭১৬৯৮০৮৫০, ০১৭১১৭০৮৭০৪, ই-মেইল: infosaraschool@gmail.com

Our recent achievement...



Best Financial Institution of Bangladesh Award
In recognition of its consistent performance, Bangladesh Business Award by DAB - Daily Star, awarded Pubali Bank as the Best Financial Institution 2010.



Country's largest online network with 415 branches
With in-house software - Pubali Integrated Banking System (PIBS) - evaluated by PwC, the bank launched its online banking - becoming the largest online network of the country with 415 branches



Largest Private Bank with 419 branches
Rather than focusing on only in metro areas, to reach the rural economy, the Bank has established 419 branches all over Bangladesh largest network in private sector banks

Double A Three Credit Rating
Credit Rating Authority of Bangladesh (CRAB) has rated AA3 signifying "Very Strong Capacity" in long term and ST1 signifying "Highest Grade" in short term



Highest ever growth achieved by Pubali Bank
In the year 2010, the Bank continued its consistent performance and has marked the highest ever growth



One of the largest private sector recruiters
The bank is ensuring employment of Bangladeshi talents through massive recruitment and proper training. this year 550 officers joined the Pubali family



Diverse list of products
The bank introduced diversified products to cater the financial needs of a larger scale - innovation and emphasis on agriculture, foreign wage earners scheme, remittance, SME, trade finance etc.



Introduced Islamic Banking
With increasing demand, the Bank has opened its Islamic wing



Special recognition for CSR
Huge contribution for disaster management, development of health sector, supporting local sports and different other social contributions brought the Special Recognition for CSR by Banker's Forum and others

...we will continue to **strive for excellence** in coming days

PUBALI BANK LIMITED

www.pubalibangla.com


THE ULTIMATE IN HOUSING
WE DON'T SELL
APARTMENT
WE SELL
LIFESTYLE...
SHELTECH
the BEST
real estate developer
since 1988
শেল্‌টেক্‌ SHELTECH
SHELTECH TOWER:
55, Bir Uttam Qazi Nuruzzaman Road
(West Panthapath)
Dhaka-1205, Bangladesh
E-mail : sheltech@citechco.net
Web site : www.sheltech-bd.com
Fax : 880-2-9143332
Tel : (02) 9143333-8 (6 Lines)
Working towards
the DREAM...
to make our city
GREEN